Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

নাগরিক এজেন্ডা ২০২৩

একটি ভিন্নতর বাংলাদেশের লক্ষ্যে

নাগরিক এজেন্ডা ২০২৩
একটি ভিন্নতর বাংলাদেশের লক্ষ্যে

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
হাউজ ৪০/সি, রোড ১১ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮০-২, ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮৩
ইমেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net
ওয়েবসাইট: www.bdplatform4sdgs.net

© এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
ইব্রাহিম মনি

মুদ্রক
লিথোগ্রাফ
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এখনও উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত এবং নীতিনির্ধারনের আলোচনাতেও প্রায়শই তাদের কণ্ঠঃস্বর প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু প্রচলিত সরকারি বক্তব্যে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠঃস্বরকে উপেক্ষা করে তুলে ধরা হয়েছিল শুধু সফলতার আখ্যান। নাগরিক এজেন্ডা ২০২৩: একটি ভিন্নতর বাংলাদেশের লক্ষ্যে সেই সমান্তরাল বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ, এবং তার সচিবালয় সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর প্রস্তুতকৃত **১১**টি পলিসি ব্রিফ। ব্রিফগুলোর তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে দুই বছরব্যাপী (২০২২-২০২৩) ২৫ টি জেলায় আয়োজিত আঞ্চলিক সংলাপ, টাউন হল মিটিং, মতামত জরিপ এবং ঢাকায় একটি জনশুনানীর মাধ্যমে।

নাগরিক এজেন্ডা প্রণয়নের এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব পেয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকারভিত্তিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সেই সমস্যাগুলোকে বাস্তবসম্মত নীতি প্রস্তাবে রূপান্তর করার প্রয়াস। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে **১১** টি বিষয়ে পলিসি ব্রিফ তৈরি করা হয়েছে, যা ভাগ করা হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সুশাসনকেন্দ্রিক, এই তিনটি বিষয়ভিত্তিক ভাগে। প্রতিটি ব্রিফ প্রণয়নে অবদান রেখেছেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা, যাঁরা স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করেছেন। এই উদ্যোগের পরিচালনায় ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্রিফগুলোর চেয়ার, পেনহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞ দল, যাদের সহায়তা করেছেন আরও বিস্তৃত পেশাজীবী, নাগরিক কর্মী এবং প্ল্যাটফর্মের সচিবালয়ের সদস্যরা।

প্রতিটি ব্রিফে রয়েছে প্রামাণ্য তথ্য ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং একইসাথে উপস্থাপন করা হয়েছে নির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ। ব্রিফগুলো শুধু বিদ্যমান নীতিসমূহ ও বাস্তবায়নের দুর্বলতাই উল্লেখ করেনি, একই সাথে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের প্রত্যাশাও তুলে ধরেছে। এই সংকলন দেশের উন্নয়ন-যাত্রায় সম্মিলিত নাগরিক অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকেও দৃশ্যমান করেছে।

পলিসি ব্রিফগুলো ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের আগে প্রণয়ন করা হলেও, এর প্রকাশ এমন এক সময়ে ঘটছে যখন দেশের নাগরিকরা গভীরভাবে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। বইটি শুধু চিন্তার সংকলন নয়, বরং একটি অকাট্য প্রমাণ হিসেব দাঁড়িয়েছে যা আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্ভাব্য নাগরিক ইশতেহার প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, যিনি এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটির নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং একইসাথে বইটি সম্পাদনার দুরূহ কাজটি করেছেন। জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান, মিজ তারান্নুম জিনান এবং জনাব রিফাত বিন আওলাদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা, যারা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সমন্বয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রতিটি পলিসি ব্রিফের চেয়ার, পেনহোল্ডার-এক্সপার্ট, দলের সদস্যবৃন্দ, প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ ও উপদেষ্টাবৃন্দ এবং স্থানীয় অংশীদার সংস্থাসমূহের মূল্যবান অবদানের প্রতিও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি আশা করি এই সংকলন বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে এবং ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ –এই অঙ্গীকারের প্রেরণায় টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে কাজ করবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
এবং
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সূচীপত্র

মুখবন্ধ — *তিন*

ভূমিকা — *সাত*

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

নীতি বিবৃতি ১: অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির জন্য কৃষির রূপান্তর — ১

নীতি বিবৃতি ২: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে যুবদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা — ১৫

নীতি বিবৃতি ৩: অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও সরকারি পরিষেবা — ৩১

নীতি বিবৃতি ৪: সবার জন্য সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি নিশ্চিত করা — ৪৩

সামাজিক প্রসঙ্গ

নীতি বিবৃতি ৫: গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ — ৫৯

নীতি বিবৃতি ৬: গুণগত স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন অভিগম্যতার উন্নয়ন সাধনে সেবাগ্রহীতার দৈনন্দিন খরচ বহির্ভূত ব্যয় (আউট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার) হ্রাসকরণ — ৭৩

নীতি বিবৃতি ৭: সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা — ৮৭

নীতি বিবৃতি ৮: জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক অভিঘাতসমূহ মোকাবিলা — ৯৯

সুশাসন প্রসঙ্গ

নীতি বিবৃতি ৯: লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নির্মূলীকরণে আইন ও বিচারপদ্ধতির ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন — ১১১

নীতি বিবৃতি ১০: জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অভিগম্যতা ও ন্যায়বিচার — ১২৭

নীতি বিবৃতি ১১: নীরব গণকণ্ঠকে সোচ্চার করা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা — ১৪১

ভূমিকা

প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা

২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের বহুমুখী উদ্যোগকে চারটি মূল ধারায় বিভক্ত করা যায়। সেগুলো হলো-এসডিজি-কেন্দ্রিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা; প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিক আন্দোলন পরিচালনা করা যেন পিছিয়ে পড়া মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করা যায়; শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক কর্মী, উন্নয়নকর্মীসহ সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশকে যুক্ত করে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়গুলো নিয়ে প্রমাণভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা; তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন পরামর্শ সভা থেকে উদ্ভূত মতামতের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মাধ্যমে তৈরি ডকুমেন্ট ব্যবহার করে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, যাতে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতিকে প্রভাবিত করা এবং সুপারিশকৃত পদক্ষেপ যেন বাস্তবায়িত হয় সেই চেষ্টার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে কার্যকরভাবে অগ্রসর করা। পলিসি ব্রিফের এই সংকলনটি নাগরিক প্ল্যাটফর্মের চারটি কার্যক্রমের ধারাকে একত্রিত করেছে। অ্যাডভোকেসি, গবেষণা এবং বাস্তবায়নকারী পক্ষসমূহকে একত্রিত করে এই পলিসি ব্রিফ তৈরির যে উদ্যোগটি তা প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই অনন্য উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হয়েছে সিপিডি-এর সহায়তায়, যা প্ল্যাটফর্মের সচিবালয় হিসেবে কাজ করে, এবং দেশের বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে থাকা প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানদের সহযোগিতায়। এই উদ্যোগটি সফল করার জন্য সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশা দিয়েছে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা পরিষদ এবং কোর গ্রুপের সদস্যবৃন্দ।

যে বিতর্কটি এই পলিসি ব্রিফ তৈরির উদ্যোগটিকে তাড়িত করেছেছে তা হলো- বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত মূলধারার বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবতার একটি ফারাক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের উন্নয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কিন্তু এর সুফল জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হচ্ছে না। তাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল এই ব্যবধান কমানো এবং দেশের উন্নয়নে আরও ন্যায্য অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। উদ্যোগটির লক্ষ্য ছিল প্রান্তিক ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর তুলে ধরা, তাদের দাবি-দাওয়া গুলোকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা এবং এমন পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে উৎসাহিত করা যা বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাজে লাগে।

অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য দুর্বলতার কারণে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলো নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। তৃণমূল সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তৃত পরামর্শের ভিত্তিতে ১১টি থিমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যেখানে নীতি হস্তক্ষেপ এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বাধিক সুফল নিশ্চিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রত্যাশিতভাবেই প্রতিটি থিমের মধ্যে একাধিক বিষয় যুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য খাতে অনেকগুলো বিষয় জড়িত ছিল, যেমন অবকাঠামো, রোগ নির্ণয় ও ওষুধের মূল্য, স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য খাতের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ গড়ে তোলা ইত্যাদি। পরামর্শের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি বিস্তৃত থিমের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিষয় চিহ্নিত করতে, যা যথাযথভাবে সমাধান করা গেলে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে কার্যকর ফলাফল বয়ে আনবে।

দেশব্যাপী পরামর্শে উঠে এসেছে যে ব্যক্তিগত খরচ কমানো (out of pocket expenditure হ্রাস) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই ১১টি থিম্যাটিক ক্ষেত্রের প্রতিটিতে একটি করে নির্দিষ্ট বিষয় পরামর্শের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে প্রতিটি বিষয়ে পৃথক পলিসি ব্রিফ প্রণয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

এই এগারোটি ইস্যুকে তিনটি প্রধান অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে: অর্থনীতি প্রসঙ্গ, সামাজিক প্রসঙ্গ এবং সুশাসন প্রসঙ্গ। সামাজিক প্রসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেঃ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির জন্য কৃষির রূপান্তর; দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে যুবকদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও সরকারি পরিষেবা; এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি নিশ্চিত করা। সামাজিক প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ; গুণগত স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন অভিগম্যতার উন্নয়ন সাধনে সেবাগ্রহীতার দৈনন্দিন খরচ বহির্ভূত ব্যয় (আউট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার) হ্রাসকরণ; সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা; এবং জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক অভিঘাতসমূহ মোকাবিলা। সুশাসন প্রসনঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নির্মূলীকরণে আইন ও বিচারপদ্ধতির ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন; জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অভিগম্যতা ও ন্যায়বিচার বিষয়ে নীতি বিবৃতি; এবং নীরব কণ্ঠকে সোচ্চার করা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা।

ব্রিফ প্রস্তুতির প্রক্রিয়া

২০২২-২০২৩ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের বিস্তৃত কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে পলিসি ব্রিফগুলো তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে ছিল সংলাপ, টাউন হল সভা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ধারণা জরিপ এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে পরামর্শ।

২৫টি জেলার তৃণমূল সংগঠনের প্রতিনিধিরা দেশের সাতটি ভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও এনজিও সদস্য, স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী, পাশাপাশি স্থানীয় সরকার এবং জনসেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের স্থানীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান এসব আলোচনার আয়োজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'জন শুনানিতে' অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়ভাবে সংগঠিত করেছেন। প্রায় ৫০০ জন তৃণমূল, এবং নাগরিক সমাজ ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় পর্যায়ের পরামর্শে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারক, সংসদ সদস্য, শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, বেসরকারি খাতের নেতা, এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এই পরামর্শ সভাগুলো ছিল পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে ক্ষমতায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই আলোচনাগুলো থেকে উঠে এসেছে যে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে যে গড়ের ধারণা রয়েছে সেই সংখ্যাগুলো বাস্তব পরিস্থিতির একটি বড় অংশকে আড়াল করে রেখেছে, এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিক ও নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। এরফলে তারা 'পিছিয়ে পড়া' জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র 'কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না' চেতনা দাবি করে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের ন্যায্য অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। ফলে, দেশের দুর্বল নাগরিক ও বঞ্চিত সম্প্রদায়ের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং তাদের এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করেই প্ল্যাটফর্ম এই পলিসি ব্রিফগুলো তৈরি করেছে।

১১টি পলিসি ব্রিফের প্রতিটিতেই চিহ্নিত সমস্যার নিয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রতিটি পিলিসি ব্রিফ প্রস্তুত করেছেন দেশের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেরা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি নিবেদিত দল। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেছেন। একজন স্বীকৃত পেশাজীবী 'পেনহোল্ডার-এক্সপার্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যিনি দলের সদস্যদের মতামত নিয়ে খসড়া প্রস্তুত করেছেন। প্রতিটি দল একাধিকবার বৈঠক করেছে, আঞ্চলিক পরামর্শ সভাগুলোর নোট ও এফজিডি থেকে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনা করেছে এবং প্রাসঙ্গিক গবেষণার সাহায্য নিয়েছেন। নির্ধারিত পেনহোল্ডার-এক্সপার্ট কর্তৃক প্রস্তুত খসড়াটি পরবর্তীতে চেয়ারম্যান ও দলের সদস্যদের মন্তব্য ও মতামতের ভিত্তিতে সংশোধিত হয়েছে, পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্যদের বিস্তারিত মন্তব্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খসড়াটি পলিসি ব্রিফের উপদেষ্টা কমিটির সাথেও শেয়ার করা হয়েছিল তাদের মতামত ও পরামর্শের জন্য।

প্রতিটি পলিসি ব্রিফ একই ধরনের কাঠামো অনুসরণ করেছে, যেমন: সংশ্লিষ্ট সমস্যার পটভূমি ও প্রেক্ষাপট, একটি সুপারিশের অংশ যেখানে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, নীতি উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার মধ্যে আইন ও বিধিমালায় সংশোধনের প্রস্তাবও ছিল এবং একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার।

এই পলিসি ব্রিফ প্রস্তুতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এতে যুক্ত প্রায় ১৪০ জন ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় কাজ করেছেন এবং উদারভাবে তাঁদের সময়, দক্ষতা ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করেছেন যার ফলে এই পলিসি ব্রিফগুলো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এই কাজটি নাগরিক উদ্যোগের একটি সফল উদাহরণ। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণ করেছে যে তাঁরা এসডিজি এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে দেশের অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেছেন। বাংলাদেশ ভিশন ২০৪-তেও এই আকাঙ্ক্ষার কথা বলে। একটি প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, যদি এই সময় ও শ্রমের মূল্য অর্থে রূপান্তরিত করা হয়, তবে বিশেষজ্ঞ দলের সকল সদস্যের সম্মিলিত অবদান কয়েক লক্ষ মার্কিন ডলারের সমান হবে!

সংগঠন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছেন প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপের সদস্য অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সচিবালয় হিসেবে সিপিডি উদ্যোগটির বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে। নির্ধারিত পেনহোল্ডার-এক্সপার্ট কর্তৃক প্রস্তুত খসড়াটি চেয়ারম্যান ও দলের সদস্য এবং কোর কমিটির সদস্যদের মন্তব্য ও মতামতের ভিত্তিতে সংশোধিত হয়েছে। খসড়াগুলো উপদেষ্টা কমিটির সাথেও পর্যালোচনা ও পরামর্শের জন্য পাঠানো হয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ এবং উপদেষ্টা কমিটি, যার চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান, উদ্যোগটির সামগ্রিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্থানীয় সহযোগী সংগঠনের সম্পৃক্ততা

এই কার্যক্রমের পুরোটা সময়জুড়েই প্ল্যাটফর্মের অংশীদাররা বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন, যেমনঃ স্থানীয় পর্যায়ের পরামর্শ সভা আয়োজনের নেতৃত্ব দেওয়া, পলিসি ব্রিফের ওপরে মতামত দেওয়া এবং গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। সহযোগী সংগঠনগুলো পলিসি ব্রিফে উল্লেখ করা সুপারিশগুলোকে নিয়ে প্রচার ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে উদ্যোগটিকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করছি।

পলিসি ব্রিফের প্রচার ও প্রসার

পলিসি ব্রিফের প্রচারের জন্য প্ল্যাটফর্ম সচিবালয় বেশ কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করে। ব্রিফে উল্লেখ করা তিনটি পৃথক ক্লাস্টার নিয়ে মিডিয়া ব্রিফিংএর আয়োজন করা হয়। এসব ব্রিফিংয়ে প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপের সদস্যরা, সংশ্লিষ্ট ব্রিফের সভাপ্রধান এবং বিশেষজ্ঞ দলের কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এই ব্রফিং এর সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার হয়, যার ফলে এই ব্রিফগুলোর মূল বিষয়গুলো ও সুপারিশসমূহ বৃহত্তর জনপরিসরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যেসব পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর প্রায়শই অশ্রুত থেকে যায় এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে অগ্রাহ্য করা হয়, সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

ব্রিফগুলো চূড়ান্ত হওয়ার পর তা গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের কাছে পাঠানো হয়। ৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে এগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পাঠানো হয়। মূলত পরিকল্পনা ছিল প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপের সদস্য ও ব্রিফ প্রস্তুতকারী দলের প্রতিনিধিরা, আহবায়কের নেতৃত্বে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে সুপারিশসমূহ তুলে ধরবেন। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। জাতীয় নির্বাচন শেষে ব্রিফগুলো নবনির্বাচিত সরকারের সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়, যেখানে আহবায়কের স্বাক্ষরিত একটি চিঠি সংযুক্ত ছিল যাতে ব্রিফের প্রস্তাবসমূহ নীতিগতভাবে গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে চিঠি লিখে সাক্ষাতের অনুরোধ জানান, যাতে ব্রিফ তৈরির উদ্যোগ সম্পর্কে তাদের অবহিত করা যায় এবং প্রস্তাবসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যায়। আনন্দের বিষয় হলো, কয়েকজন মন্ত্রী ইতিবাচকভাবে সাড়া দেন এবং প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। একাধিক মন্ত্রী প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিদের তাদের অফিসে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আহ্বায়ক এবং কোর গ্রুপ ও বিশেষজ্ঞ কমিটির কয়েকজন সদস্য ইতোমধ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী এবং বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও এসব বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাদের আগ্রহ, সময় এবং প্ল্যাটফর্ম সদস্যদের সাথে আলোচনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগও তৈরি হয়েছে। এই পরামর্শ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্ল্যাটফর্ম সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথেও বৈঠক করার পরিকল্পনা করেছে, যাতে সরকারের ভেতরে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালানো যায়। উদ্দেশ্য হলো জনগণের প্রতিনিধি ও উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সংবেদনশীল করা। পাশাপাশি সুপারিশসমূহ নিয়ে জনমত গঠন করাও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, যেখানে প্ল্যাটফর্মের অংশীদাররা নেতৃত্ব দেবেন।

এই ব্রিফগুলো ব্যবসায়ী সংগঠন ও শীর্ষ উদ্যোক্তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যাতে বেসরকারি খাত এসব বিষয়ে সচেতন হয় এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে একটি বিশেষ সেশন আয়োজন করা হয়, যেখানে তাদেরকে পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং ব্রিফে প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহের সাথে তাদের দেশীয় কর্মসূচিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার আহ্বান জানানো হয়। কয়েকজন রাষ্ট্রদূত ও উন্নয়ন সংস্থার প্রধানরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্ল্যাটফর্ম ভবিষ্যতে এধরনের আরও পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে, যাতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্রিফে প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

ভবিষৎ পরিকল্পনা

পলিসি ব্রিফ তৈরির এই কার্যক্রম নাগরিক প্ল্যাটফর্মের একটি স্বতন্ত্র উদ্যোগ নয়, বরং এটি একটি সমন্বিত ও একীভূত প্রচেষ্টার অংশ—যার লক্ষ্য বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষা করা। তাদের দৃশ্যমান করা, ক্ষমতায়ন করা, তাদের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নীতিগত গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করাই এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।

প্ল্যাটফর্ম ভবিষ্যতেও এই পরিকল্পিত কাজগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, যেখানে পলিসি ব্রিফগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
এবং
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

আবুল মোমেন
বিশিষ্ট সাংবাদিক

আলি ইমাম মজুমদার
বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সচিব

আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ
সমন্বয়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

ড. ফওজিয়া মোসলেম
সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

ফজলুল হক
সাধারণ সম্পাদক, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড অ্যাসোসিয়েশন

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)

খুশী কবির
সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং সমন্বয়কারী, নিজেরা করি

বিচারপতি এম. এ. মতিন
সাবেক বিচারপতি, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

মনসুর আহমেদ চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

এম সাইদুজ্জামান
সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী

নিরূপা দেওয়ান
সাবেক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ (এনএইচআরসি)

অধ্যাপক ডা. রশিদ ই মাহাবুব
সভাপতি, জাতীয় স্বাস্থ্য আন্দোলন এবং সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ)

অধ্যাপক রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন
সাবেক নির্বাচন কমিশনার

ড. শাহদীন মালিক
বিশিষ্ট আইনবিদ এবং সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং অধ্যাপক, ইংরেজি ও হিউম্যানিটিজ, ইউল্যাব

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী
কোষাধ্যক্ষ, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং চেয়ারম্যান, এ্যাপেক্স গ্রুপ

অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ
সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সদস্য, জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি কমিটি (সিডিপি)

১

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির জন্য কৃষির রূপান্তর

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

আসিফ ইব্রাহিম
কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
এবং
ভাইস চেয়ারম্যান, নিউ এজ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

পেনহোল্ডার

ড. জিন্নাত আরা
রিসার্চ ফেলো
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ড. এ. এইচ. এম. সাইফুল ইসলাম
অধ্যাপক ও প্রধান, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)

আহসান খান চৌধুরী
চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ

ফেরদৌস আরা বেগম
ফাউন্ডার চেয়ার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

ড. কে এ এস মুরশিদ
সাবেক মহাপরিচালক
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

ড. কাজী ইকবাল
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

ড. এম আসাদুজ্জামান
সাবেক গবেষণা পরিচালক
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

ড. এম মাসরুর রিয়াজ
চেয়ারম্যান
পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ

ড. মো. ফরিদ উদ্দীন খান
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মো. তানজিল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
নির্বাহী পরিচালক, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইডিআরও)

ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‌্যাপিড)

মোহাম্মদ নুরুল আমিন
বিশিষ্ট ব্যাংকার

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়নে 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' প্রত্যয়টি এই শর্তাবলি সামনে নিয়ে আসে যে, বৈশ্বিক এবং জাতীয় অভিষ্টসমূহ অর্জনে সমাজের সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্তও প্রান্তিক মানুষের উদ্বেগ এবং স্বার্থের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং এর সুফল থেকে সমাজের কোনো অংশ বাদ যাবে না -এমনটি নিশ্চিত করতেই এই ধারণার সৃষ্টি। এর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা অন্য খাতের চেয়ে কৃষি খাতে বেশি । শুধু এসডিজি-২ (শূন্য ক্ষুধা) এবং এসডিজি-১ (শূন্য দারিদ্র্য) নয়, অন্যান্য এসডিজি অর্জনও কৃষি খাতের অগ্রগতির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশের আলোকে সমৃদ্ধ উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পিছিয়ে থাকা, প্রান্তিক এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সাধনে সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির জন্য এমন সহায়তা প্রদান যাতেকৃষির সাথে সম্পৃক্ত এবং কৃষি রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা গ্রামের মানুষের উদ্বেগ ও স্বার্থ বিবেচনায় নেওয়া হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে কৃষি খাতের মধ্যে রয়েছে শস্য, পশু পালন, বনজ সম্পদ এবং মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কার্যক্রম। De janvvry & Saoulet (2020) অনুসারে ''উন্নয়নের জন্য কৃষিকে ব্যবহারের বর্তমান চিন্তা/ধারণা হলো- ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সম্পদ গড়ে তোলা, প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, কৃষি রূপান্তর (চাষ পদ্ধতির বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের শস্যের দিকে যাওয়া) এবং গ্রামীণ রূপান্তর কৃষির সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ অ-কৃষি কার্যক্রমের জন্য মূল্য সংযোজন)''। উল্লেখ্য বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ কৃষি জমি ক্ষুদ্র, যার আকার ০.৫ শতাংশ থেকে ২.৫ হেক্টর পরিসরের। এর মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি এক একরের জমি সর্বাধিক (কৃষি শুমারি,২০২২)। উল্লিখিত দৃশ্যপটের আলোকে এই নীতি বিবৃতি মূলত প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষত কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি, উৎপাদন এবং বিপণনের ক্ষেত্রে তাদের চ্যালেঞ্জ এবং ২০৩০ সাল নাগাদ একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে কৃষির আধুনিকায়ন এবং রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ওপর দৃষ্টি দিয়েছে।

নীতি বিশ্লেষণে এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ক্ষুদ্র কৃষকদের ওপর দৃষ্টি দিয়ে কৃষির রূপান্তর শুধুমাত্র ন্যায্যতার কারণে নয়, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল সুবিধার প্রেক্ষাপটেও এটি প্রত্যাশিত । এই নীতি বিবৃতির প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের কৃষি খাতের বর্তমান পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং কৃষির রূপান্তর ও আধুনিকায়নের জন্য নীতির ঘাটতি চিহ্নিত করা, যার উদ্দেশ্য উচ্চ উৎপাদনশীলতা, বৈচিত্র্যকরণ, সহিষ্ণুতা এবং টেকসইযোগ্যতার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ এবং সুপারিশ প্রদান। এই নীতি বিবৃতি স্থানের সীমাবদ্ধতার জন্য শুধু শস্য খাতের ওপর এর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। অ-শস্য কৃষির গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয় এবং শস্য-উপখাতের তুলনায় অ-শস্য উপ-খাতের ধরন আলাদা। অস্বীকার করা যাবে না যে, অ-শস্য উপ-খাত সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং পুষ্টির বিবেচনায়ও এর গুরুত্ব অধিকতর। এই সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে রাজস্ব-আর্থিক-নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়নে প্রণোদনা, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, প্রমিতকরণ ও প্রামাণ্যকরণ।

একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির জন্য কৃষি খাতে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের কৃষি খাত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। খাদ্য উৎপাদন, শস্য নিবিড়তা, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও বৈচিত্র্য এ সাফল্য নিশ্চিত করেছে। উদহারণস্বরূপ– ১৯৭২ সালের ৯ দশমিক ৮ মিলিয়ন টন থেকে তিনগুণ বেড়ে ২০২০–২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন দাঁড়ায় ৩৮ দশমিক ৭ মিলিয়ন টন (বিবিএস,২০২২)। ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি খাত, যা ২০০5 থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য প্রায় ৯০ শতাংশ কমানোর ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে (বিশ্বব্যাংক,২০১৬)। শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২২ অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত, যা দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রধান উৎস।

তবে এই বই নির্দেশনাও দেয় যে, অর্থনীতির অন্যান্য খাতের তুলনায় কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা কম। গত এক দশকে দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমেছে; ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে কমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১ দশমিক ২ শতাংশে নেমেছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা,২০২৩; বিবিএস, ২০২০)। ২০০০ সালে শুধু কৃষিতে নিয়োজিত খানার সংখ্যা ছিল ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ২০১৩ সালে কমে ৩০ দশমিক ৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে একই সময়ের ব্যবধানে কৃষি এবং অকৃষি উভয় ধরনের কাজে সম্পৃক্ত খানার সংখ্যা ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে (Sen et al., 2021)। দেশের জনসংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ১৯ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হয়, যা অদূর ভবিষ্যেত কৃষির গুরুত্ব বজায় থাকবে বলে ইঙ্গিত দেয়। এর ফলে বাড়তি ২৫ শতাংশ খাদ্যশস্যের চাহিদা তৈরি হবে (Sayed & Haruyma,2016)। এজন্য বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি খাতের ধারাবাহিক উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচ্য।

কৃষি খাত শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ সরকার অনেক উদ্যোগ নিয়েছে – যার মধ্যে রয়েছে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপন, কৃষি তথ্য কেন্দ্রসমূহের প্রতিষ্ঠা, কৃষি সহায়তা কার্ড বিতরণ, ভর্তুকি প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান এবং খাদ্য সংরক্ষণ সক্ষমতার উন্নতি ও অন্যান্য।

অবশ্য কৃষি খাতে নেওয়া উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও কৃষি খাতে বৈচিত্র্য নেই বললেই চলে, যার কারণ জমির এক ফসলের (চাল) ওপর নির্ভরতা। বিদ্যমান খাদ্যশস্য উৎপাদন চর্চা, বিপণন চ্যানেল এবং ভ্যালু চেইন থেকে বেরিয়ে এসে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য জীবনধারণ করা কষ্টকর। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য শিল্পের সঙ্গে কৃষির পশ্চাৎ সংযোগ এবং সম্মুখ সংযোগ এমন শক্তিশালী করে তৈরি করতে হবে, যা শুধু কৃষির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে না, অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে এগুলো অর্জনে সহায়ক হবে। যদিও এটি সহজসাধ্য কাজ নয়। এর আলোকে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো নিচের অধ্যায়গুলোতে উপস্থাপন করা হলো।

বৈচিত্র্যের অভাব

- অভিবাসন এবং শ্রমিক স্বল্পতা: অধিকতর সুযোগের খোঁজে গ্রামের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ীভাবে অথবা মৌসুম ভিত্তিতে শহরে বা অন্য অঞ্চলে অভিবাসনের প্রবণতার ফলে কৃষি খাত আধুনিকায়ন এবং রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ থেকে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি প্রযুক্তি উন্নয়ন, অধিকতর উন্নত চাষাবাদ চর্চা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এছাড়া বিদেশে চাকরির জন্য গ্রামের যুব শ্রেণি ব্যাপক আকারের অভিবাসন কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার ওপর প্রভাব ফেলছে। উদহারণস্বরূপ- Murakami et al. (2021) রিপোর্ট অনুযায়ী কোনো পরিবার বিদেশে একজন কর্মী পাঠালে/ অথবা রেমিট্যান্স আহরণ করলে পিছিয়ে পড়া সদস্যদের কর্মসংস্থানের হার কমে যায়।

- সচেতনতা এবং উৎসাহ প্রদান: বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষিপণ্যের সুবিধা সম্পর্কে ভোক্তাদের সচেতনতার অভাবে কৃষি খাত বৈচিত্র্যকরণে উদ্ভাবনমূলক চর্চা, পণ্য উৎপাদন এবং বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

- জমির বিভাজন: উত্তরাধিকারের কারণে জমির পরিসর বিভক্ত ও উপ-বিভক্ত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের কৃষিজমি ক্ষুদ্র হচ্ছে এবং টেকসই চাষাবাদের জন্য তেমন সহায়ক হচ্ছে না। এর ফলে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো, বাণিজ্যিকীকরণ এবং বৈচিত্র্য আনার সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে।

- জমির মালিকের অনুপস্থিতি: জমির মালিকদের অনুপস্থিতি দুইভাবে কৃষি খাতের উন্নয়নের গতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এসব জমির মালিকরা কৃষিতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখান না ।গ্রামীণ-কৃষির উন্নয়নে তাদের কোনো অংশগ্রহণ এবং জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা, অঞ্চল বিভাজন ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে বিরোধী অবস্থান নিতে দেখা যায়।

উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও জ্ঞানের অভাব

- সম্পদ প্রাপ্তি: কৃষিঋণ ও অর্থায়ন, জলবায়ু সহনশীল গুনগত মানের বীজ ও সার এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি পাওয়ার সীমাবদ্ধতা কৃষি খাতের বহুমুখীকরণ এবং উৎপাদনশীলতা উভয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষত ক্ষুদ্র পর্যায়ের কৃষকরা এতে প্রভাবিত হচ্ছেন। কৃষকদের বড় অংশ এখনও সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির ধারক এবং তারা কম উৎপাদনক্ষম চাষ পদ্ধতি এবং উপকরণের উপর নির্ভরশীল। তাদের বেশরভাগই ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের কৃষক।

- জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের অবক্ষয়: যদিও বিভিন্ন উদ্যোগের (জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০২২ এ সন্নিবেশিত) মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যজনিত দৃশ্যপট কৃষকদের ওপর চাপ বাড়িয়েছে। আবহাওয়ার দুর্যোগ এবং পরিবেশের অবক্ষয়ের মতো জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকির কারণে ফসল চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা কমছে, বাণিজ্যিক চাষের কার্যকারিতা কমছে এবং নতুন জাতের ও নতুন ফসল উৎপাদন নিরুৎসাহিত হচ্ছে। এটি সবাই জানেন যে, খরা, আবহাওয়ার খেয়ালি আচরণ এবং বন্যাসহ নানা কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর পাশাপাশি পরিবেশের অবক্ষয়, ভূমিক্ষয় এবং লবণাক্ততা কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হওয়ার পথে প্রভাব ফেলেছে। এসবের ফলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কৃষির চর্চা একটি চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

- খরা এবং অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার সময় নিরাপত্তা সমস্যা: তেমন কোনো পূর্ব–সতর্কতা ছাড়া অনেক সময় খরা এবং অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা দেখা যায়। এর ফলে স্থানীয় কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষে সময়মতো প্রস্তুতি গ্রহণ এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে মানুষ এবং ফসল চাষের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে, যার পরিণতিতে ফসল নষ্ট হয়, অর্থনীতির ক্ষতি হয়, , প্রাণহানি ঘটে, বাসস্থান ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি হয়, স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দেয় এবং খাদ্য ও পানির স্বল্পতাসহ নানা সংকট তৈরি হয়।

- দুর্বল গবেষণা– সম্প্রসারণ সংযোগ: হালনাগাদ জ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তির সুফল কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের মধ্যে শক্তিশালী সংযোগের দরকার। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারে এবং যথাযথ প্রযুক্তি এবং চাষাবাদের ধরনের বিষয়ে উত্তম চর্চা গ্রহণ এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে এসবের অভাব রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নয়নে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব

- দক্ষ শ্রম: দক্ষ এবং যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের অভাব বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের ওপর প্রভাব ফেলছে এবং চাষ বৈচিত্র্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পর্যাপ্ত প্রযুক্তিক/ প্রযুক্তিগত এবং তত্ত্বাবধায়নমূলক সহায়তা না থাকায় কৃষকরা অধিকতর উন্নত কৃষিচর্চার দিকে যেতে পারছে না, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারছে না এবং প্রয়োজনীয়মাফিক বাজার তথ্য পাচ্ছে না।

- ফসল কাটা এবং ফসল কাটা উত্তর কৌশল বিষয়ে জ্ঞান: ফসল কাটা পরবর্তী দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং সীমিত সংরক্ষণ সুবিধার কারণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষিপণ্য নষ্ট হয়। কৃষকরা বিশেষত ক্ষুদ্র কৃষকরা আয় এবং খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

অন্তর্ভুক্তির অভাব

- বাজারে প্রবেশগম্যতা এবং তথ্য: বাজারে প্রবেশের চ্যালেঞ্জ এবং বাজার মূল্য সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্যের অভাবের কারণে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে বাজার মধ্যস্বত্বভোগী এবং মধ্যস্ততাকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বিশেষত এর ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। রোগের সংক্রমণ এবং কীটনাশক সম্পর্কে সময়মতো এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার ঘাটতির কারণেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসল নষ্ট হয় এবং উৎপাদন ও ফলনে তা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

- লিঙ্গ বৈষম্য: কৃষি খাতের শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ নারী হলেও তারা প্রায়শ সম্পদ, জমি ও ঋণ প্রাপ্তিতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। এই সীমাবদ্ধতা কৃষি উন্নয়নে এবং বাজার ও শিল্পের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টিতে তাদের সম্ভাব্য অবদান রাখার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে।

- দুর্বল পানি-ব্যবস্থাপনা: পানির অভাব এবং অদক্ষ সেচ ব্যবস্থা বাংলাদেশের কৃষির বড় উদ্বেগের জায়গা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পানির স্তর নিচে নামছে এবং ভূ-উপরিভাগে পানি ধরে রাখার স্তরও নিম্ন পর্যায়ের। এসব বিষয় কৃষির উৎপাদনশীলতা বিশেষত বৃষ্টিনির্ভর এলাকার উৎপাদনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

যথোপযুক্ত সরকারি নীতির ঘাটতি

- নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা: যথাযথ নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ঘাটতি বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈচিত্র্যময় কৃষি প্রবৃদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ। যেমন- প্রক্রিয়াজাত খাদ্য নিরাপদ রাখা এবং গুণগত মান বজায় রাখার জন্য কৃষকরা সহযোগিতা পান না বললেই চলে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশের জন্য যা প্রয়োজনীয়। বাণিজ্য বাধা এবং কিছু শস্যকে সহায়তা করার নীতি (অন্যদের জন্য নয়), কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও বৈচিত্র্যকরণের প্রতি বৈরিতা এবং সীমাবদ্ধতা কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশকে সীমিত করছে।

- গবেষণা ও উন্নয়নে সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ খুবই কম। এতে করে উদ্ভাবনী চর্চা এবং যথাযথ প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে নেতিবচাক প্রভাব পড়ছে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, শস্যের বৈচিত্র্যময় জাত এবং টেকসই চর্চা গ্রহণকে যা নিরুৎসাহিত করছে।

- ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা: এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, কিছু বিষয় যেমন– পরিবেশের পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা ও বন্যা, কীট-পতঙ্গের উৎপাত, রোগ–বালাই এবং দামের অস্থিরতা কৃষকদের উৎপাদন ও জীবিকা উন্নয়নের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করছে। শস্য বীমা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অনুপস্থিতি কৃষকদেরকে কৃষি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করছে, যেখানে ঝুঁকি এবং অর্জন দুটোই উচ্চমাত্রার বলে মনে করা হয়।

- অনিরাপদ মধ্যস্বত্ব জমি: বাংলাদেশে জমির একটা বড় অংশ বর্গাদানের মাধ্যমে চাষ হয়। বিদ্যমান বর্গাচাষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা রয়েছে যা কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করছে এবং বৈচিত্র্যময় চাষ ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিতে বর্গাচাষীদের আগ্রহকে নিরুৎসাহিত করছে।

- অপর্যাপ্ত গ্রামীণ অবকাঠামো: গ্রামীণ অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততার কারণে সড়ক, সেচ ব্যবস্থা, হিমাগার, প্যাকেটজাত করার যন্ত্রপাতি, আকাশপথে পরিবহণ, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহণ চেইনসহ নানা সীমাবদ্ধতার ফলে কৃষিপণ্যের দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে না এবং এর ফলে ফসল কাটা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার অভাব সম্পূরক কৃষিপণ্য আনার সম্ভাবনাকে সীমিত করছে, বাজারে বৈচিত্র্যময় কৃষি পণ্যের প্রাপ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং সামগ্রিক ভ্যালু চেইনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

- ক্রয় এবং মূল্য নির্ধারণ নীতি: অনুমানযোগ্য এবং সুপরিকল্পিত শস্য সংগ্রহ নীতি ও ক্রয় প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি আয়ের নিরাপত্তা বিবেচনায় কৃষকদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং একই সঙ্গে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করছে। এ কারণে শুধু কৃষকদের নয়, ভোক্তাদের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং এর ফলে কৃষিখাতের সামগ্রিক সফলতায়ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

- জমি বণ্টন নীতি: বলতে গেলে বাংলাদেশ জমি এবং বর্গাব্যবস্থার সংস্কারে কোনো অর্থবহ পদক্ষেপ নেয় নি। জমির বিভাজন শেষ পর্যন্ত ভূমিহীনতা তৈরি করেছে, যা বাংলাদেশের কৃষির একটি সাধারণ ও চলমান প্রবণতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর ফলে প্রান্তিক কৃষকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা শেষ পর্যন্ত কৃষি শ্রমিকদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। ফলত তাদের দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়তে হয়েছে এবং এতে তাদের জীবিকার সুযোগ সুবিধা কমেছে।

ওপরের এসব চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনাকে সীমিত করেছে। এগুলো পরস্পর সম্পর্কিত এবং প্রায়শ একটি অন্যটির দ্বারা প্রভাবিত। উল্লেখ্য যে, একটি গবেষণায় দেখা গেছে ,কৃষি খাতের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে তাদের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কৃষকদের আয় ৮৫ শতাংশ বাড়াতে পারবে (Goyal et al., 2017)। এটি কৃষির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে এবং উল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারলে বাংলাদেশও তা অর্জন করতে পারবে।

শিল্পের সঙ্গে শক্তিশালী সংযোগসহ বাংলাদেশে একটি বৈচিত্র্যময় কৃষি খাত গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের কিছু সুপারিশ পরবর্তী অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।

২. সুপারিশমালা

বাংলাদেশের কৃষি খাতের রূপান্তর এবং আধুনিকায়ন কৃষকদের এবং একই সঙ্গে দেশের জন্যও বিস্তৃত সুবিধা নিয়ে আসবে। এগুলো শ্রম ঘণ্টা কমাবে, উচ্চমাত্রার ফলন দেবে, সম্পদের (জমি, শ্রম, মূলধন) কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, আয় বাড়াবে, দারিদ্র্য ও দুর্দশা কমাবে, খাদ্য নিরাপত্তা বাড়াবে এবং অপুষ্টি কমিয়ে আনবে। কৃষির আধুনিকায়ন অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার অভিযাত্রায় সহায়তা করবে (Boettiger et al., 2017)। এ ধরনের রূপান্তর কৃষক, সরকার, বেসরকারি পক্ষ/কুশীলব, এনজিও ও অন্যান্য বেসরকারি স্বত্ত্বা, গবেষক দল, উপাত্ত সরবরাহকারীসহ সকল সম্পৃক্ত অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতার প্রয়োজনীতা প্রদর্শন করবে। উপরে উল্লেখিত চ্যালেঞ্জ সমূহের আলোকে নিচে একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো, যা তিনটি ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো – বহুমুখীকরণ, অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সুশাসন। লক্ষ্যাভিমুখী ধারণাটি হলো– বাংলাদেশে একটি বিশেষায়িত বাণিজ্যিক, উৎপাদনশীল এবং শিল্প–সংযুক্ত কৃষি খাত উন্নয়ন, যা একই সঙ্গে হবে আধুনিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক।

বহুমুখীকরণ

উৎপাদনশীলতা চালিত বহুমুখীকরণের ওপর জোর দিতে হবে। এর জন্য কৃষি–চর্চা, দক্ষতা, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন হবে। এসব ক্ষেত্রে উদ্বেগ মোকাবিলার মাধ্যমে কৃষকরা বিশেষত

ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের আয় বাড়াতে এবং তা টেকসইভাবে বাড়াতে, ভোক্তার চাহিদা মেটাতে এবং প্রবেশগম্য বাজার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে।

■ দক্ষতার উন্নয়ন

- দক্ষতা-চাহিদা মূল্যায়ন এবং সক্ষমতা বাড়ানোর পদক্ষপ গ্রহণ: কৃষির ভ্যালু চেইন জুড়ে বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় জ্ঞান চিহ্নিত করার প্রয়োজনে একটি সমন্বিত দক্ষতা চাহিদা মূল্যায়ন করতে হবে। এ ধরনের মূল্যায়ন কৃষি খাতের চাহিদার আলোকে লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করবে। আধুনিক কৃষিচর্চায় উৎসাহ দিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মশালা এবং জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে কৃষকদের সক্ষমতা বাড়ানোর দরকার হবে। সর্বাধিক সম্ভাব্য ফলন এবং ফসলের গুণগত মান বজায় রাখতে সর্বোত্তম চাষ পদ্ধতি, শস্য ব্যবস্থাপনা এবং ফসল কাটা পরবর্তী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কৃষকদের জানার দরকার হবে। কৃষকদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ ও পরামর্শক সেবা দিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এই কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনাকরতে হবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান এবং বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে গভীর অনুধাবনের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং সহযোগিতা অবশ্যই জোরদার করতে হবে।

■ আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি গ্রহণ এবং অভিযোজন

- জলবায়ু-বান্ধব/উপযোগী/স্মার্ট কৃষি চর্চায় সম্প্রসারণে সহযোগিতা: জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও দুর্দশা কমাতে এনএপি-২০২২ ৬টি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং এর দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো - খাদ্য,পুষ্টি এবং জীবিকার নিরাপত্তা উন্নয়ন। এ বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে সহনশীলতা তৈরিতে কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা, টেকসই চাষ কৌশল এবং জলবায়ু সহনশীলকৃষি চর্চা এবং প্রযুক্তি গ্রহণের মতো জলবায়ু-স্মার্ট/উপযোগী কৃষি চর্চা উৎসাহিত করা উচিত। পরিবেশের বিপর্যয় রোধ করতে, এড়াতে এবং বন্ধ করতে উদ্যোগ দরকার। এক্ষেত্রে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে দেখা উচিত।

- ছোট আকারের/ক্ষুদ্র পর্যায়ের প্রযুক্তিগত সমাধান: বাংলাদেশের কৃষির চলমান যান্ত্রিকীকরণে দিক-নির্দেশনা দিতে ছোট আকারের প্রযুক্তিগত সমাধানকে উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পরিস্থিতি/বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে যেমন- বৃহৎ কমাইন্ড হারভেস্টার বা ফসল কাটার বড় যন্ত্র ব্যবহার শুধু অনেক ব্যয়বহুল নয়, দেশের অধিকাংশ এলাকায় এর ব্যবহার প্রযুক্তিগতভাবে যুৎসই নয়। এক্ষেত্রে নীতি, লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি (প্রয়োজন হলে) এবং সরকারি সহায়তার মাধ্যমে অবশ্যই প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে। সরকারের উচিত দলভিত্তিক ক্রয় ও সমবায়, ইজারা ও ভাড়ার ব্যবস্থা করা, ব্যবহৃত উপকরণের বাজার সৃষ্টি করা এবং এনজিও ও কৃষি সংগঠনের মধ্যে অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া। এক্ষেত্রে ছোট আকারের এবং ব্যয় সাশ্রয়ী প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনে স্থানীয় উৎপাদন ও সংযোজন কারখানাগুলোকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

- আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা: যথাযথ ও আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং অভিযোজনে প্রণোদনা দেওয়া উচিত। উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাতের শস্য এবং খরাও বন্যা সহনশীল নানা জাতের বীজ উৎপাদনে উৎসাহ দিতে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে পোকামাকড় ও রোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)গ্রহণ করা উচিত।

- স্থানীয়/দেশীয় কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদনে সহায়তার উদ্যোগ/পদক্ষেপ নেওয়া: ছোট আকারের কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ক্ষুদ্র পর্যায়ের উৎপাদন ও সংযোজন গ্রামীণ অর্থনীতিকে প্রাণসঞ্চার করবে এবং কৃষি ও শিল্পের সংযোগকে শক্তিশালী করবে। এটি আমদানি-বিকল্প হিসেবে কাজ করবে, আমদানি ব্যয় কমাবে এবং কৃষকদের কাছে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতাকে আরও সাশ্রয়ী করবে।

■ উদ্ভাবন

- কৃষিজাত উদ্ভাবন উৎসাহিত করা: কৃষক, উপকরণ সরবরাহকারী, উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নেটওয়ার্কিং ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষণকে উৎসাহিত করতে সরকারের উচিত একটি ক্ষেত্র/মঞ্চ তৈরি করা। যেসব কৃষক চুক্তিভিত্তিক চাষ (কন্ট্রাক্ট ফার্মিং) করেন, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবা, কারিগরি সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা নিতে এবং উন্নত কৃষি চর্চা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং বাজার তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) পাঠাতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে জমি চাষে সহায়তা দিতে পানি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে। প্রাকৃতিক/ অর্গানিক সার ব্যবহারে কৃষকদের অনুপ্রেরণা দিতে হবে। ফসল কাটা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবং পণ্য/পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের তুলনামূলক ভালো সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধা দিতে হবে।

- বৈচিত্র্যপূর্ণ/বহুমুখী এবং নানাবিধফসল চাষ চালু করা: বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল চাষ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য কৃষকদের ভর্তুকি ও আর্থিক সহায়তার আদলে প্রণোদনা দিতে হবে। বিদেশের বাজারে রপ্তানি করতে আখ, পাট ও অন্যান্য ফসলের মতো অর্থকরী ফসলের বাণিজ্যিক চাষ উৎসাহিত করতে হবে। বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বাড়াতে কৃষি পণ্যের বিপণনে বিনিয়োগ করতে হবে। নানাবিধ ফসল চাষ উৎসাহিত করতে হবে। বর্ষাকাল এবং শুকনো মৌসুমের ধান চাষের মধ্যবর্তী সময়ে অন্যান্য ফসল বিশেষত আলু ও পেঁয়াজের মতো উচ্চ-চাহিদার/উচ্চমূল্য/হাই-ভ্যালু পণ্যের চাষের জন্য জমি খালি পেতে স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন হয় এমন জাতের ধান চাষ শুরু করতে হবে। স্থানীয় কৃষি-প্রতিবেশ-ভৌগোলিক ব্যবস্থার সুফল বিবেচনায় নিয়ে শস্য বহুমুখীকরণের সুবিধা সম্পর্কে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

■ অর্থায়ন ও প্রণোদনায় ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাপ্তি/প্রাপ্যতা/ প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে

- আধুনিক উপকরণ, সরঞ্জাম এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য সক্ষমতা বাড়াতে কৃষকদের বিশেষত ক্ষুদ্র কৃষকদের সহজে ঋণ এবং আর্থিক সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকদেরকে ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষম করতে প্রয়োজনীয় স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। ফসল হানি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আর্থিক ক্ষতি বয়ে আনতে পারে এমন অন্যান্য ঝুঁকি থেকে কৃষকদের রক্ষায় বীমা স্কিম চালু করতে হবে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ভালো করবে এবং ধারাবাহিকভাবে উচ্চ মানের পণ্য উৎপাদন ও ভালো মানদণ্ড অনুসরণ করতে পারবে তাদেরকে স্বীকৃতিসহ প্রণোদনা দিতে হবে। কৃষি জমি হারালে তার পরিণতি এবং ধরে রাখলে এর দীর্ঘমেয়াদি মূল্য সম্পর্কে সংবেদনশীল কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচি নিতে হবে।

- ভ্যালু চেইনে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে: ভ্যালু চেইনে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের (প্রাথমিক উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত) সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে উল্লম্ব সমন্বয়ের/উচ্চ সমন্বয়ের বৃদ্ধির/সমন্বয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে। উদহারণস্বরূপ – সুপারমার্কেটের সাথে কৃষকদের সরাসরি যোগাযোগ ঘটাতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহের পরিষদের মাধ্যমে ’গুচ্ছগ্রাম’ ধারণা চালু করতে

হবে। সম্প্রসারণে (পশ্চাৎ এবং সম্মুখ সংযোগ) দৃষ্টি দিতে হবে এবং অনুভূমিক সমন্বয় (একই পর্যায়ের অংশীদের/কুশীলবদের/অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে) জোরদার করতে হবে।

- গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিবাসন নিরুৎসাহিত করতে হবে: গ্রামের অ-কৃষি খাতে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে যুব অভিবাসন কমাতে মধ্যমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সেবায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

- জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকির বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে: জলবায়ুর কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে কৃষকদের শিক্ষা দিতে হবে। খরা, আবহাওয়ার অনিয়মিত ধরণ, বন্যা ইত্যাদিসহ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে। ঝুঁকি কমায় এমন নিরাপদ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং বিশেষ অঞ্চল-ভিত্তিক চাষের বিষয়ে উৎসাহিত করতে কমিউনিটি এবং দল-ভিত্তিক কৌশল গ্রহণ করে জলবায়ুর ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় নানা ধরনের ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করতে হবে (Khanam,2021)।

- ■ অন্তর্ভুক্তি

ক্ষুদ্র এবং বড় কৃষকদের মধ্যে আয়ের বৈষম্য কমাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ জোরদার করা দরকার। এজন্য ক্ষুদ্র পর্যায়ের কৃষক ও নিম্ন আয়ের গ্রামীণ পরিবারগুলোকে জরুরি সেবা পেতে সক্ষম করতে এবং তাদের জীবন মানের উন্নতি ঘটাতে লক্ষ্যনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির জন্য ক্ষুদ্র কৃষকদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সুপারিশমালাা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

তথ্য এবং সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা: ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য গুণমানসম্পন্ন বীজ, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রণোদনা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সর্বোত্তম কৃষি চর্চা এবং যথাযথ প্রযুক্তিসহ সরকার ঘোষিত/সরকারি অন্যান্য তথ্য কৃষকরা যাতে সহজে পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্যের চাহিদা এবং মূল্যের প্রবণতার বিষয়ে কৃষকদের তাৎক্ষণিক উপাত্ত সরবরাহ করতে শক্তিশালী বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। আবহাওয়া বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাসের তথ্য-প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। ভোক্তার অগ্রাধিকার, বিশ্ব বাজার এবং মূল্য প্রবণতার বিষয়ে কৃষকদের তথ্য দিতে হবে এবং বাজার চাহিদা অনুযায়ী তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যহত রাখতে সহায়তা দিতেহবে। এজন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করতে হবে।

জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিতকরণ: কৃষকদের সহায়তার ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের চাহিদার প্রতি মূল দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে তারা সম্পদ, তথ্য এবং প্রশিক্ষণে সমান সুযোগ পায়।

- প্রান্তিক কৃষকদের জন্য একটি যথোপযুক্ত আয়ের নিশ্চয়তা দিতে হবে: এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এসব পদক্ষেপ নিতে পারে: (১) কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম প্রতিশ্রুত মূল্য নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কৃষি পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করতে হবে; (২) মূল্য স্থিতিশীল রাখতে এবং মূল্যের দ্রুত ওঠানামা আটকাতে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্য মজুত রাখতে হবে। মূল্যের দ্রুত ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে ঘাটতির সময়ে সরকারের উচিত মজুত থেকে খাদ্যশস্য ছাড় করা; (৩) উৎপাদন অংশীদারের ভিত্তিতে সরকারের ক্রয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। বাম্পার ফলনের বছরে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারি সংগ্রহ বাড়াতে হবে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রির বিষয়ে কৃষকদের যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য কৃষকদের কাছে পণ্যের নির্ভরযোগ্য ও সময়মতো তথ্য সরবরাহের একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে; এবং (৪) উৎপাদিত পণ্যের তুলনামূলক ভালো দরের জন্য যৌথভাবে সমঝোতা করতে এবং সরকারি সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের ক্ষমতায়নে কৃষক/উৎপাদনকারী সংগঠন এবং সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ দিতে হবে।

- বাজারে প্রবেশগম্যতা এবং সংযোগ স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে: উন্নততর বাজার অবকাঠামো এবং তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানি, রপ্তানিকারক ও খুচরা বিক্রেতাসহ কৃষক ও ক্রেতাদের বাজারে প্রবেশগম্যতা উৎসাহিত করতে হবে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় কৃষকদের জন্য কৃষি বাণিজ্য এবং খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে উৎসাহ দিতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং উৎপাদিত পণ্যের তুলনামূলক ভালো দর নিশ্চিত করতে শক্তিশালী বাজার সংযোগ স্থাপনে কৃষক-সমিতিগুলোকে সাহায্য করতে হবে। উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের জন্য ন্যায্য দর নিশ্চিত করতে একটি টেকসই যোগান-চাহিদা শৃঙ্খলের বিকাশ সাধন করতে হবে। বিশেষ কৃষি পণ্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশেষায়িত বাজার গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য বেসরকারি খাত এবং কৃষি সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দিতে হবে। সরকারের ট্যারিফ নীতি এবং আর্থিক পদক্ষেপ অবশ্যই টেকসই কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ুর প্রভাব প্রশমন এবং কৃষির আধুনিকায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই নির্দেশিত/ পরিচালিত হবে।

■ পরিচালন ও নীতি

- নীতি সংস্কার: কৃষি খাতের উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে কৃষির নীতি ও আইন-কানুন পর্যালোচনা ও হালনাগাদ এমনভাবে করতে হবে যাতে শিল্পের সাথে পূর্বাপর সংযোগ শক্তিশালী হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা ও ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে (অতীতের কিছু অভিজ্ঞতা আগের অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ লক্ষ্যে (ক) দরিদ্র কৃষকদের জন্য রেন্টাল সেবা সাশ্রয়ী করতে হবে। এ জন্য একটি নিবেদিত সেবা প্রদানকারী নির্ধারণ করা যেতে পারে, যার পরিচালনা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে যে, সেবা প্রদানকারী এই সেবার জন্য অযৌক্তিকভাবে উচ্চ সেবা খরচ নিতে পারবে না; (খ) কৃষির উন্নয়ন এবং চাষাবাদে আধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতায় উৎসাহ দিতে হবে; (গ) কৃষি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সহায়তার যথাযথ নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং ভ্যালু চেইন সিদ্ধান্তে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে; (ঘ) প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনে সহায়তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যেমন- তৃতীয় পক্ষের মান বিষয়ে সম্মতিসূচক স্বীকৃতি, যা ভালো মানের পণ্যের জন্য উচ্চ মূল্য নিশ্চিত করবে; (ঙ) গুণগত মান বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের যথাযথ প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে; (চ) জমির ইজারা নিরাপত্তার উন্নয়নে ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে, জমির খণ্ডতা কমাতে হবে এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা-ভিত্তিক কার্যকর জমিতে চাষাবাদে উৎসাহ দিতে হবে; এবং (ছ) বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষাকারী নীতির বিপরীতে দরিদ্র কৃষকবান্ধব কন্ট্রাক্ট ফার্মিং নীতি উৎসাহিত করতে হবে। জমির মালিকের অনুপস্থিতি ইস্যু মোকাবিলায় জমির ব্যবহার, বর্গা অধিকার এবং কর নির্ধারণ বিষয়ে আইন-কানুন ও নীতি থাকতে হবে। জমি ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও সম্পৃক্ত হতে অনুপস্থিত জমির মালিকদের উৎসাহ দেওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।

- খাদ্য নিরাপত্তা ও গুনগত মান বজায় রাখার জন্য সহায়তা: খাদ্য নিরাপত্তা এবং গুণগত মান বজায় রাখতে কৃষকদের সহায়তা করতে হবে যাতে উচ্চ মূল্যের বাজারে তারা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক গুণগত মান ও নির্দেশিকা অনুসরণে উৎসাহ দিতে হবে যাতে বাংলাদেশের কৃষি পণ্য বৈশ্বিক বাজার চাহিদা এবং মান নিশ্চিত করতে পারে। স্বাস্থ্যবিষয়ক ও কৃষিপণ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার শর্ত এবং কারিগরি বাধা এবং মান ও নির্দেশিকা/সনদ বিষয়ে কৃষকদের সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

- সরকারি ক্রয় নীতি পর্যালোচনা: সরকারি ক্রয় নীতি পর্যালোচনা করতে হবে যাতে প্রাতিষ্ঠানিক খাদ্য ক্রয় কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশের টেকসই সরকারি ক্রয় (এসপিপি) নীতি টেকসই সরকারি ক্রয়ের বাস্তবসম্মত তথ্য সরবরাহ প্রদান করে এবং সবচেয়ে টেকসই ক্রয় সিদ্ধান্ত বাছাই করে। যথাযথ অগ্রাধিকার দিয়ে এই নীতি বাস্তবায়ন করা উচিত।

- গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ: নতুন প্রযুক্তি, শস্যের বৈচিত্র্য এবং টেকসই চর্চার জন্য গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে এবং রপ্তানি আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে রপ্তানি সম্ভাবনা থাকা উচ্চমূল্যের ফসল ও পণ্যের গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। উচ্চ মানের বীজ উৎপাদনে এবং বিশেষত জলবায়ু সহনশীল চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণায় অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে।

- কার্যকর যোগাযোগের সংস্থান: খরা ও অতিবৃষ্টিজিনত বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনে সরকারের নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত : (১) অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার মতো বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করতে হবে এবং দুর্যোগ মোকাবিলা করার উপায় শেখাতে হবে; (২) পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, কমিউনিটি প্রস্তুতি, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার শক্তিশালী পরিকল্পনা এবং টেকসই ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা চর্চার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে; এবং (৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সময়মতো মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন এবং সামাজিক মাধ্যমে পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সতর্কতা জারি করতে হবে।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি ব্যবস্থার গুরুত্ব বলাই বাহুল্য। জিডিপিতে এই খাতের অবদান কমতে থাকলেও এদেশের জনগণের বড় অংশের জীবিকা কৃষির ওপর ওতপ্রোতভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি খাত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কিন্তু এ খাতে অনেক সুযোগও রয়েছে। অর্থনীতিতে এর অবদান অব্যাহত রাখতে বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে হবে এবং সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে এই নীতি বিবৃতিতে/পলিসি ব্রিফ কৃষকদের বিশেষত প্রান্তিক কৃষকদের উদ্বেগ এবং স্বার্থ মাথায় রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেছে ।

নীতি বিবৃতিতে/পলিসি ব্রিফে তুলে ধরা হয়েছে যে, কিছু প্রধান উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে জমির খণ্ডতা, বছরের পর বছর একই জমিতে একই ফসল, বহুমুখীকরণের অভাব, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব, যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাব, মূল্যের অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা এবং আধুনিক চাষ ও উপকরণ, দেশে ও বিদেশে বাজার সুযোগ এবং শিল্পের সাথে পূর্বাপর সংযোগের অভাব। ক্ষুদ্র কৃষকরা বিশেষভাবে ঝুঁকিগ্রস্ত, কেননা জলবায়ুর প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা কম, ঝুঁকি প্রশমন কৌশল সম্পর্কে জানার ঘাটতি এবং জমি বর্গা সম্পর্কে রয়েছে তাদের অনিশ্চয়তা।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নীতি সংস্কার, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে উচ্চহার বিনিয়োগ, কার্যকর জ্ঞান বিতরণ এবং ঝুঁকি প্রশমন ও উদ্ভাবনী চর্চা গ্রহণে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বাড়ানোসহ একটি সমন্বিত কর্ম-কৌশল দরকার হবে। এক্ষেত্রে সরকার, আন্তর্জাতিক ও দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং বেসরকারি খাতসহ প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্টদের দিক থেকে সমন্বিত প্রচেষ্টার দরকার হবে। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি, কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, শস্য বীমা চালু এবং বাজারের সাথে কৃষকদের সংযোগ ঘটানোর মাধ্যমে আধুনিকীকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণে উৎসাহ দিতে হবে। বর্গাচাষ সংস্কার এবং ক্রয় সংক্রান্ত নীতি ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থ বিবেচনায় প্রস্তুত করতে হবে যাতে কৃষি রূপান্তর একই সাথে উৎপাদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়।

এই নীতি বিবৃতি তিনটি বৃহৎ ক্যাটেগরিতে (বহুমুখীকরণ, অন্তর্ভুক্তি এবং পরিচালন) কৃষিকে বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলা করে অর্থনীতির একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশে রূপান্তরের সুপারিশ করেছে। আশা করা যায়, বিশেষ প্রসঙ্গ ও স্থানিক বিবেচনায় প্রণীত এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে, টেকসই পরিস্থিতির প্রসার ঘটবে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুবিধা বাড়বে এবং বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্যের প্রবেশ নিশ্চিত হবে। এর মাধ্যমে সরকার এবং সমস্ত অংশীজনদের নীতি এবং উদ্যোগে দরিদ্র

কৃষকদের স্বার্থ প্রতিফলিত হবে। কৃষিতে উচ্চ উৎপাদনশীলতা প্রাণিজ সম্পদ, পোলট্রি এবং মৎস্য চাষের মতো অ-শস্য কৃষি চর্চার জন্য ভূমি সম্পদের প্রাপ্যতা বাড়াবে। এছাড়া এসব কার্যক্রম গ্রামীণ যুব শ্রেণি এবং বেকার ও ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি টেকসই প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং কাউকে পেছনে না রেখে বাংলাদেশের এসডিজি আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তা করবে।

২

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে যুবদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর
কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড

পেনহোল্ডার

তানভীর সোবহান
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

এ.কে.এম. ফাহিম মাসরুর
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বিডিজবস.কম

আমজাদ হোসেন
চেয়ারম্যান, সার্ক চেম্বার ইয়ং এন্টারপ্রেনারস ফোরাম
এবং
সাবেক পরিচালক, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)

মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন
ভাইস প্রেসিডেন্ট
ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ই-ক্যাব)

নাজমুল আহসান
ম্যানেজার – ইয়ং পিপল
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ

ড. সায়মা হক বিদিশা
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সেলিম রায়হান
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
নির্বাহী পরিচালক, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)

সালেহ আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক
বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

শামস মাহমুদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
শাশা ডেনিমস

ড. সুবর্ণ বড়ুয়া
অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. জাহিদ হোসেন
সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ
বিশ্ব ব্যাংক

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যাভিত্তিক দৃশ্যপটের বৈশিষ্ট্য হলো এর বৃহৎ একটি অংশ তরুণ। এই বিপুলসংখ্যক তরুণ দেশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ অনেক সুযোগ তৈরি করেছে। সেই সঙ্গে দেশকে কঠিন কঠিন কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নানা আর্থ-সামাজিক সূচকগুলোতে দেশের অর্জন ও এই সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড অভাবনীয় প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিষয়টি ব্যাপকভাবে সমাদৃতও হয়েছে। তবে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সব সময় সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যথেষ্ট সুফল বয়ে আনে না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সবার জন্য বিশেষ করে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং যাদের পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে তাদের জন্য ভালো মানের কর্মসংস্থান তৈরির নিশ্চয়তাও দেয় না। এরকম পরিস্থিতি বাংলাদেশেও ঘটেছে বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। বিশেষ করে তরুণদের কাজের সুযোগ, শোভন কর্মসংস্থানে সীমিত অভিগম্যতা এবং দক্ষ মানবসম্পদের অভাব চলমান প্রকট সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে।

এই প্রেক্ষাপট থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, দেশের শ্রমবাজারে উদ্ভব হওয়া চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় দৃঢ়নিবদ্ধ উদ্যোগ দরকার। এই কাজের দুটি দিক রয়েছে: একটি হলো অর্থনীতিকে ক্রমবর্ধমান তরুণ জনসংখ্যার কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতেই হবে। অন্যদিকে রয়েছে যে শ্রমের বাজারে অংশ নেওয়া তরুণদের কর্মক্ষেত্রের চাহিদামাফিক নির্ধারিত সব দক্ষতা নিশ্চিত করা। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এই নীতি বিবৃতি কয়েকটি বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই সূত্রে এগুলো মোকাবিলা করার লক্ষ্যে এই বিবৃতি কিছু নির্দিষ্ট দিকনির্দেশামূলক বিষয় উল্লেখ করছে। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে তরুণদের মধ্যে উচ্চমাত্রার বেকারত্ব ও নিম্নমানের কর্মসংস্থান, বিদেশে কর্মসংস্থানের ধরন, শোভন কর্মসংস্থানের অভাবসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আধিক্য, নিম্নহারের নারী-কর্মশক্তির অংশগ্রহণ, ব্যাপকভাবে বিদ্যমান নাজুক কর্মসংস্থান, কাজ ও দক্ষতার গরমিল এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জসমূহ। এই নীতি বিবৃতিতে প্রান্তীয় ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের তরুণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন বিবেচনায় বেশ কিছু নির্ধারিত সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। চ্যালেঞ্জগুলো সামলানোর জন্য অন্য দেশগুলোয় নেয়া সফল কৌশল ও নীতিমালা থেকে অর্জিত শিক্ষা এই নীতি বিবৃতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সুপারিশমালায় সামগ্রিক ও কাজে প্রয়োগযোগ্য কর্মকৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর লক্ষ্য বাংলাদেশের শ্রমবাজারের দৃশ্যপট পুনর্বিন্যাস করা/ঢেলে সজানো/ নতুনভাবে গঠন করা। এর ফলে যাতেশ্রম ও বাজারের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ তৈরি,অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেও প্রাতিষ্ঠানিক খাতের বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশন, বিদেশে অভিবাসনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা, শ্রমবাজারের অংশগ্রহণকারীদের কাজের শোভন পরিবেশ নিশ্চিতকরণও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণ করা এবং উদ্যোক্তা তৈরির বিষয়ে প্রচারণা চালানো যায়। এই নীতি বিবৃতি সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের প্রয়োজনের দিক সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল করেছে, বিশেষ করে শোভন কর্মসংস্থানসহ যে প্রয়োজনগুলো 'এসডিজি-৮'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে কাউকে পেছনে না ফেলে।

দরকারি করণীয় বিষয়সমূহের দিকে আকৃষ্ট করতে আহ্বান হিসেবে এই নীতি বিবৃতি কাজে লাগতে পারে। এটি সব অংশীজনকে একটি গতিশীল শ্রমবাজার তৈরিতে সহযোগিতা ও তাদের প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় আনার আহ্বান জানাচ্ছে। এই শ্রমবাজার বাংলাদেশের যুবকদের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে জনমিতিক লভ্যাংশের সুফল আনতে সহায়ক হবে।

উদীয়মান উদ্বেগসমূহ

বাংলাদেশের শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বেশ কিছু করণীয় রয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রণিধানযোগ্য উপায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অনেক উদ্বেগের বিষয় রয়েছে:

- যুবকদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব ও যোগ্যতার তুলনায় নিচু মানের কর্মসংস্থান
- চাকরিতে/কর্মসংস্থানে, পড়াশোনায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নেই (এনইইটি বা নিট) - এমন তরুণদের উচ্চ অনুপাত
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ
- কর্মসংস্থানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আধিপত্য এবং শোভন চাকরির/কর্মসংস্থানের অভাব
- শ্রমবাজারে নারীদের কম অংশগ্রহণ
- নাজুক কর্মসংস্থানের ব্যাপকতা
- দক্ষতার গরমিল এবং আচরণগত পক্ষপাত
- কাজের ভবিষ্যৎ এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

যুবকদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব এবং যোগ্যতার তুলনায় সীমিত কাজ

পুরো বিশ্বে যেসব দেশে ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী মানুষের বসবাস সর্বাধিক বাংলাদেশ সেইসব দেশের অন্যতম। এই জনমিতিক গঠন অনেক সুযোগ সৃষ্টি করলেও অনেকগুলো কঠিন কঠিন চ্যালেঞ্জও সামনে এনে দাঁড় করায়। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের জন্য শ্রমবাজার জয়-পরাজয়ের একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে সফলতা বা ব্যর্থতার ওপরেই বাংলাদেশের সত্যিকার উন্নতি নির্ভর করে। প্রায় সাড়ে ১০ কোটি অথবা জনসংখ্যার ৬২ শতাংশ মানুষ ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়স সীমার অন্তর্গত। এই বয়সের জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম/কর্মবয়সী মানুষ হিসেবে ধরা হয়। প্রায় ৪ কোটি ৭৪ লাখ তরুণ ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সসীমার মধ্যে রয়েছে। এই বয়সসীমার লোকজন শ্রমশক্তির প্রায় ৪৬ শতাংশ। উল্লেখ করা জরুরি যে, গত কয়েক বছরেই ৭০ লাখ তরুণ জনগোষ্ঠী চাকরির বাজারে প্রবেশ করেছে। এসব যুব নারী ও পুরুষের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করা দেশের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। আবার এই জনসংখ্যা জনমিতিক লভ্যাংশের ইতিবাচক দিকও ইঙ্গিত করে। তাদের কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা কাজে লাগানো যেতে পারে।

২০২২ সালে বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ১০.২ শতাংশ, যা জাতীয় গড়ের ৩.৬ শতাংশহারের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। এই পরিস্থিতি মূল্যায়ন থেকে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে এর গতিবিধি সম্পর্কে বোঝা যায়। এই বাজারে তরুণদের চাকরি পেতে অযৌক্তিক পর্যায়ের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় সমানুপাতিক নয়। এতকিছুর পরও রয়েছে ছদ্ম বেকারত্বের মতো সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে একজন মানুষ তার যতক্ষণ কাজ করার সামর্থ্য আছে তার চেয়ে কম সময় সুযোগ পায়। এছাড়া অনেকে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার হয় নাএমন পর্যায়ের কাজ করতে বাধ্য হয়।

'কর্মসংস্থানে, পড়াশোনায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নেই (এনইইটি বা নিট)' - এমন তরুণদের উচ্চ অনুপাত

এই দেশের প্রায় ৩ কোটি ৭১ লাখ মানুষ নিট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মোট তরুণ জনগোষ্ঠীর প্রায় ২৭ শতাংশ নিট গোষ্ঠীতে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিকটু হারে লিঙ্গবৈষম্যও দেখা দেয়। নিট শ্রেণির তরুণ-বয়সী মানুষের নব্বই শতাংশই নারী। এই উল্লেখযোগ্য লিঙ্গবৈষম্য উদ্বেগের আরেকটি কারণ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিদেশে চাকরি করার সুযোগ তরুণদের কর্মসংস্থানের অন্যতম ক্ষেত্র। বিশেষ করে যেই তরুণরা কম দক্ষ এবং দুর্দশাগ্রস্ত গোষ্ঠীর মানুষ তাদের ভিনদেশে কর্মসংস্থান করা জরুরি। বর্তমানে বাংলাদেশি ৭৫ লাখ অভিবাসী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই তরুণ, যাদের

মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ। তবে ইদানীং নারীদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। কেবল গত তিন বছরে ২৫ লাখেরও বেশি মানুষ দেশের বাইরে কাজ করতে গেছেন। এদের অধিকাংশই নামমাত্র দক্ষ শ্রমিক যারা দেশের বাইরে অনেক ধরনের কঠিন পরিস্থিতির শিকার হন। এমনকি তাদের মজুরি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সমপর্যায়ের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক অনেক কম।

অভিবাসন ব্যয়

অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা অভিবাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয়। তবে এই প্রতিবন্ধকতা হজম না করে তাদের আর কোনো উপায় থাকেনা। এই ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নিয়োগ ফি, ভিসা ফি, স্বাস্থ্য পরীক্ষার খরচ, যাতায়াত ব্যয় এবং রিক্রুটিং এজেন্সির ধার্য করা অনেক বেশি মাত্রার কমিশন বাবদ খরচের বোঝা।

প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড

অভিবাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতারণামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশের ব্যাপক নৈমিত্তিক ঘটনা। সম্ভাব্য অভিবাসীদের জন্য এই বিষয়টি সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ। অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো প্রায়ই প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি হাতে নেয়। তারা চাকরির সুযোগ-সুবিধা, কর্মপরিবেশ ও বেতন সম্পর্কে চাকরিপ্রত্যাশীদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করে। প্রায় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত চাকরিপ্রত্যাশী আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে যান। অনেকেই বিদেশে নানাভাবে হয়রানির শিকার হন, এমনকি কারাবন্দিও হন। কখনো কখনো তারা অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়েন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য হন।

চুক্তির অন্যায্য রদবদল

প্রবাসী শ্রমিকের সঙ্গে চুক্তির অন্যায্য পরিবর্তন খুবই পরিচিত একটি সমস্যা। গন্তব্য দেশে পৌঁছার পর শ্রমিকের কাজের শর্ত, চুক্তি ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বিষয়ে পরবর্তন আনা হয়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য রিক্রুটিং এজেন্ট ও সম্ভাব্য নিয়োগকর্তা - দুই পক্ষই যুক্ত থাকেন। বিদেশে পৌঁছার পর কর্মীরা তাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করা এবং বাস্তবতার ব্যাপক ফারাক প্রায়ই দেখতে পান। তারা উপলব্ধি করেন যে, তাদের চাকরির ধরন, পারিশ্রমিকের পরিমাণ ও তাদের কর্মঘণ্টায় অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

জীবনযাপন এবং কাজের পরিবেশ

অনেক বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রবাসে জীবনযাপন ও কর্মপরিবেশ অত্যন্ত কঠিন/ রূঢ় হয়ে থাকে। এই কর্মীরা প্রায় ক্ষেত্রেই ঝামেলায় পূর্ণ জীবনযাপন করেন। তাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা খুবই নিচু মানের হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবায়ও তাদের প্রবেশাধিকার থাকে চরমভাবে সংকুচিত/সীমিত। বিদেশে এই তরুণ কর্মীরা তাদের জীবনের সেরা সময় বিষণ্ণতা হতাশা ও শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে।

অতিবৃহৎ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এবং শোভন কর্মসংস্থানের অভাব

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাক্কলন করা হয়েছিল যে, ২০১৬ থেকে ২০২০ অর্থবছরে প্রায় এক কোটি ২৯ লাখ ব্যক্তির বাড়তি চাকরি তৈরি হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিদেশে ২০ লাখ ব্যক্তির চাকরির সুযোগ। তবে বাস্তবে প্রদত্ত প্রকৃত চাকরির সংখ্যা অনেক কম। তার ওপর যেসব কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে বেশিরভাগই শোভন চাকরি নয়। সাম্প্রতিক অতীতের কোভিড-১৯ মহামারি এই পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে গেছে। জনমিতিক গতিধারা ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগে তৈরির মধ্যে ব্যবধান ছিল বিস্তর। এছাড়া গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিতে কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কমে গেছে।

বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৮৫ শতাংশেরও বেশি শ্রমশক্তির। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ শ্রমিকের কাজের সুযোগ হয়েছে অ-কৃষি খাতে। তরুণ শ্রেণির নব্বই শতাংশের অধিক শ্রমিক কাজ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। তাদের অনেকেই নিজে কর্মসংস্থান করেছে অথবা তারা বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক কাজে লিপ্ত থেকেছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি জীবিকা অর্জনের কিছু সুযোগ যদিও দেয়, সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় অবসর-উত্তর সুবিধাহীন নামমাত্র মজুরির। এই কর্মীরা সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা, কর্মসংস্থানের স্থিতিশীলতা ও আইনি স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত থাকে। তাদের অনেককেই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করতে হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশু রয়েছে।

নারী শ্রমশক্তির সীমিত অংশগ্রহণ

বিপুলসংখ্যক নারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে: নারীর কর্মসংস্থানের সহায়ক ও সুবিধাজনক অবকাঠামোর অভাব, যেমন - নারীর কর্মস্থলের কাছাকাছি মা শ্রমিকদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র না থাকা; নিরাপদ ও নারীবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব; কর্মস্থলে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা; সমপর্যায়ের চাকরিতে নারী ও পুরুষের মজুরিবৈষম্য; এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সম্ভাবনা না থাকা। যদিও বাংলাদেশের কর্মশক্তিতে সাম্প্রতিক কালে নারীর অংশগ্রহণের হার বেড়েছে, এর পরও বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় তা এখনো অনেক কম।

শ্রমবাজারের অলবয়সী নারীর ৯০ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেছে। এই সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় ১০ শতাংশ অধিক। নারী বেকারত্বের হার পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সহযোগিতা প্রদান তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি করতে হবে শ্রমবাজারে লিঙ্গবৈষম্য কমানোর জন্য এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রমশক্তি তৈরির জন্য। বিষয়টি ‘কাউকে পেছনে ফেলে না রাখা’ - এই চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে।

শ্রমবাজারে বিদ্যমান নাজুকতা

অনেক বাংলাদেশি যুবক নাজুক ও অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ চাকরিতে/কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে বাধ্য হচ্ছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় ক্ষেত্রেই চাকরির নিশ্চয়তার, শ্রম অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার এবং শোভন/সম্মানজনক বেতন ও মজুরির অভাব থাকে (আইএলও, ২০২০)। নাজুক কর্মসংস্থানের ব্যাপকতা যুবকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে, যার ফলে প্রায়শ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে যথাযাথ আর্থ-সামাজিক গতিশীলতার অভাব দেখা দেয়। শ্রম অধিকার সুরক্ষার অভাব, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং কাজে সন্তুষ্টির অভাব কর্মশক্তির অন্য প্রতিবন্ধকতাকে আরও জটিল করে তোলে। কর্মক্ষেত্রে শোষণমূলক আচরণের জন্য বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা বেশি নাজুক হয়ে থাকে, যার জন্য দায়ী বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট আইনি সুরক্ষার ঘাটতি ও তা প্রয়োগের অভাব এবং শ্রমবাজারে নিয়োগের আনুষ্ঠানিক চুক্তির অনুপস্থিতি।

দক্ষতার অমিল এবং আচরণগত পার্থক্য

বাংলাদেশের শ্রম-বাজারে দক্ষতার গড়মিল ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং তা বেড়ে চলেছে। শ্রমবাজারে নিয়োগদাতারা প্রার্থীদের মধ্যে যেসব দক্ষতা খোঁজেন, তার সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার বিস্তর ফারাক রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনো স্নাতকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাকরির দিকে ঝোঁকেন, কিন্তু তা শুধুই নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে সীমিত থাকে। শীর্ষ প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা স্নাতকরা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। স্থানীয় বাজারে দরকারি দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী খুঁজে না পাওয়ার ফলাফল হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলো

বিদেশ থেকে কর্মী এনে নিয়োগ দিতে বাধ্য হন। এমনটি বেশি দেখা যায় রপ্তানিনির্ভর খাতগুলোয়। এখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষ পেশাজীবীর তীব্র অভাব থাকায় বিদেশ থেকে কর্মী এনে কাজ চালাতে বাধ্য হন। পরিণামে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়; প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়; এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করায় দেশের অর্থনীতিতে চাপ পড়ে। সর্বোপরি বলাই বাহুল্য যে, স্থানীয় তরুণদের কাজের সুযোগ নষ্ট হয়।

তরুণ চাকরিপ্রার্থীদের দক্ষতা এবং শ্রমবাজারের প্রয়োজনীয় চাহিদার মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য তরুণদের বেকারত্বের বড় একটি কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে এ সমস্যা তীব্রতর। বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তরুণদের উপযুক্ত ও কাজে লাগানোর মতো দক্ষতায় অভিগম্যতা নেই। এর কারণ দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ ও চাকরির চাহিদার/ প্রয়োজনের মধ্যে অসামঞ্জস্য/ বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। একটি বড়সংখ্যক শিক্ষিত যুবক সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য আবেদন করার প্রক্রিয়া ও এর প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এই ধরনের চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। অনেক শিক্ষিত যুবককে বিক্রয় ও সেবা খাতে কাজ করতে আগ্রহী হতে দেখা যায় না। অথচ তুলনামূলকভাবে এসব খাতে শুরুর ধাপে অনেক বেশি কাজের সুযোগ রয়েছে। এই দূরত্ব অতি জরুরি ভিত্তিতে ঘোচানো দরকার। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই এজন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

কাজের ভবিষ্যৎ

বিশ্বব্যাপী কর্মস্থল ও ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের ধরন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।নানা ধরনের পক্ষ এই পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমবাজারে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান এবং অর্থনীতি ও চাকরির ওপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব। এগুলো দিন দিন নতুন ধরনের মানবিক ও অর্জিত দক্ষতা (হার্ড ও সফট স্কিল) চাহিদা তৈরির পথ করে দিচ্ছে। কম্পিউটারের মৌলিক জ্ঞান, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), তথ্যপ্রযুক্তি-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, জটিল বিষয় সমাধানের চিন্তা করার ক্ষমতা এবং ভাষাগত দক্ষতার মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে চাকরির বাজারে চাওয়া-পাওয়ার হার ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও এগুলোর প্রভাব সব পর্যায়ের পেশাজীবীর ওপর প্রযোজ্য, কিন্তু তরুণ চাকরিপ্রার্থীরাই এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। অনেক যুবক করোনা মহামারীর সময় ব্যাপকভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছিল। অতিমারি তাদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

কেননা, এই তরুণরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তির বড় অংশ জুড়ে থাকবে। তাই ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনায় নিয়েই মোকাবিলার জন্য তাদের সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। ক্রমে ক্রমে উদ্ভব হওয়া চাহিদাগুলো পূরণে উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে থাকবে দক্ষতা উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শিক্ষাগ্রহণ উৎসাহিত করা, বিদ্যমান দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করা এবং পুনরায় দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করা। তরুণদের সহায়ত দিয়ে তাদের সক্ষম করতে হবে যেন তারা দীর্ঘ মেয়াদে পরিবর্তনশীল ধারার সঙ্গে তাল মেলাতে পারে। এই পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডিজিটাল বিপ্লব ও (Green Transition) সবুজায়নগত/পরিবেশ-সম্পর্কিত পরিবর্তন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অভিঘাত সহনশীল এবং উন্নয়নগত দিক থেকে টেকসই হতে হবে যা নির্ভরশীলযুবকদের সক্ষমতা তৈরি করা এবং সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করার ওপর।

২. সুপারিশমালা

শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন

বর্তমান উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- শ্রম বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য আজ পর্যন্ত বেশ কিছু উদ্যোগ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গ্রহণ করা কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতায় বিনিয়োগ কর্মসূচি (এসিইআইপি) হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচি তরুণদের চাকরি প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করেছে।

- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সরকার ইকোনমিক এক্সেলারেশন অ্যান্ড রেজিলিয়্যান্স ফর নিটস (ইএআরএনন) নামে একটি উদ্যোগ চালু করার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এর লক্ষ্য তরুণ নিট জনগোষ্ঠীর হার ২০২৫ অর্থ বছরের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং ২০৩১ অর্থবছরের মধ্যে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। এ কথা বলা যায় যে, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রান্তিকীকরণের সঙ্গে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সমন্বয় সাধন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

সুপারিশমালা

- দক্ষতার ঘাটতি মূল্যায়ন কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়ন করা। বিকশমান চাকরি বাজারের চাহিদা/দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করা। সেই অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা।

- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহজে হালনাগাদ করার উপযুক্ত ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করতে উৎসাহিত করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প ও ব্যবসার মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং নিয়মিত মতবিনিময়, শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ ও চাকরির সুযোগ তৈরি করা।

- বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সহযোগিতামূলক সিওওপি মডেল গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করতে পারে। অনেক দেশেই এমন রয়েছে। শ্রেণিকক্ষ-ভিত্তিক শিক্ষাকে ব্যবহারিক কাজের অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটানোর লক্ষ্যে এ মডেল অনুসরণ করা হয়।

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা (TVET) কার্যক্রম নিয়ে আরও যাচাই-বাছাই করা। শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের জন্য এই মাধ্যম যেন জার্মানির দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিখতে পারে। জার্মানির দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের মধ্যে মিশ্রণ ঘটানো হয়।

- জার্মানির শিক্ষা পদ্ধতি দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। এই জনশক্তি শিল্প খাতের পরিবর্তনশীল চাহিদাও মেটাতে পারে।

- বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার দরুন নিট শ্রেণিভুক্ত যুবকদের অনেকেরই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য প্রাক-যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে পারে না। এইসব যুবকের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সহায়তা কর্মসূচি চালু করা। বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উল্লিখিত বিশ্বব্যাংক-সমর্থিত আর্ন (ইএআরএন) কর্মসূচির সুবিধা নেয়া।

- প্রান্তিক পর্যায় থেকে আসা শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও আর্থিক প্রণোদনা দেয়া। তারা যেন ন্যায়সংগতভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

- দক্ষতা অর্জনের পর্যায় থেকে কর্মসংস্থানে উপনীত হওয়ার পরিবর্তনকালে একটি 'বাস্তুতান্তিক পদ্ধতি' অবলম্বন করা। সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের উৎসাহিত করা - তারা যেন নীতি ও আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থার সুযোগ কাজে লাগিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজের সুযোগ দেয়।

অভিবাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা

বর্তমান উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) সম্ভাব্য অভিবাসন-প্রত্যাশী কর্মীদের বিদেশযাত্রার আগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং) প্রদান করে।
- অভিবাসী কর্মীদের সহায়তার জন্য ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড গঠন করা হয়েছিল।
- তবে অভিবাসী কর্মীদের দেওয়া প্রশিক্ষণের গুণগত মান এবং দক্ষতার আরও উন্নতকরণে তারা যে সুযোগসুবিধা পান, তা পর্যাপ্ত নয়। মানোন্নয়নের জন্য এখনো অনেক সুযোগ রয়েছে।

সুপারিশমালা

- অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকির অধীনে থাকে।
- অভিবাসী কর্মীদের পক্ষে ন্যায়সংগত আচরণ, আদর্শ চুক্তি এবং আইনি আশ্রয় পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে চাকরিদাতা দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করার লক্ষ্যে সমঝোতায় পৌঁছা।
- প্রধান প্রধান চাকরিদাতা দেশগুলোয় বিকাশমান দক্ষতার চাহিদাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিএমইটিকে সম্ভাব্য অভিবাসীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা ওনকশা করতে হবে।
- এই লক্ষ্যে বৈদেশিক চাকরির বাজার সম্পর্কে একটি প্রণিধানযোগ্য এবং সর্বাঙ্গীণ জরিপ পরিচালনার কাজ গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও শ্রমবাজার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এ কাজ করতে হবে।
- হয় ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডকে নতুনভাবে সাজানো উচিত, অথবা একটি অভিবাসী শ্রমিক কল্যাণ ট্রাস্ট ফান্ড তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে এ ফান্ড বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের কার্যকর সহায়তা, আর্থিক সহায়তা, আইনি সমর্থন এবং বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা রাখে। এই ফান্ডফিলিপাইনের ওভারসিজ ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (ওডব্লিউডব্লিউএ) অনুরূপ হতে পারে।
- আইনি পরামর্শ, বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ-সংক্রান্ত সেবা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কাজের জন্য প্রধান প্রধান অভিবাসী শ্রমিকদের অঞ্চলে একটি 'মাইগ্রেশন রিসোর্স সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা। এটি শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যুরোর (এসএলবিএফই) আদলে হতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদে কর্মরত অভিবাসী বিদেশে বিভিন্ন চাকরিতে যোগ দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে যখন নিজ দেশে বেড়াতে আসেন, তখন তাদের পুনরায় দক্ষ করে তোলার জন্য এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের পরিসর তৈরি করা।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কিছু অংশ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের একটি বড় অংশ অদূর ভবিষ্যতেও অপ্রাতিষ্ঠানিকই থাকবে। ছাড় কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাই এই মুহূর্তের জন্য করণীয়। কোনো সন্দেহ নেই যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রূপান্তর কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা বাড়াবে

এবং চাকরির বাজারে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক সুরক্ষা দেবে। এটি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ জনপ্রিয় করার জন্য প্রণোদনা এবং অন্যান্য সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত করবে। একই সময়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজারে অংশগ্রহণকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত ও নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

অনলাইন/ডিজিটাল অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক করার জন্য সরকার ডিজিটাল ব্যবসা শনাক্তকরণ (ডিবিআই) নম্বর চালু করেছে। সেই সঙ্গে একটি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল এবং অ্যাপ তৈরি করেছে, যেখানে অনলাইন অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসাগুলো ডিবিআই'র জন্য আবেদন করতে পারে। এটি শ্রমবাজারের এই নির্দিষ্ট অংশের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার স্বার্থ সুরক্ষিত আছে তা নিশ্চিত করার একটি সুযোগ তৈরি করেছে।

সুপারিশমালা

- ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশনের (ডিবিআই) মতোই অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসার জন্য অনন্য ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর প্রদান করা। এটি ব্যবসায়ীদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবা পেতে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জনপ্রিয় করতে এবং সরকারকে অর্থ সংহতকরণে সহায়তা করবে। একই সময়ে এটি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমবাজারের নানা দিক পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

- ডিবিআই এবং ব্যবসা নিবন্ধন সম্পন্ন করার সুবিধাগুলো তুলে ধরে জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালু করা। এই বিষয়ে ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য, ঋণ সুবিধায় প্রবেশাধিকার এবং প্রতিষ্ঠানিকীকরণের সঙ্গে পাওয়া আইনি স্বীকৃতির ওপর গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

- প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে উৎসাহিত করা এবং নিশ্চিত করা যে, শ্রমবাজারের অংশগ্রহণকারীরা ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের সুবিধা উপভোগ করতে সক্ষম হবে।

উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার ধারণা জনপ্রিয় করা/ উদ্যোক্তা হতে উজ্জীবিত করা

বর্তমান উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

স্টার্টআপগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়নের জন্য সরকার 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ' উদ্যোগ চালু করেছে। প্রতিষ্ঠানটি গঠনে অনুপ্রেরণা এসেছে ভারত সরকারের উদ্যোগ 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' থেকে। এই উদ্যোগের সুবাদে যুবকদের মধ্যে উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপের ধারণা জনপ্রিয় করার মাধ্যমে যুব কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের আওতা আরও বাড়াতে হবে। আরও বিস্তৃত সমর্থন জোগাতে হবে এবং পরামর্শক/উজ্জীবক/গুরু (মেন্টর) ও বিনিয়োগকারীদের কাছে অভিগম্যতা সহজ করতে হবে।

সুপারিশমালা

- একটি জাতীয় উদ্যোক্তা তহবিল গঠন করতে হবে। এর লক্ষ্য হবে সরাসরি অনুদান প্রদান এবং ইক্যুইটি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা। সেই সঙ্গে স্টার্টআপের জন্য উজ্জীবক শক্তিকে সমর্থনজোগানো। এটি সিঙ্গাপুরের 'স্টার্টআপ এসজি ইক্যুইটি' কর্মসূচির আদলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে উদ্ভাবন কেন্দ্র তৈরি করতে উৎসাহিত করা। উদ্যোক্তা তৈরির ইকো সিস্টেম অনুসরণ করে এগুলো গঠিত হতে পারে। এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি এবং ভারতের বেঙ্গালুরুর কথা।

আইসিটি এবং উচ্চ-প্রযুক্তির খাতের প্রসার ঘটানো

আইসিটি ও হাই-টেক খাত জনপ্রিয় করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোতে অর্থ বিনিয়োগ করা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া। সত্যিকার অর্থে, এই খাতগুলোতেই ভবিষ্যতের চাকরির একটি বড় অংশ তৈরি হবে।

বর্তমান উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির অধীনে হাতে নেওয়া উদ্যোগসমূহের অন্যতম লক্ষ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ডিজিটাল সেবা প্রদান করা। যদিও এসব লক্ষ্য অর্জনে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবে এগুলো প্রত্যাশিত লক্ষ্যের তুলনায় অনেক কম।

সুপারিশমালা

- আইসিটি এবং হাই-টেক খাতের স্বার্থকে এগিয়ে নিতে সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের মধ্যে ফলপ্রসূ সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা। দেশের হাই-টেক শিল্পের বিকাশ এবং প্রসারের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নে (আর অ্যান্ড ডি) অভীষ্টনির্ভর বিনিয়োগ করা।

- ভবিষ্যতের যথোপযুক্ত কর্মশক্তি গড়ে তোলার জন্য শৈশব শিক্ষার শুরুতেই কোডিং এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা অন্তর্ভুক্ত করা।

- প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের জন্য একটি প্রণিধানযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই মানবসম্পদ হতে হবে প্রয়োজনমাফিক/আবশ্যিক দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন। এগুলোকে চতুর্থ ও পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

কৃষির আধুনিকায়ন

আধুনিক কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষি ব্যবসায় উদ্যোগ এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিনিয়োগ করা হলে চাষাবাদ, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং বিতরণ-সম্পর্কিত নানা পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

বর্তমান উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- সাম্প্রতিক বছরগুলোয় 'কৃষি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম'-এর মতো বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগগুলো কৃষকদের ডিজিটাল সেবা দিতে প্রস্তুত।

- বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য স্বল্পসূদে অর্থঋণ সুবিধার ব্যবস্থা রেখেছে।

সুপারিশমালা

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ কৃষিতে নিযুক্ত। কিন্তু তাদের শ্রম উৎপাদনশীলতা কম। অন্যদিকে কৃষি খাতের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে। কৃষির আধুনিকীকরণ, কৃষি-শিল্প সংযোগ শক্তিশালীকরণ, দক্ষ বিপণন ব্যবস্থার প্রচার এবং বিভিন্ন গ্রামীণ সেবার পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার মাধ্যমে তা করা যেতে পারে। কৃষির আধুনিকীকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণের সম্ভাবনাময় সুযোগগুলো বাস্তবায়ন করতে সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজন। পরিশেষে বলা যায়, উদ্যোক্তা, কৃষক ও বিনিয়োগকারীদের জন্য কৃষিকে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করার জন্য নানা উদ্যোগ প্রয়োজন, যেন এ খাতে আরও শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

- গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করা, যাতে পশ্চাদমুখী ও অগ্রবর্তী শিল্পের সঙ্গের সংযোগ সহায়ক হয়।
- ফসল আহরণ করার পরবর্তী লোকসান কমাতে সংরক্ষণ করার উপযোগী স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা।
- কৃষিনির্ভর ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সুবিধায় প্রবেশাধিকার বাড়ানো। ক্ষুদ্র পর্যায়ের কৃষকদের জন্য বীমা সুবিধা চালু করা।
- ভারতের 'ই-চৌপাল'-এর মতো যথাযথ কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ করা। ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ব্যবহার করে এই কৃষি পদ্ধতিতে শস্য ও মৎস্য-জাতীয় পণ্যের বিপণন জনপ্রিয় করা।

শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণে লিঙ্গবৈষম্য নিরসন

সুপারিশমালা

- শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে সবার জন্য লিঙ্গবৈষম্য দূর করা দরকার। এজন্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্কার/বিধি-নিষেধ মোকাবিলা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে সামাজিক সংস্কার/বিধি-নিষেধ (ট্যাবু) ভাঙার জন্য সরকারকে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালাতে হবে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্য গণমাধ্যম ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করা প্রয়োজন।
- পরিবারবান্ধব নীতিমালা বাস্তবায়ন করা দরকার। নমনীয় কর্মঘণ্টা ও শিশুর দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা। এগুলো নারী কর্মীদের নিজ নিজ কাজ ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে সহায়তা করবে।
- নারীদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা; বিশেষ করে ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষেত্রগুলোয়। এর সুবাদে তাদের কাজের ক্ষেত্রে যেই দক্ষতার বেশি চাহিদা রয়েছে, তারা সেই দক্ষতায় সক্ষম হতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের 'কন্যাকে রক্ষা করো, কন্যাকে শিক্ষা দাও' প্রচারাভিযানের কথা উল্লেখ করা যায়। এই প্রচারণা কর্মসূচির লক্ষ্য মেয়েদের শিক্ষা ও দক্ষতার মানোন্নয়ন করা। এর ফলে তাদের কর্মসংস্থানে নিযুক্তির যোগ্যতা বাড়বে। বাংলাদেশও এই ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়ার কথা চিন্তা করতে পারে।
- অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা। অভিবাসনের গন্তব্য দেশগুলোর যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করা ও চুক্তি স্বাক্ষর করা। তাদের উদ্বেগের বিষয়সমূহ এবং স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়গুলো নিশ্চিত/ চিহ্নিত করা।
- যুব নারীদের বৃত্তি এবং আবাসিক সুবিধা দেওয়া। তারা যেন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারে। এতে তারা তাদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে পারবে এবং কোনো চাকরির উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবে।
- কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও নারীদের হয়রানি করার বিরুদ্ধে জোরালো আইনি পদক্ষেপ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

কাজের শোভন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ

নির্বাচিত বর্তমান উদ্যোগসমূহ

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) শ্রমিক ও নিরাপত্তা পরিদর্শনের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু ডিআইএফই পর্যাপ্ত মানবসম্পদ ও আর্থিক জোগানের ব্যাপক ঘাটতিতে রয়েছে। পরিণামে তারা শ্রমিকদের জন্য কাজের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে দক্ষতার সাথে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

সুপারিশমালা

- একটি স্বাধীন শ্রম ন্যায়পালের কার্যালয় তৈরি করা যাকর্মক্ষেত্রে শ্রম অধিকার লঙ্ঘন ও বিরোধ তদন্ত করে বিষয়গুলোর সমাধান করবে।
- ডিআইএফই-এর সক্ষমতা তৈরি করা, যাতে এটি যথাযথভাবে তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- শ্রমিকরা যেন তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার পায়, তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে শ্রমবিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতের সক্ষমতা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া।
- সামষ্টিক দর-কষাকষির চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদনে শ্রমিক ইউনিয়নকে যুক্ত করা এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা, স্বার্থ ও শ্রম-সংশ্লিষ্ট অসংগতি দূর করে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি চাকরির জন্য যুবদের প্রস্তুত করা

তরুণ কর্মশক্তির জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শোভন চাকরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান কর্মিবাহিনীর কাজের সুযোগ ঘটাতে আগামী বছরগুলোয় বছরে ১২ থেকে ১৫ শতাংশ হারে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রসার ঘটাতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে রপ্তানি এবং সরবরাহ-খাতের বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এফডিআই আকর্ষণে, বিশেষ করে একশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করার যে পরিকল্পনা রয়েছে সেক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । এফডিআই আকর্ষণ ও ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদন বৈচিত্র্যের যুগল কৌশলের সাফল্য নির্ভর করে দক্ষ কর্মিবাহিনীর ওপর প্রয়োজনমাফিক প্রাপ্যতার। পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে তারুণ্যকেন্দ্রিক চাকরির বাজার কৌশল খুবই গুরত্বপূর্ণ একটি অবস্থানে রয়েছে।

বর্তমান অবস্থা

বিনিয়োগ-সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার নিরসনে বাংলাদেশ বাস্তবানুগ/ দৃশ্যমান উন্নতি করেছে। এই সুবাদে বিদ্যুতের প্রাপ্যতা বেড়েছে, অবকাঠামো উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে এবং অর্থায়নে প্রবেশাধিকার সহজতর হয়েছে। তবে এখনও কিছু সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে। নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন জ্বালানিতে সীমিত প্রবেশাধিকার, আমলাতান্ত্রিক সময়ক্ষেপণ, শ্রম আইনের শিথিল প্রয়োগ, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এবং ব্যবসা পরিচালনার উচ্চমূল্য প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহকে নিরুৎসাহিত করছে।

এই প্রেক্ষাপটে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষতার গরমিলও একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। । সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভীষ্ট রয়েছে: এই পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ নাগাদ (২০২০ অর্থবছর) দেশে এফডিআই প্রবাহ ১.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন

ডলারে উন্নীত করা। ২০২২ সালে বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং দেশে বিনিয়োগ প্রসারে এ-জাতীয় সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টা প্রত্যাশিত ফলাফল দিচ্ছে না। ২০১৮ সালের ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) আইনের বিধানগুলো এখনো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হয়নি।

সুপারিশমালা

- পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দুটি কৌশল অনুসরণ/প্রয়োগ/অবলম্বন করা: বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে একটি প্রণিধানযোগ্য কৌশল বিকশিত/প্রসারিত করা এবং প্রত্যাশিত বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ থেকে শ্রমবাজারে যে চাকরির চাহিদা তৈরি হবে, তা পূরণে যুবকদের প্রস্তুত করা।

- বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এটি বিনিয়োগকারীদের রিয়েলটাইম তথ্য, ই-সার্ভিস এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রেখে বিনিয়োগ পরিকল্পনা দেবে। বিষয়টি সিঙ্গাপুরের 'ইনভেস্ট সিঙ্গাপুর' প্ল্যাটফর্মের আদলে হবে।

- একটি 'নিবেদিত বিনিয়োগকারী সুরক্ষা/পর্যবেক্ষণ সেবা' প্রতিষ্ঠা করা, যার লক্ষ্য হবে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন, প্রকল্পের জায়গার নির্ধারণ এবং বিনিয়োগ-পরবর্তী সমর্থনবিষয়ে সহায়তা দেওয়া। । এটি 'ইনভেস্ট জাপান' নামে জাপানের একটি উদ্যোগের আদলে হবে।

- ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রযুক্তি ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানিসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোকে কেন্দ্র করে এফডিআই প্রসার কৌশল উন্নত করা। এগুলো বাংলাদেশকে একটি বিনিয়োগ লক্ষ্য পূরণ ও প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনাগুলোর ওপরে আলোকপাত করবে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ভিয়েতনামের স্বপ্রণোদিত কৌশল আদর্শ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। ভিয়েতনামে অগ্রাধিকারমূলক কর হার, প্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন নথির অনুমোদন, কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও লক্ষ্যচিহ্নিত প্রণোদনা দেওয়া হয়।

- বিশেষায়িত ম্যানুফ্যাকচারিং পার্ক (শিল্পাঞ্চল) প্রতিষ্ঠাকরা, যা ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের শিল্পের চাহিদা পূরণ করবে। এজন্য উৎসাহ পাওয়া যেতে পারে মালয়েশিয়ার সফল উদ্যোগ মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর (এমএসসি) এবং বায়ো এক্সসেল বায়ো টেকনোলজি পার্ক থেকে।

- বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যে ধরনের বিনিয়োগ উদ্যোগ নিয়ে আগ্রহী হন, সেগুলোর জন্য একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা ব্যবস্থা করা। পারস্পরিক সমঝোতা চুক্তি বা এমওইউর আলোকে বিষয়টি দেখে বিবেচনা করা এবং সেই পর্যালোচনার আলোকে একটি দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে তরুণদের কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজারের গতিধারার মতো জটিল ও উদ্বেগের কঠিন বিষয়গুলো সমাধান করার জন্য একটি সুনির্ধারিত ও প্রণিধানযোগ্য কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জনমিতিক উপার্জন/ সুফল তরুণ জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনাকে ব্যবহার করতে দেশটিকে একটি অভূতপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছে। এটাও মনে রাখতে হবে যে, সুযোগের জানালা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে একটি কার্যকর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব প্রয়োজন হবে। এই নীতি বিবৃতি সুনির্ধারিত কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রস্তাব দিয়েছে, যাতেএখনকার বাংলাদেশের তরুণদের ভবিষ্যৎ চাকরির বাজারের জন্য প্রস্তুত করা যায়। প্রস্তাবগুলো হলো: ম্যানুফ্যাকচারিং

খাতের প্রসার ও বৈচিত্র্য ঘটাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা; বিদেশে কর্মসংস্থানের দৃশ্যপটে পরিবর্তন আনা; শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষায় সফলতা রক্ষা করা; উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করা, বিশেষ করে আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে; অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারের নিয়োজিত ব্যক্তিদের নাজুকতা কমাতে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতের উপাদান যুক্ত করা; শ্রমবাজারে লিঙ্গবৈষম্য দূর করা এবং নানা উদ্যোগ হাতে নেওয়ার মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে এসডিজি ৮ অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে দরকারি কাজগুলো অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো নিয়োগযোগ্য ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী-সংবলিত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রমবাজার। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই এসডিজি-৮ লক্ষ্যমাত্রাকে বিবেচনায় রেখে এবং বাংলাদেশের জনমিতিক উপার্জনের ফসলকে উন্নয়ন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত (entwined) করতে হবে।

৩

অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও সরকারি পরিষেবা

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

ড. মো. খায়রুল ইসলাম
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ওয়াটারএইড সাউথ এশিয়া

পেনহোল্ডার

ড. মো. শাহনেওয়াজ হোসেন
সহকারী অধ্যাপক
গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (জিএসজি) বিভাগ
ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (আইইউবি)

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

আবদাল্লাহ নাইফী
কান্ট্রি ম্যানেজার
পর্টিকাস

ফাহিম উদ্দিন শুভ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গার্বেজম্যান

ড. ইশরাত ইসলাম
অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

খন্দকার নিয়াজ রহমান
নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনাবিদ

ড. আকতার মাহমুদ
অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
অধ্যাপক, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ ইউনুস
গবেষণা পরিচালক
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

মোহাম্মদ নবীনুর রহমান
অ্যাডভোকেসি অ্যাডভাইজার
কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে খুবই দ্রুততার সঙ্গে নগরায়ণ বিস্তৃত হয়েছে। এর ফলে নগরাঞ্চলে অব্যাহতভাবে বাড়ছে জনবসতি। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় ধরনের নগরাঞ্চলেই বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের বসবাসের সংখ্যা । বর্তমানে বাংলাদেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩২৭টি পৌরসভার বাইরে আরও ৫৭০টির মতো নগর কেন্দ্র রয়েছে। মূলত চারটি মৌলিক বিষয়ের ওপর ভর করে নগরের এই নজিরবিহীন প্রবৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে: (i) নগরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা; (ii) শহরের উপকণ্ঠে জনবসতির সম্প্রসারণ; (iii) গ্রাম থেকে শহরে মানুষের স্থানান্তর; এবং (iv) নতুনভাবে গড়ে ওঠা নগরবসতি সংস্থাপনের প্রবণতা। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, নগরের মৌলিক পরিষেবাসমূহের সঙ্গে সংগতি রেখে নগরায়ণের এই প্রবৃদ্ধি সংঘটিত হচ্ছে না।

ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ শহরের গণপরিষেবাসমূহের সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের জন্ম দিয়েছে। এমন একটি পরিস্থিতি যে তৈরি হবে তা আগে থেকেই ধারণা করা যাচ্ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঢাকা শহরে এ ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ঢাকা শহরে দেশের মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ মানুষ বসবাস করেন এবং শহরটি দেশের মোট জিডিপির ২১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ ঢাকা শহরের আয়তন বাংলাদেশের মোট আয়তনের মাত্র ১ শতাংশ। এছাড়া ইকোনমিক ইনটেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)- এর বৈশ্বিক বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বসবাস অযোগ্য শহরের তালিকায় স্থান পাচ্ছে। এমনকি ইআইইউ'র ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে ঢাকাকে বিশ্বের সপ্তম বসবাস অযোগ্য শহর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন গণপরিষেবার নিরিখে এ ধরনের র‌্যাংকিং খুবই দুঃখজনক অবস্থার প্রতিফলন। যেসব পরিষেবার ওপর ভিত্তি করে এই র‌্যাংকিং করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে নগর পরিবহন, আবাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো সামাজিক পরিষেবা এবং অন্যান্য মৌলিক শহুরে পরিষেবা (পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ব্যবস্থাপনা, আবর্জনা অপসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)। সাম্প্রতিক সময়ে নগরাঞ্চলে পরিবেশগত (বায়ু, শব্দ ও পানি) দূষণও অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। এমন অবস্থায় নগরাঞ্চলের সুবিধাপ্রাপ্ত ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন পরিষেবার প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রার বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমন দৃশ্যপট ঢাকার জন্য শোভন হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি এককভাবে ঢাকা শহরের সমস্যা নয়, বরং অন্যান্য নগর ও শহরতলি এলাকার চিত্রও একই রকম। বিভিন্ন প্রমাণ থেকে প্রতিভাত হয় যে, বাংলাদেশে নগরায়ণের সামগ্রিক প্রক্রিয়া স্থানিক ও জনমিতিক বিষয়াদি দ্বারাও করুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

এসব বিষয় চূড়ান্ত বিচারে বাংলাদেশে নগর প্রশাসনের ওপর অব্যাহতভাবে নানা সমস্যার চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, পরিবহন, জীবনযাত্রার পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং অন্য ক্ষেত্রগুলোসহ গণপরিষেবা ও সাধারণ সেবাসমূহে নাগরিকদের অভিগম্যতার প্রদানের ক্ষেত্রে নগর কেন্দ্রগুলো ক্রমবর্ধমান চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। ফলত সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নগর অঞ্চলে জীবনযাত্রার মানের (QoL) প্রায় সব সূচকে সমভাবে অবনমন ঘটেছে। এর বাইরে পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক রূপান্তরের হাত ধরে অনেকগুলো মধ্যস্তরের শহর গড়ে উঠছে, যেগুলোতে তাদের নিজস্ব, সুনির্দিষ্ট চাহিদা ও প্রয়োজনের উদ্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশে নগরায়ণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিতাড়িত মানুষের কারণে নগরে 'বস্তি গড়ে ওঠা' এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবাদে 'গ্রামীণ জীবনে নগরায়ণ'-এর উদ্ভব। সরকারের নীতি ও উদ্যোগসমূহ যখন নতুনভাবে উদীয়মান এসব বাস্তবতা বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়, তখন মৌলিক গণপরিষেবাসমূহের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দুর্ভোগের শিকার হন। বাংলাদেশ যে ২০৩১ সালে উচ্চমধ্যম আয় ও ২০৪১ সালে উচ্চআয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, সেই ঘোষণার সঙ্গে এই পরিস্থিতি বেমানান। এই পরিস্থিতিতে নগরায়ণের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে গণপরিষেবা সরবরাহের চাহিদার বিষয়টিকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পাশাপাশি সামাজিক প্রয়োজন ও অন্তর্ভুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেও বিবেচনা করা উচিত।

প্রধানত বাংলাদেশে নগরায়ণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ‘বিশৃঙ্খল’, ‘অসংগঠিত’ ও ‘অপরিকল্পিত’ নগরায়ণ। এ বিষয়টি প্রমাণিত সত্য যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা বণ্টনের ভারসাম্যহীনতা কয়েকটি প্রধান শহরে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে ঢাকা শহরে এ সমস্যা প্রকট। অপরিকল্পিত ও ভারসাম্যহীন নগরায়ণ নগরেরঅধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানকে বিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষ করে এতে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জীবন ‘নগরজীবনের দুষ্টচক্র’ দ্বারা আবিষ্ট; তাদের যে কোনো গণপরিষেবার জন্য উচ্চ মূল্য পরিশোধ করতে হয়, অথচ এর বিনিময়ে তারা নিম্নমানের পরিষেবা পেয়ে থাকেন। তাও সব ধরনের পরিষেবার লভ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা শহরের মাত্র ১১ থেকে ১৬ শতাংশ নিম্নআয়ের খানা প্রাতিষ্ঠানিক উৎস (ঢাকা ওয়াসা) হতে পানি সরবরাহ পেয়ে থাকে। আর বাকি নিম্নআয়ের খানাগুলোকে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক পরিষেবার উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয় এবং এর বিপরীতে আনুষ্ঠানিক উৎসের তুলনায় তাদেরকে ৭ থেকে ১৪ গুণ বেশি মূল্য পরিশোধ করতে হয়। নগরীর অনানুষ্ঠানিক বসতির খানাগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের মৌলিক পরিষেবা পেয়ে থাকে। এ ধরনের প্রায় ৯৪ শতাংশ খানা থেকে জানা যায়, এসব খানা নগরেরবিভিন্ন জলাশয়ের পানির দুর্গন্ধের কারণে দুর্ভোগের শিকার । নগরীর প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবায় অভিগম্যতা নেই। নগরেপার্কের মতো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ও শিশুদের খেলার মাঠের স্থান ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। প্রায়ই স্বার্থান্বেষী মহল এসব স্থান জবর দখল করে। আর এ কাজে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নগর কর্তৃপক্ষের কর্মীরা। নগর অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে দেখা দিয়েছে। গড়ে ৫৫ শতাংশ কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের বাইরে থেকে যায়। মাত্র ১৪ শতাংশ মেডিকেল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়। প্রতিবছর ই-বর্জ্য বৃদ্ধির প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশ। গত ১৫ বছরে এ হার তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মোট ই-বর্জ্যে মাত্র ৩১ শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়ার আওতায় আনা সম্ভব হয়। নগরাঞ্চলে প্লাস্টিক বর্জ্য একটি মৌলিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্লাস্টিক দূষণ থেকে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হওয়ার পাশাপাশি এর মাধ্যমে নগরের দূষণ বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা ও বন্যার মতো সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে।

পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সেগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন উদ্যোগ ও সুফল পরিলক্ষিত হয়নি এবং গুণগত পরিষেবা সরবরাহের বিষয়টি অনর্জিতই থেকে গেছে। নগর প্রশাসনের রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে যে বিষয়টি প্রতিভাত তা হচ্ছে, নগরের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী পয়ঃনিষ্কাশনবিষয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হন। অথচ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় তাদের কাছে বিভিন্ন গণপরিষেবার চাহিদা অনেক বেশি। নগর পরিষেবা ও ইউটিলিটির অভাব ও অপর্যাপ্ততা এবং পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থাপনার ঘাটতি বর্তমানে এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং এতে সবচেয়ে বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন হচ্ছে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও নিম্নআয়ের মানুষ।

এমন বাস্তবতায় এই নীতি বিবৃতির উদ্দেশ্য হলো নগরের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তাসমূহকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে নগরের গণপরিষেবা ও ইউটিলিটি সেবার মানোন্নয়নে একগুচ্ছ সুপারিশ প্রস্তাব করা। এসব সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বস্তিবাসী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী, নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠী - গণপরিষেবাসমূহে যেসব মানুষের চাহিদাগুলো অবহেলিতই থেকে যায়। যে লক্ষ্যে এই সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে তা হলো- বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিত করা এবং নগরেকার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটানো। যাতে যেকোনো উদ্যোগ গ্রহণে ‘কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না (এলএনওবি)’ শীর্ষক এসডিজির মূল দর্শনকে যুক্ত রাখা যায়।

২. সুপারিশমালা

বাংলাদেশে টেকসই নগরায়ণ সম্প্রসারণে নগরীর সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে সুনির্দিষ্ট গুণগত গণপরিষেবাগুলো সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে নিহিত সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় একগুচ্ছ সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে এই অংশে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে হবে

নগর অঞ্চলে গণপরিষেবাগুলোর সরবরাহ শক্তিশালীকরণে ও বিভিন্ন ধরনের সমন্বয়হীনতা দূরীকরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (এলজিআই) যথাযথ ম্যান্ডেট প্রদান ও সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করতে হবে, যাতে এসকল প্রতিষ্ঠান তাদের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন গণপরিষেবা ও সাধারণ সেবাসমূহের ব্যবস্থাপনা করতে পারে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (এলজিআই) নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অর্থ ও মানবসম্পদের ঘাটতি। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মাত্রাতিরিক্তভাবে বিভিন্ন দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছে এবং অব্যাহতভাবে নগরীর জনগোষ্ঠীর যেসব নতুন নতুন চাহিদার উদ্ভব হচ্ছে, সেগুলো মোকাবিলায় যে দক্ষতা প্রয়োজন, তা এসব প্রতিষ্ঠানের নেই। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে নগরীর বস্তি এলাকার জনগোষ্ঠী, নিম্নআয়ের মানুষ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মতো সুবিধাবঞ্চিত নগর অধিবাসীদের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। যথোপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ, আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা আবশ্যক, যাতে তারা নগরকেন্দ্রিক গণপরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনে পর্যাপ্ত মাত্রায় প্রস্তুত থাকতে পারে।

- মানসম্মত গণপরিষেবা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ম্যানডেট বা আদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। আবশ্যিকভাবে এই ক্ষমতাদেশের কেন্দ্রে থাকতে হবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদাসমূহ মেটানোর বিষয়টি।

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে পর্যাপ্ত মাত্রায় সম্পদ বরাদ্দ প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি-বিষয়ক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে এসব প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্টভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভাবসমূহ আমলে নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন গণপরিষেবা ও সাধারণ সেবা সরবরাহে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন নীতি ও আইনের পর্যালোচনা ও সংশোধন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার

নগর প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিদ্যামন আইন ও নীতিমালাসমূহে নিহিত নানা অসংগতি দূরীভূত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুনভাবে উদ্ভূত চাহিদাসমূহ মেটানোর লক্ষ্যে আইনি কাঠামোগুলোর সংশোধন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুনরাবৃত্তি পরিহারের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে এসব কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা আবশ্যক। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুশাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

- নগর অঞ্চলে গণপরিষেবা সরবরাহে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন দ্ব্যর্থকতা ও অসংগতি নিরসনকল্পে প্রয়োজন অনুসারে আইন ও নীতিমালাগুলো হালনাগাদকরণ, সংশোধন ও ক্ষেত্রবিশেষে নতুন বিধিবিধান প্রস্তুত করতে হবে।

- নগরেবিভিন্ন সেবা সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংগতি রক্ষা ও পুনরাবৃত্তি পরিহারকল্পে সংশ্লিষ্ট একক কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও হস্তান্তর নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশের নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় প্রশাসন ইউনিটগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। বিশেষ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান একই নগর অঞ্চলে একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়। এর

ফলে নগরে বিভিন্ন সেবা প্রদানে সমন্বয়, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও কর্মসূচির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় পর্যায় থেকে অধিকহারে সম্পদ সংগ্রহের বিষয়ে সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকারগুলো যাতে নিজস্ব নানা সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের মতো করে বিভিন্ন উদ্ভাবনী বিনিয়োগ কৌশল গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে জোর দিতে হবে।

- সরকারের 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১'-এ যেসব নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে এক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত নগর সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ হবে।

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজউক কর্তৃক প্রণীত বিস্তৃত অঞ্চল পরিকল্পনা (ডিএপি বা ড্যাপ)-এর সুপারিশ অনুসারে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়া আবশ্যক।

- একটি কর্মসম্পাদনভিত্তিক বাজেট বরাদ্দকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে করে ভারসাম্যপূর্ণ নগর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

স্থানীয় পর্যবেক্ষক দল গঠন

পরিকল্পিত নগরায়ণের বিষয়টি নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। কারণ বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী পরিকল্পনার মৌলিক উপাদানসমূহ বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। এই গোষ্ঠী বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে এবং বিভিন্ন বিধিবিধান অমান্য করে। এতে বাংলাদেশে পরিকল্পিত নগরায়ণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলো আরও ঘনীভূত হয়। নগর সেবা সরবরাহে জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে নাগরিকদের অংশগ্রহণে সহ-উৎপাদনভিত্তিক নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, নগর কর্তৃপক্ষের জনবল সংকটের কারণে বিভিন্ন গণপরিষেবার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় বেগ পেতে হয়। এক্ষেত্রে ওয়ার্ড পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক/আধা-আনুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষক দল প্রতিষ্ঠার বিষয়কে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি এ কার্যক্রমকে প্রণোদিত করা উচিত। মনে রাখা দরকার, বিশ্বের সব সুশাসিত নগরে এটি একটি সাধারণ অনুশীলনের বিষয়। নগরকেন্দ্রিক গণপরিষেবা সরবরাহে দক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে এই গোষ্ঠীসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ নগরকেন্দ্রগুলোয় গণপরিষেবা সরবরাহ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধনে ওয়ার্ড ও জনপ্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো উচিত। বিভিন্ন উত্তম চর্চার পুনরাবৃত্তিতে উৎসাহিতকরণের অংশ হিসেবে নগরে কার্যক্রমে এলাকার অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিকরণকে উৎসাহিত করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান মনোভাবের পরিবর্তন ও নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে পারলে এটি টেকসই নগর উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

- জবাবদিহি জোরদারকরণ ও সেবা সরবরাহে দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন শহরের সফলতার উদাহরণ আমলে নিয়ে নগরের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রশাসনিক অঞ্চলে অনানুষ্ঠানিক/আধা আনুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষক দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- গণপরিষেবাসমূহে অভিগম্যতা বৃদ্ধি, সেবা সাশ্রয়ী করা ও সেবার গুণমান উন্নয়নে নাগরিকদের অবহিতকরণের পাশাপাশি অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

- একটি টেকসই নগর উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে নগরীর ব্যবস্থাপনায় জন-অংশগ্রহণ জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়টি কার্যকর উপায়ে গণপরিষেবা সরবরাহ, নগরে শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা, নাগরিকদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি এবং নিম্ন আয়ের মানুষের চাহিদাসমূহ পূরণ নিশ্চিত করবে।

- নগর কেন্দ্রসমূহে গণপরিষেবা সরবরাহের মানোন্নয়নে মাঠ পর্যায় থেকে নগর সেবার বিষয়ে মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে নাগরিক, নীতিনির্ধারক ও সেবা সরবরাহকারীদের মধ্যে নিয়মিত ভিত্তিতে সংলাপ আয়োজনের বিষয়টি জোরদার করতে স্থানীয় নাগরিকদের সমন্বয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন ফোরাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নগর ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়নে অংশীজনদের সংযুক্তি জোরদারকরণ

নগর উন্নয়ন নীতি, কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণের পথনকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ লক্ষ্যে নগরীর জনগোষ্ঠীকে যে কোনো পরিষেবা ও ইউটিলিটি সেবা সরবরাহ-সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্প গ্রহণের পথনকশা তৈরির ক্ষেত্রে অংশীজনদের মতামত গ্রহণের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও নাগরিকদের মতামত প্রকৃত অর্থে অন্তর্ভুক্তকরণ ও নাগরিকদের উদ্বেগের বিষয়সমূহ যথাযথভাবে সমাধান করার লক্ষ্যে এবং খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়নে গণশুনানি আয়োজনের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, নগরকেন্দ্রের সড়কে ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা (হকার) সমস্যার সমাধান বা যানজট-সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে পরামর্শমূলক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সহায়ক নীতি ও কর্মসূচির পথনকশা প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন শহরের সর্বোত্তম উদাহরণসমূহ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

- নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি কার্যকরভাবে মোকাবিলার লক্ষ্যে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও তাদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণের পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

- অন্যান্য শহরের উত্তম চর্চাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী ও সস্তাপণ্যের ভোক্তাদের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে হকারদের ব্যবসা করার জন্য শহরের নির্দিষ্ট এলাকা ও সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে।

ন্যায়সংগত সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

নগরীর সর্বস্তরের অধিবাসীদের নানা ধরনের নাগরিক সেবা ও পরিষেবা সরবরাহের দায়দায়িত্ব আবশ্যিকভাবে সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। গণপরিবহন, আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ইউটিলিটি সরবরাহে যখন বেসরকারি খাতকে যুক্ত করা হয়, সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবায় নাগরিকদের ন্যায্যতাভিত্তিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ ও সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তৎপর থাকতে হবে। বিভিন্ন গণপরিষেবা ও সাধারণ সেবাসমূহের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে সেগুলোয় নাগরিকদের সাশ্রয়ী ও ন্যায্যতাভিত্তিক অভিগম্যতা নিশ্চিত হয়। বিশেষভাবে যেসব মানুষের কাছে সেবা পৌঁছানোর জন্য এসব উদ্যোগ প্রয়োজন তাদের মধ্যে রয়েছেন নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসী, সড়কে বাস করা ছিন্নমূল মানুষ এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, যেমন: দরিদ্র, বয়স্ক মানুষ, দলিত শ্রেণি, হিজড়া জনগোষ্ঠী (ট্রান্সজেন্ডার), শারীরিকভাবে অক্ষম জনগোষ্ঠী, ভবঘুরে প্রভৃতি। এলএনওবির অভীপ্সার নিরিখে বিশেষ চাহিদাসম্পন জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু ও বয়স্কদের চাহিদাগুলোকে নগর পরিষেবা সরবরাহ কার্যক্রমের পথনকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, গণপরিবহনকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে সেটি এসব জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় এবং তারা স্বচ্ছন্দে গণপরিবহনে যাতায়াত করতে পারেন। নগর কেন্দ্রগুলোয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, দিবাযত্ন কেন্দ্র ও চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনসমূহ যাতে নিশ্চিত হয়, সে বিষয়টি গণপরিষেবা সরবরাহে প্রাধান্য দিতে হবে। আবাসন সুবিধা এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সেখানে ভিড় হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি না হয় এবং স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ নিশ্চিত করা যায়; যাতে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতাকেন্দ্রিক (হাইজিন) সেবাগুলোর প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও বস্তিবাসীর জন্য নগরে আবাসিক এলাকার অঞ্চলভিত্তিক বিভাজনের বিষয়টিকে সংবেদনশীল প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

সরকারের যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে, তাতে নগরেপ্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বঞ্চিত হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, এ সুবিধা গ্রামাঞ্চলে বেশ সহজলভ্য। এ কর্মসূচির সংশোধন প্রয়োজন।

- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সরবরাহ করা সব ধরনের নগর সেবা ও পরিষেবাসমূহে যাতে সাশ্রয়ী মূল্যে সব নাগরিকের ন্যায্যতাভিত্তিক অভিগম্যতা নিশ্চিত হয়, সে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে এসব চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে।

- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গুণগত মানসম্পন্ন সেবায় সাশ্রয়ী উপায়ে সবার অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

- বস্তিবাসী ও সড়কে অবস্থানকারী ছিন্নমূল মানুষের পাশাপাশি নগরীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্মনিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে যাতে এসব জনগোষ্ঠী সহজে নাগরিক পরিষেবা পেতে পারে।

- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ন্যায় নগরেজনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত মাত্রায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

- নিম্নআয়ের কর্মজীবী বাবা-মায়ের সন্তানদের জন্য নগরে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- নগরেদরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিসেবা কার্যক্রম সুদৃঢ় করতে স্বাস্থ্য খাতে তাদের নিজস্ব ব্যয় (আউট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার) হ্রাস করতে উদ্যোগ নিতে হবে।

নগর উন্নয়নের বিষয়টি এসডিজির লক্ষ্য ও অন্যান্য বৈশ্বিক এবং জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে

বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহে অন্তর্ভুক্তি ও একীকরণ নিশ্চিতকল্পে গণপরিষেবাসমূহ ও সাধারণ সেবা-সংক্রান্ত সরকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এসডিজি সংযুক্ত করতে হবে। সরবরাহকৃত গণপরিষেবাগুলো অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদা কতটা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে, এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অনুরূপভাবে নগর অঞ্চলের সব উন্নয়ন প্রকল্প এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সেগুলোয় প্যারিস চুক্তির আওতায় জলবায়ু সংক্রান্ত অর্থায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও নিম্নআয়ের মানুষের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রেখে নগর পরিকল্পনায় এসডিজির নির্দেশনাসমূহের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে গণপরিষেবা ও সাধারণ সেবাগুলোর গুণমান বজায় থাকে এবং সেবাগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়।

- সরকারি সেবা ও গণপরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চাহিদাসমূহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সুনির্দিষ্টভাবে রোধন ও ভারসাম্য (চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স) প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারি পরিষেবার গুণগত মান ও অভিগম্যতার বিষয়টির পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের যুক্ত করতে হবে।

একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান

প্লাস্টিক দূষণ রোধে বাংলাদেশ ২০০২ সালে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছিল। ওই সময় বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে যথাযথ তদারকি ও আইন

প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশের নগর অঞ্চলে প্লাস্টিক দূষণ ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ প্রধান সমস্যায় রূপ নিয়েছে। প্লাস্টিক দূষণ হ্রাসে একটি বাস্তবানুগ ও আমূল পরিবর্তনমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। নগর কেন্দ্রসমূহে সবুজায়নে উৎসাহ দিতে এ বিষয়টিকে একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

- টেকসই উপায়ে প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। এই কর্মপরিকল্পনায় ২০২৫ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ প্লাস্টিক পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এছাড়া ২০২৬ সাল নাগাদ একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক ৯০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা এবং ২০৩০ সাল নাগাদ প্লাস্টিক বর্জ্যরে উৎপাদন ৩০ শতাংশ হারে হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে (২০২০/২১ বছরকে ভিত্তিসীমা ধরে)।

- চক্রাকার অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে বহু-অংশীজন ও বহুখাতভিত্তিক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে যেসব নীতিগত ও আইনি সংস্কার প্রয়োজন তা চিহ্নিত করার পাশাপাশি উৎপাদনকারীদের দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ প্রকাশ্যে আনতে হবে এবং লাগসই অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রস্তুত করা দরকার। যথাযথ নিয়ম মেনে কীটনাশক ব্যবহার, আচরণগত পরিবর্তন জোরদারকরণ এবং সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টি শক্তিশালী করতে এসব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

- বিশেষ করে প্লাস্টিক মোড়কজাতকরণ ও প্লাস্টিক বর্জ্যরে পরিমাণ হ্রাস করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে উৎপাদকের সম্প্রসারিত দায়িত্বের (ইপিআর) আওতায় দ্রুত পরিবর্তনশীল ভোগ্যপণ্যের প্রস্তুতকারককে (এফএমসিজি) দায়িত্বশীল হতে হবে। এ পরিকল্পনা কার্যকর করতে পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

উপাত্তের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভাজিত ও গুণমানসম্পন্ন উপাত্তের প্রাপ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপাত্তের বিদ্যমান ঘাটতি নিরসনে প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং বাস্তবতাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বার্থে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। নগর অঞ্চলে গণপরিষেবা সরবরাহের লক্ষ্যে, বিশেষ করে নগরের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এসব সেবার আওতায় আনতে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, নগরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে প্রায়ই নগর উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়ার লক্ষ্যে যথাযথ নীতি প্রণয়নে সহায়ক তথ্য-উপাত্ত থাকে না। এছাড়া বিভাগ, জেলা ও পৌরসভা পর্যায়ের জনবল কাঠামোতে যোগ্যতাসম্পন্ন পরিকল্পনাবিদের কোনো পদ থাকে না। এই ক্ষেত্রে উদীয়মান নানা চাহিদা মোকাবিলায় দায়িত্বপালনকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিবর্গের সচেতনতার অভাব স্থানীয় চ্যালেঞ্জে রূপ নিয়েছে। এসব বিষয় আমলে নেয়া আবশ্যক।

- নগর উন্নয়নে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভাজিত ও গুণমানসম্পন্ন উপাত্তের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শক্তিশালী করতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। উপাত্তের ঘাটতি নিরসনে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চিন্তক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে।

- বিস্তারিত ও বিভাজিত পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহে প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা করতে হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক এলাকার নগর কেন্দ্রগুলোয় গণপরিষেবাগুলোর চাহিদা মূল্যায়ন এবং যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের স্বার্থে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

গণপরিষেবা সরবরাহ কার্যক্রমে সমতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি নগর পরিকল্পনা ও নগর শাসন ব্যবস্থায় গুণগত জীবনমান ও টেকসই উদ্যোগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিকরণে জোর দিতে হবে। বাংলাদেশে কিছু উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব মহাপরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু আর্থিক সম্পদ ও মানবসম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সেসব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন চিত্রও সীমিত। তবে এসব মহাপরিকল্পনার একটি বড় অংশ প্রণীত হয়েছে বেশ আগে, যে কারণে ওইসব পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এসডিজির সময়সীমা, আবাসনের চাহিদা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং সেগুলো বর্তমান জাতীয় নীতি সিদ্ধান্তের সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ নয়। অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে এসব পরিকল্পনার গুণমানের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ। পুরোনো ও নতুন নগর কেন্দ্রগুলোর উদীয়মান বাস্তবতা এবং পরিবর্তনশীল চাহিদাসমূহের কথা বিবেচনায় রেখে এসব পরিকল্পনা নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ করা প্রয়োজন। সেইমতো এগুলোর বাস্তবায়নের বিষয়েও আবশ্যিকভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনসমূহের বিষয়টি আবশ্যিকভাবে বিবেচনায় রেখে মহাপরিকল্পনা, বিল্ডিং কোড ইত্যাদির নকশা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় আইনি বিধান ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কার্যকর করা উচিত। স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোকে সংযুক্তকরণে গৃহীত মহাপরিকল্পনাগুলো সংশোধন করা উচিত যা ব্যয়বহুল সাময়িক পদক্ষেপসমূহ পরিহার করতে সহায়তা করবে। নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এসডিজির এলএনওবি নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নারী, বয়স্ক জনগোষ্ঠী, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির চাহিদার বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে একটি টেকসই ও দক্ষ নগর ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করতে যথাযথভাবে কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদের বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।

- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, টেকসই গৃহায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের পাশাপাশি অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে নগরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এসব উদীয়মান চাহিদা মেটানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

- টেকসই নগর প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পথনকশার পরিকল্পনা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বেসরকারি অংশীজনদের মতামতকে আমলে নিতে হবে। এক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদাসমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে।

স্থানীয় জনহিতৈষী সংগঠনকে সংযুক্ত করতে হবে

সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার ভিত্তিতে নগর কেন্দ্রগুলোর গণপরিষেবাসমূহ সরবরাহ কার্যক্রম কার্যকরভাবে ত্বরান্বিত করতে স্থানীয় জনহিতৈষী সংগঠনগুলোর সক্ষমতা ও শক্তিমত্তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। বিশেষ করে আর্থ-সামাজিকভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন জনগোষ্ঠীর জরুরি প্রয়োজনসমূহ বিবেচনায় রেখে তাদের পুষ্টি, শিশুদের স্কুলমুখীকরণ, স্বাস্থ্য ও আবাসন-সংক্রান্ত কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিতে হয়, সেগুলো বাস্তবায়নে নগর কেন্দ্রগুলোর সম্পদ ও সুযোগের প্রাপ্যতা ও অভিগম্যতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে কর্মজীবী মায়েদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। আর্থিক সম্পদের অভাবের দরুন প্রায়শ নগরকেন্দ্রগুলো এ ধরনের পরিষেবাগুলো সরবরাহ করতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাড়তি তহবিল জোগাড় করার জন্য অরাষ্ট্রীয় অনুঘটক ও জনহিতৈষী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জোর দেওয়া এবং বিষয়টিকে উৎসাহিত করা উচিত। এ ধরনের অংশীদারিত্ব নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যাপকভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে।

- গণপরিষেবা ও সাধারণ সেবা সরবরাহে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব জোরদার করতে স্থানীয় জনহিতৈষী সংগঠনগুলোকে সক্রিয় করার পাশাপাশি তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি দিতে হবে।

- নগর অঞ্চলে নাগরিক পর্যায়ের সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলো মোকাবিলায় অরাষ্ট্রীয় অনুঘটক ও সংগঠনগুলোর সক্ষমতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো উচিত। এ বিষয়টি নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নগর পরিষেবা সরবরাহ কার্যক্রমের নকশা প্রণয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে।

অনানুষ্ঠানিক চর্চাসমূহ নিয়ন্ত্রণ

নগরেসুবিধাবঞ্চিত অংশের নানা ধরনের অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মানুষের মধ্যে রয়েছেন সড়কের ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা (হকার), রিকশাচালক ও অন্যান্য ধরনের সেবা সরবরাহকারী। এসব অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও এগুলোকে সহায়তা প্রদানে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক। যথাযথ নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক খাত আমলে নেয়া উচিত। নগর পরিকল্পনায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবিকার বিষয়টি কোনোভাবেই উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়। এটি শহরাঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ও নিম্নআয়ের মানুষের জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনাকাঙ্ক্ষিত ও প্রতিকূল রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে ।

- নগরীর সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে, যাতে এসব উদ্যোগ কোনোভাবেই সুবিধাবঞ্চিত নগর জনগোষ্ঠীর জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

- পূর্বে যেসব ভুলভ্রান্তি হয়েছে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে আগের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

- নগর পরিষেবাসমূহ সরবরাহ কার্যক্রমে যাতে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও নগরীর সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবিকার উদ্বেগের বিষয়টির মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য বিধান করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

নগর পরিষেবা সরবরাহে দক্ষতার ঘাটতি মোকাবিলা

নগর অঞ্চলে বিভিন্ন পরিষেবা চালুকরণ এবং গুণগত পরিষেবা ও ইউটিলিটি সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রায়ই দক্ষ সেবা সরবরাহকারীর অভাব দেখা যায়। বাংলাদেশে নগর অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষতার ঘাটতি মোকাবিলার বিষয়টি একটি জরুরি প্রয়োজন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দক্ষতার সঙ্গে জরুরি নগর পরিষেবা সরবরাহের এ ঘাটতি মোকাবিলায় সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নগর অঞ্চলে গুণগত উপায়ে সেবা সরবরাহের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন জনবল সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো আবশ্যক।

- সমন্বিত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিকাশ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে সুবিধাবঞ্চিত যুব মহিলা ও কিশোরীদের প্রতি, যাতে করে তারা নগরের বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহে কারিগরিভাবে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

- ভিক্ষুক, দলিত, ট্রান্সজেন্ডার ও ভবঘুরে মানুষের মতো সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায় ও সামাজিকভাবে বিচ্যুত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের পুনর্বাসন করতে লক্ষ্যনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। নগরীর অর্থনৈতিক ধারার মূল স্রোতের সঙ্গে তাদের যুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

- বিশেষায়িত নগর পরিষেবা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যে একাডেমি নগর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও নগরের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় উপযুক্ত কোর্স চালু করবে।

- নগরাঞ্চলে সেবা সরবরাহকারীদের পেশাগত উন্নয়ন ও তাদের ধারাবাহিক শিখন কার্যক্রম জারি রাখতে উপযুক্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও অনলাইন পাঠদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতার উন্নয়নই হবে এসব কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। নগরীর সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলোর প্রতি সংবেদনশীলতা প্রদর্শনের বিষয়টিকে এসব কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

দ্রুত নগরায়ণের বিবেচনায় পুরোনো শহরগুলো ও দ্রুত বর্ধনশীল নতুন নগর কেন্দ্রগুলোর অপরিকল্পিত নগরায়ণের ধারাবাহিকতা, নগরাঞ্চলে গুণগত গণপরিষেবা সরবরাহ এবং নগর প্রশাসনের বিষয়টি বাংলাদেশে সবচেয়ে জরুরি ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বস্তুত বর্তমানে বাংলাদেশে পরিকল্পিত নগরায়ণের বিষয়টি সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের পুরোনো ও নতুন নগর কেন্দ্রগুলোর পূর্ণ সম্ভাবনা ভালোভাবে অনুধাবন করা না গেলে ২০৪১ সালে বাংলাদেশের একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত মাত্রায় গণপরিষেবাসমূহ ও সাধারণ সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিহিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় একটি সমন্বিত ও বাস্তবানুগ নগর পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রচলন ঘটাতে হবে। সাধারণভাবে পর্যাপ্ত মাত্রায় গণপরিষেবা সরবরাহ এবং বিশেষভাবে সুবিধাবঞ্চিত নগর জনগোষ্ঠীর কাছে এই সেবা পৌঁছানোর বিষয়টিকে আলোচনার কেন্দ্রে রাখতে হবে।

টেকসই নগরায়ণ ও নগর পরিকল্পনায় আবশ্যিকভাবে নগরের জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনগুলোর বিষয়ে নজর দিয়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে এবং পরিকল্পনাগুলো পরিবেশগতভাবে টেকসই হতে হবে এবং তাতে সংযুক্ত করতে হবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিষয়টি । এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানোর পাশাপাশি আধুনিক দক্ষতা, নতুন ধরনের বহু-অংশীজনভিত্তিক উদ্যোগ এবং স্থানীয় পর্যায়ের অংশীদারিত্ব জোরদার করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ, অনানুষ্ঠানিক নানা অনুশীলন নিয়ন্ত্রণ, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পদক্ষেপসমূহ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ, উপাত্তের ঘাটতি পূরণ, অন্তর্ভুক্তির বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ জোরদার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ অধিকতর ন্যায্যতাভিত্তিক ও অধিকতর টেকসই নগর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। অরাষ্ট্রীয় অনুঘটকগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব, নাগরিক সংগঠনভিত্তিক চিন্তক প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ ও জনহিতৈষী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি বাংলাদেশে নগরায়াণেরক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা দক্ষতা, ন্যায্যতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে নগরেগণপরিষেবা সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এবং বাংলাদেশে যাতে একটি টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিত হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে একটি সুশাসিত নগর ব্যবস্থাপনা।

৪

সবার জন্য সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি নিশ্চিত করা

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

ড. এ কে এনামুল হক
ডিন, ব্যবসা ও অর্থনীতি অনুষদ
এবং
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

পেনহোল্ডার

ড. সাকিব বিন আমিন
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ;
পরিচালক, অ্যাক্রিডিটেশন প্রজেক্ট টিম (এপিটি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

আবুল কালাম আজাদ
প্রজেক্ট ম্যানেজার
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ
এবং
সাবেক অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক বদরূল ইমাম
অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সাবেক চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

হুমায়ুন রশীদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এনার্জিপ্যাক

ড. ম. তামিম
অধ্যাপক, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

অধ্যাপক ড. এম শামসুল আলম
জ্বালানি উপদেষ্টা
কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

ড. মোশাহিদা সুলতানা
সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ একাউন্টিং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শফিকুল আলম
লিড এনার্জি অ্যানালিস্ট
ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস (আইইইএফএ)

শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী
পরিচালক, সেন্টার ফর এনার্জি রিসার্চ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ)
এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোলিস পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেড

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ যেহেতু সামনের দিক এগিয়ে চলেছে সেহেতু সেই ধারাবাহিকতায় জ্বালানি রূপান্তরের বিষয়াদি উচ্চতর পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলেই প্রত্যাশা করা যায়। দেশের ভেতরে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য জ্বালানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; একইভাবে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নাগরিকদের কল্যাণের জন্যও এটি জরুরি। সবার জন্য সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি নিশ্চিত করা দরকার। বর্তমানে এটি যেমন একটি চাহিদা হিসেবে দেখা দিয়েছে, ঠিক তেমনি এই বিষয়টি সামনে এগিয়ে চলার পথে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবেও দেখা দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে জ্বালানি-সংক্রান্ত বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে জ্বালানি রূপান্তর ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৌশলগত কাঠামো উন্নয়ন করা, সেই সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদে প্রবৃদ্ধির জন্য টেকসই স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, বাংলাদেশ তার জনগণের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও উন্নয়ন চাহিদা মেটাতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশ বড়ো দুটি সমস্যার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রথমত, ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার চেয়ে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল বেশি। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল ছিল প্রাকৃতিক গ্যাসের জোগানের ওপর। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৮০ শতাংশই করা হতো প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে, যা পরবর্তী সময়ে মোটেও টেকসই নয় বলে বিশেষজ্ঞদের কাছে অনুভূত হয়েছে। তখন নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে যথাযথ মনোযোগের অভাব ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যবধানও বেড়ে চলেছিল। পরিণামে একুশ শতকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের জ্বালানি সংকট দেখা দিতে শুরু করে। এর ফলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে তরল জ্বালানির ওপর নির্ভর করতে শুরু করে।

বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এবং নতুন তৈরি হওয়া ব্যবধান ঘোচানোর জন্য বাংলাদেশ অনেকগুলো খাতে সংস্কার শুরু করেছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা কাজে লাগানো হচ্ছে। সংস্কারমূলক উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কিছু সরকারি খাত পুনর্গঠন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং জ্বালানি খাতের জন্য একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই সংস্কার কাজের মধ্যে অনেকগুলোই ১৯৯০-এর দশকে নেওয়া হয়েছিল। বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সরকারি ও বেসরকারি দুটি খাতেই জ্বালানিতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা হয়েছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ বাংলাদেশকে বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান কমাতে সাহায্য করেছে। গত এক দশকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রিড সংযোগও বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যা জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের বিদ্যুৎ প্রাপ্তির ব্যাপক অভিগম্যতার পথ সুগম করছিল।

অন্যদিকে বাপেক্সকে শক্তিশালী করতে এবং অফশোর ও অনশোর গ্যাস অনুসন্ধানে বিনিয়োগের জন্য কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি বললে চলে। গ্রিডের ওপর নির্ভরশীলতাও একটি উদ্বেগ হিসেবে রয়ে গেছে। বিদ্যুতের মান ও ক্রয়ক্ষমতা এবং বিদ্যমান জ্বালানি মিশ্রণের ক্ষেত্রেও উদ্বেগ রয়ে গেছে। ওপরে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সম্পদ অনুসন্ধান কাজেও অবহেলা করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ কম ছিল। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ভোক্তাদের কল্যাণের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনায় না নেওয়ার কারণে জ্বালানির ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই উদ্বেগগুলো বিগত বছরগুলোয় ক্রমাগতভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। আশ্চর্যজনক না হলেও, পরবর্তী সময়ে তৈরি হওয়া জ্বালানি মহাপরিকল্পনা এবং এতে নিহিত অসংগতিগুলো জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও জ্বালানি অধিকার কর্মী কর্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। মাঝারি থেকে দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানি নিরাপত্তা ও জ্বালানি রূপান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনাগুলোকে লক্ষ করে এমন কৌশল এবং অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু জ্বালানির ব্যবহার দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে কম ছিল। বাংলাদেশের জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের একটি ন্যূনতম সীমান্তর নিশ্চিত করার কথা তুলেছেন। এই সীমা যেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাহিদা ত্বরান্বিত করে এবং উচ্চ স্তরের মানব উন্নয়নের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তারা জ্বালানি দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়ার সমূহ বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন। এই ধরনের ফাঁদে আটকা পড়ার ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণ হ্রাস পেতে পারে। কম কার্বন নিঃসরণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নমুখী জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্য অনুসরণ করার জন্য তারা নীতিনির্ধারকদের আহ্বান জানিয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি কারণ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো উসকে দিয়েছে। এসব কারণের অন্যতম একটি হলো কোভিড-১৯ অতিমারি/মহামারী। এর পরিণামে জ্বালানি ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রিক কার্যক্রম বন্ধ রেখে দেশের বিভিন্ন খাতকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে উদ্দীপনা প্যাকেজের জন্য। তারপর আবার বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিবেশ বিরাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে জ্বালানির মূল্য বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ৪২ শতাংশ বেড়েছে। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) গড় মূল্য ২০২১ সালে ছিল ১৮.৬ মার্কিন ডলার/১০ লাখ ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট বা এমএমবিটিইউ। সেই অবস্থা থেকে বেড়ে ২০২২ সালে হয়েছে ৩৩ ডলার/এমএমবিটিইউ। বাড়তে বাড়তে তা ২০২২ সালের আগস্টে ৫৪.১৭ ডলার/এমএমবিটিইউতে পৌঁছায়। ২০২২ সালে প্রতি এক মেট্রিক টন (এমটি) কয়লার গড় মূল্য ছিল ৩৪৫ ডলার। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর তা ছিল সর্বোচ্চ প্রতি টন ৪৩১ ডলার। অথচ আগের বছর অর্থাৎ ২০২১ সালেই কয়লার মূল্য ছিল টনপ্রতি ১১৭ ডলার। প্রাথমিক জ্বালানির অতিরিক্ত বেশি দামের কারণে ব্যাপকভাবে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে, যা উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়ে ব্যালান্স অব পেমেন্টে ঘাটতির মতো সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

এমন একটি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বিরাজমান জ্বালানি খাতের অবস্থাকে অতীব গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান নীতিগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। যাতে সব নাগরিকের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা এবং দূষণমুক্ত/পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিশ্চিত হয়।

এসডিজি ৭ একটি দেশের সব নাগরিকের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি নিশ্চিত করার কথা বলে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বাংলাদেশও এসডিজি ৭-এর বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসডিজির বিবরণ অনুযায়ী, সাশ্রয়ী মূল্যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে সব নাগরিকের অভিগম্যতা এসডিজি ৭-এর মূল বিষয়। জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য শক্তির হিস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এসডিজি ৭.২-তে। এছাড়া এসডিজি ৭.৩-এ জ্বালানি দক্ষতায় উন্নতির বৈশ্বিক হার দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি ৭ অর্জনের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী মূল্যে সবার জন্য জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে, তা নিশ্চিত করাও সমান তাৎপর্যপূর্ণ।

মূল সমস্যা এবং উদ্বেগসমূহ

বাংলাদেশ জ্বালানি খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এই দীর্ঘ যাত্রাপথে বেশ কিছু বিষয়ে উদ্বেগ ও বিতর্ক রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

প্রাকৃতিক গ্যাস কমে যাওয়া এবং বিকল্প সমাধান হিসেবে এলএনজি ব্যবহার

বাংলাদেশ ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসকে সম্মুখ সারির শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প খাতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য। দেশে সাম্প্রতিক কালে তরল জ্বালানির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সুবাদে জ্বালানি-মিশ্রণ পরিবর্তিত হয়েছে। তারপরও বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের হিস্যা এখনো অনেক বেশি। কিন্তু বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস দ্রুত ফুরিয়ে আসার গতি উদ্বেগের প্রধান একটি কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, দেশের প্রধান দুটি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র বিবিয়ানা ও তিতাসে কয়েক বছর ধরে উৎপাদন অনেক কমে গেছে। শুরুতে বিবিয়ানায় মজুদ জমা ছিল ৫,৭৫৫ বিলিয়ন কিউবিকফুট (বিসিএফ) গ্যাস। কিন্তু এখন অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র ২৫০ বিসিএফ। তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে উত্তোলনযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাসের ৭০ শতাংশ এরই মধ্যে আহরণ করা হয়েছে। তার ওপর অন্য সব গ্যাসক্ষেত্রের মজুত দ্রুত ফুরিয়ে আসা সত্যিই অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বর্তমানে গ্যাস ক্ষেত্রগুলো থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ২,১০০ মিলিয়ন কিউবিক ফুট মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড ঘনফুট (এমএমসিএফ)। বর্তমান এ অবস্থা থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১,৩০০ এমএমসিএফে কমে আসার আশঙ্কা রয়েছে। আর ২০৪০ সালের মধ্যে মাত্র এই মজুদ ৫৮০ এমএমসিএফে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই আশঙ্কার সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে সিস্টেম লস একটি ক্রমাগত উদ্বেগ হিসেবে রয়ে গেছে। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে সিস্টেম লস প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ বিশ্বব্যাপী সিস্টেম লসের গড় মাত্র ২.০ শতাংশ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিশেষ করে ২০১৮ সালের শেষের দিকে প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের ওপর জোর দেওয়ার পরিবর্তে সরকার এলএনজি আমদানি ও এলএনজি-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। প্রাথমিক জ্বালানি-সংক্রান্ত চাহিদা এবং সরবরাহের ব্যবধান ঘোচানোর লক্ষ্য নিয়ে সরকার এ কাজ করেছে। জানা যায়, বৈশ্বিক বাজারে এলএনজির দামে বেশ অস্থিরতা বিরাজমান রয়েছে। একই অবস্থা অন্যান্য প্রাথমিক জ্বালানির দামের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। এটা অনেক নতুন উদ্বেগ যোগ করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই সমস্যা দেশকে ভর্তুকি দেওয়ার মতো দুষ্টচক্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক দৃশ্যপট এবং দেশের অভ্যন্তরে চলমান প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতির পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায়, এলএনজি আমদানি বাবদ খরচ সামনের বছরগুলোয় ব্যাপকভাবে বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর পরিণামে ক্রমবর্ধমান ও নাজুক অর্থনৈতিক রাজস্ব ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে। এলএনজি বিতরণের জন্য এখন পর্যন্ত স্থাপন করা পাইপলাইন ব্যবস্থা খুবই সংকীর্ণ। ফলে তা ব্যবহারের ফলে বিতরণ ব্যবস্থাও সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। গ্যাস সংযোগ ব্যবস্থা বা দরকারি অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কাজেই জ্বালানি দক্ষতা নিয়েও দুশ্চিন্তা থেকে যাচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধীরগতি

সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের হিস্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু এখনো তা খুবই সীমিত বা মোট ব্যবহৃত জ্বালানির মাত্র ৩.০ শতাংশের কম। প্রকৃতপক্ষে ২০০১ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মিশ্রণে নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মিশ্রণে নবায়নযোগ্য শক্তির গড় অংশ ছিল ২.৬ শতাংশ। তারও আগে ২০০৯ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে এই হার ছিল ১.৬ শতাংশ। প্রাসঙ্গিক নথিগুলো যাচাই-বাছাই করে বোঝা যায়, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার ধীরগতির পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- যথাযথ নীতি কাঠামোর অভাব, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সীমিত বরাদ্দ, সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোতে বিনিয়োগের অভাব এবং প্রযুক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থ-সামাজিক নানা ধরনের বাধা। এই খাতের বিদ্যমান চাহিদা মাথায় রেখে জাতীয় মানবসম্পদ সক্ষমতা গড়ে তোলা ও তা শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হয়নি। নবায়নযোগ্য

জ্বালানি ব্যবস্থায় রূপান্তরের লক্ষ্যে একটি সময়সীমাবদ্ধ রোডম্যাপও তৈরি করা হয়নি। কার্যকর একটি রোডম্যাপ যদি থাকত, তাহলে তাজ্বালানি নিরাপত্তা, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং জ্বালানির গুণগত মান বিষয়ে গুরুত্ববহ হতো।

প্রথম জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি (এনআরইপি) ২০০৮ সালে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তার পর থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি-বিষয়ক নতুন আর কোনো কৌশল তৈরি করা হয়নি। নতুন নতুন প্রযুক্তি আর ধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আগের নীতিতেও সময়োপযোগী পরিবর্তন আনা হয়নি। পরবর্তী সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মহাপরিকল্পনাগুলোয় (পিএসএমপি) নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসগুলোর উন্নয়নের জন্য নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মহাপরিকল্পনাগুলোয় লক্ষ্য এবং পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্টতার অভাব ছিল। এই পরিকল্পনায় তুলে ধরা প্রস্তাবগুলোর সম্ভাব্য কার্যকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় ছিল। তা সত্ত্বেও এগুলোর বেশিরভাগ নিয়েই আর চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি। আরও উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ প্রণীত সমন্বিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মহাপরিকল্পনায় (আইইপিএমপি) নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসগুলোর সম্প্রসারণের জন্য একটি কৌশলও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপাত্ত থেকে জানা যায়, ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এডিপিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য বরাদ্দের গড় অংশ ছিল মাত্র ৫.৮ শতাংশ। অথচ বেশিরভাগ অংশ বা ৯৪.২ শতাংশ জীবাশ্ম জ্বালানির পেছনে ব্যয়িত হয়েছে। উপরন্তু, সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে কাজে লাগানোর সুবিধা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর পেছনে প্রধান কারণ হিসাবে ছিল অনুপযুক্ত কৌশল প্রণয়ন এবং বিধিবিধান, নীতি রক্ষায় ধারাবাহিকতার অভাব এবং অকার্যকর প্রণোদনা।

সম্প্রতি টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) 'জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০০৮' সংশোধন করার কাজ শুরু করেছে। এ বিষয়ে ধারণাটি হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানি কৌশলকে আধুনিকীকরণ করা এবং সামগ্রিক জ্বালানি কৌশলে নবায়নযোগ্য শক্তি-সম্পর্কিত নীতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা। তবে এই নীতির খসড়া সংস্করণে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়গুলো যথাযথভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খসড়া এনআরইপিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভাবনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে আদর্শ পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির মিশ্রণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়নি। অথচ ২০০৮ সালের এনআরইপিতে এই বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। অধিকন্তু, বিনিয়োগ কর্মকাঠামো, আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস কৌশল, আমদানি শুল্ক বিষয়ক সমস্যা এবং কর ও অন্য বিষয় নিয়েও এতে আলোচনা করা হয়নি। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণ (ফিড ইন ট্যারিফ) কর্মসূচি, মূলধনি ব্যয় (ক্যাপেক্স), পরিচালন ব্যয় (অপেক্স) মডেল ইত্যাদি-সহ মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়েও কোনো আলোচনা নেই এতে । দেশে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর প্রসারের জন্য এই বিষয়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থা গ্রহণে বিভিন্ন উদ্যোগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয় মূলত প্রযুক্তিগত কারণে। বিশেষ করে গ্রিড-ভিত্তিক বিদ্যুতের ক্ষেত্রে। যদিও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থা গ্রহণ দিন দিন সাশ্রয়ী হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংরক্ষণ (স্টোরেজ) ব্যবস্থা একটি প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় হিসেবে থেকে যাচ্ছে। যেমন, একটি ভালো সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া সৌরবিদ্যুৎ রাতের সর্বোচ্চ চাহিদা মেটাতে পারবে না। আবার ভালো সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগের প্রয়োজন। সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত থেকে আশা করা যায়, ২০২৫ সালের মধ্যে সংরক্ষণ (স্টোরেজ) ব্যবস্থার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। এর ফলে স্টোরেজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সৌরবিদ্যুত উৎপাদনের খরচও কমে আসা উচিত। বিকাশমান জ্বালানি মিশ্রণের চাহিদা মেটাতে বর্তমান গ্রিড অবকাঠামোও উন্নত করতে হবে।

উল্লিখিত বিষয়ের বাইরেও অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে কিছু চিন্তার বিষয় রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, সোলার হোম সিস্টেমের (এসএইচএস) বিস্তারে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে; আড়াই কোটিরও বেশি গ্রামীণ মানুষ সৌরচালিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে। তথ্য-

প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, সোলার হোম কর্মসূচির সাফল্যের ওপর ভর করে বাংলাদেশ সম্ভবত একটি দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি দারিদ্র্যের শাস্তি এড়াতে পেরেছে। এই কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রসার ঘটিয়ে। প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দুর্গম লোকালয়ে বসবাসকারী মানুষের কল্যাণে ইতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলেছে। গ্রিড-ভিত্তিক বিদ্যুতের সম্প্রসারণ বিশ্বাসযোগ্যভাবে সৌরবিদ্যুৎ ইউনিটের চাহিদা হ্রাস করেছে। এত কিছুর পরও এসএইচএস কর্মসূচির মূল গুরুত্ব অব্যহত থাকার লক্ষ্য কারণ অনেক গ্রামীণ এলাকায় গ্রিডের বিদ্যুতের দুষ্প্রাপ্যতা ও ভরসা রাখা প্রশ্নসাপেক্ষ থাকা। এছাড়া এই অঞ্চলগুলোকে দীর্ঘ ঘণ্টাব্যাপী লোডশেডিংয়ের মধ্যে থাকতে হয়। উপযুক্ত কর্মসূচিগুলো কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারেনি কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থসামাজিক ঋণ কর্মসূচির অভাব, উচ্চ দর, বিক্রয়-পরবর্তী নানা সমস্যা এবং সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার অনুপস্থিতি। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে নিম্নমানের উপকরণ, স্টোরেজ ব্যাটারির অদক্ষ ব্যবহার এবং কম প্রযুক্তিগত জ্ঞান।

অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ও বিভিন্ন চার্জ নিয়ে বিতর্ক

গত কয়েক বছরে প্রায় ৪০ শতাংশ উদ্ধৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সম্ভব্য, প্রসঙ্গত, গ্রহণযোগ্য বৈশ্বিক অতিরিক্ত সক্ষমতার স্তর প্রায় ২০ শতাংশ। বাড়তি উৎপাদন সক্ষমতার সমস্যা সৃষ্টির পেছনে মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো চাহিদা-সরবরাহের পূর্বাভাস এবং পিএসএমপিগুলোয় ব্যবহৃত দুর্বল পূর্বাভাস পদ্ধতিগুলোর মধ্যে গরমিল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বাড়তি সক্ষমতা আবার ক্যাপাসিটি চার্জের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি বিশেষ আইন অনুযায়ী সরকার বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে অলস পড়ে থাকা অবস্থায়ও খরচ যোগাতে ((চার্জ) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী (আইপিপি), কুইক রেন্টাল (কিউআর) এবং রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি), যাদের লোকসান মেটাতে নিষ্ক্রিয় থাকা অবস্থায়ও সরকার ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে ক্যাপাসিটি চার্জ বাড়তে থাকে। গত ১৪ বছরে সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে ৯০ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করেছে। ২০২২ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাস সরকার ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে ১৬,৭৮৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ক্রমবর্ধমান ক্যাপাসিটি চার্জ সাধারণ ভোক্তার স্তরে বিদ্যুৎ বাবদ খরচের ঊর্ধ্বমুখী চাপের সঙ্গে ব্যাপকভাবে জড়িত। অজানা নয় যে, বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান মূল্য গ্রাহকদের কল্যাণে বিরূপ প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ, যারা সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাদের জন্য। সরকার বিভিন্ন ইউটিলিটি সেবাদাতা কোম্পানির জন্য চার্জ বাড়িয়েছে। ফলে গ্যাস বিক্রেতারা প্রতি কিউবিক/ ঘনমিটারে প্রায় ৮-৯ টাকা বেশি মুনাফা করছে। সম্প্রতি গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্য তিতাস গ্যাসের দর প্রতি ইউনিটে অতিরিক্ত ১০ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো খাতসংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের নানা দিক লঙ্ঘন করেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের ওপর জ্বালানির ক্ষেত্রে অবিচার হয়েছে।

নীতির অসংগতি এবং জাতীয় নীতির সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব

বিগত বছরগুলোয় বাংলাদেশ জ্বালানি খাত ও এই খাতের সংকট মোকাবিলায় বেশ কিছু নীতি গ্রহণ করেছে। যা হোক, জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা একটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, নীতিনির্ধারকেরা বিচ্ছিন্ন পর্যায়ে পরিকল্পনার ওপর মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। যেমন, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে জ্বালানি পরিকল্পনা, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনাগুলো মূলত আমদানি-নির্ভর জ্বালানি নিরাপত্তার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। এর ফলে বহিরাগত আঘাতজনিত নাজুকতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে খুব প্রতিভাত হয়েছে। সঠিক কৌশলের অভাবে এমনটি ঘটেছে। ভবিষ্যতে কীভাবে জাতীয় জ্বালানির রূপান্তর শুরু এবং টেকসই হবে সে সম্পর্কে কৌশল তৈরি করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন অংশীদার সংস্থা যেসব উপাত্ত সরবরাহ করে তা পরস্পরবিরোধী হওয়ায় একটির সঙ্গে আরেকটির ব্যাপক গরমিল দেখা যায়। এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার গুরুতর অভাব রয়েছে।

২. সুপারিশমালা

এরই মধ্যে উল্লিখিত আলোচনা ও উদ্ভূত উদ্বেগের আলোকে এই সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়েছে। সাশ্রয়ী ও গুণগত মানে অভিগম্যতার উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে এই সুপারিশমালায় বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক গ্যাসের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া

প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের ওপর জোর দেওয়া: সরকারের উচিত জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস অনুসন্ধানে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা; সেই সঙ্গে দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস খাতের উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া, যেন দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমহ্রাসমান মজুত আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (এফওয়াইপি) উপাত্ত তথ্য অনুসারে, অনেকগুলো গ্যাস ব্লক অনুসন্ধান করা বাকি রয়েছে, যাদের মধ্যে ১৭টি অনশোর এবং ২২টি অফশোর। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার খাতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান, নীতি বাস্তবায়ন এবং গ্যাস-সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যাপক অদক্ষতা রয়েছে। এগুলো পদ্ধতিগতভাবে কমিয়ে আনতে হবে। সেই সূত্রে সরকারের উচিত বাপেক্সের মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাতে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেশের দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। যেসব ক্ষেত্রে বাপেক্সের অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের সক্ষমতা রয়েছে, সেখানে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে ব্যয়বহুল চুক্তি পরিহার করতে হবে। সরকারের উচিত একটি 'মডেল সেন্ট্রাল' তৈরি করা; যেমন, মালিকানা-পরিকল্পনা-উদ্যোগ, যা পেট্রোবাংলা বা বাপেক্সকে অফশোর ড্রিলিংয়ের জন্য যোগ্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেবে। বর্তমানে তাদের এ ধরনের কাজ করার সক্ষমতা নেই।

ভবিষ্যতে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের জন্য তহবিল গঠন/সহজলভ্য/সংহত করা: সরকারের জ্বালানি খাতে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট/ নিবেদিত তহবিল গঠনের কর্মকাঠামো তৈরি করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান রয়্যালটি এই তহবিলের সম্ভাব্য উৎস হতে পারে। তার সঙ্গে যথাযথ বাজেট বরাদ্দও যুক্ত হতে পারে।

প্রয়োজন মাফিক/প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ গড়ে তোলা: দেশের জ্বালানি খাতের জন্য চাহিদা মাফিক মানবসম্পদ উন্নয়নে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়ে চাহিদার কথা মাথায় রাখতে হবে: যেমন, নতুন নতুন অফশোর ও অনশোর গ্যাস কূপ অনুসন্ধান; পরিত্যক্ত ও পুরোনো কূপের ওয়ার্কওভার; যথেষ্ট মজুত রয়েছে এমন কূপগুলোয় নজর দেওয়া; পূর্বে ব্যয়বহুল হিসেবে বিবেচিত ক্ষেত্র থেকে আবারও উৎপাদন করা; নবায়ন শক্তিতে দক্ষতার বিকাশ; এবং প্রাকৃতিক শক্তি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা। প্রকৃতপক্ষে একটি বিষয়ে সবার পরিষ্কার বোঝা উচিত যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বাপেক্সের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ছাড়া টেকসই উপায়ে জ্বালানি খাতের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না।

সিস্টেম লস কমাতে পদক্ষেপ গ্রহণ: এই নীতি বিবৃতিতে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে জ্বালানি ও গ্যাস খাতে অব্যাহতভাবে অতি উচ্চমাত্রায় সিস্টেম লস রয়েছে। সিস্টেম লসের বিভিন্ন দিক রয়েছে: বিতরণ পর্যায়ে এবং সঞ্চালন পর্যায়ে। বিতরণ পর্যায়ে লোকসান কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু জ্বালানীর স্থানান্তর পর্যায়ে লোকসান অনেক বেশি। এজন্য মূলত দুর্বল অবকাঠামো সবচেয়ে বেশি দায়ী। পুরোনো অবকাঠামো প্রতিস্থাপন এবং প্রযুক্তিগত হালনাগাদের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা দরকার। এর ফলে বিতরণ পাইপলাইনের লিকেজ বা ছিদ্র কমানো সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে জ্বালানি খাতে শাসন ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নত করতে হবে যাতে এই খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি কমানো যায়। খেলাপি কিংবা অবৈধ গ্রাহকদের গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বকেয়া বিল পুনরুদ্ধারের জন্যও নিতে হবে পদক্ষেপ। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধারণাগত হিসাব থেকে

বোঝা যায়, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং ছিদ্র শনাক্তকরণ করে ব্যাবস্থা নেওয়া হলে বছরে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস সাশ্রয় করা যেতে পারে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নের উদ্যোগকে শক্তিশালী করা

বাধ্যতামূলকভাবে নীতি কর্মকাঠামোসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা করা: নিয়মিতভাবে জ্বালানি নীতিগুলো পুনর্বিবেচনা করার জন্য সরকারকে অবশ্যই একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষভাবে মনোনীত পক্ষ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট এই সংস্থার করণীয় দায়িত্বসমূহে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: সময়ে সময়ে নবায়নযোগ্য শক্তি পরিকল্পনা এবং নীতিগুলো পর্যালোচনা করা, দর নির্ধারণ, রাজস্ব প্রণোদনা ও কর নীতি পর্যালোচনা, নীতিমালা ও নতুন নতুন চাহিদার মধ্যে ব্যবধান নির্ধারণ এবং কীভাবে সেগুলোকে মোকাবিলা করা যায় সেই বিষয় চিহ্নিতকরণ, মানবসম্পদের প্রয়োজনগুলো সামনে নিয়ে আসা এবং সামগ্রিক জাতীয় জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিকে একীভূত করার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য যন্ত্রপাতির আমদানি বাবদ প্রদেয় কর অনেক বেশি। সৌরবিদ্যুতের ইনভার্টার এবং সৌর প্যানেল আমদানিতে বর্তমানে যথাক্রমে ৩৭ শতাংশ এবং ২৬ শতাংশ আমদানি শুল্ক দিতে হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং স্রেডাকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তারা দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের উন্নয়ন-সংক্রান্ত চাহিদা, বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং ভোক্তার কল্যাণ বাড়ানোর বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আমদানি শুল্ক যৌক্তিক করতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি মিশ্রণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য একটি সমন্বিত চাহিদা চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপকরণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের প্রসার ঘটানো: বর্তমানে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কিত সরঞ্জামের উৎপাদন নেই বললেই চলে। সরকারের উচিত যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তাসহ উপযুক্ত নীতি এবং আর্থিক ও কর প্রণোদনা প্রণয়ন করে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করা। এখানে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগেরও একটি ভূমিকা রয়েছে।

বাজেটে সহায়তা বাড়ানো: কম কার্বন নিঃসরণ করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার যে গুরুত্ব দিচ্ছে, বাজেট বরাদ্দেও তা প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। সেই আলোকে বাজেট-বিষয়ক নীতিগুলো যথাযথভাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, নতুন নতুন এবং সৃষ্টিশীল পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন কৌশল জনপ্রিয় করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, উদীয়মান ও এশীয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থিক দৃশ্যপটে/পরিমণ্ডলে এগুলোই এখন বেশি দেখা যায়। বর্তমান এসএইচএস সহায়তা কার্যক্রমগুলোকে অবশ্যই বিশেষায়িত সংস্থার নেওয়া উদ্যোগের মাধ্যমে জোরদার করতে হবে। সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল), ইনভেস্টমেন্ট ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি ফর দ্য প্রাইভেট সেক্টর (আইএফএফপি) এবং অন্যান্য সমজাতীয় অন্য সংস্থা। সরকারের উচিত উদ্ভাবনী অর্থায়ন কর্মসূচি জনপ্রিয় করার জন্য সহায়তা বাড়ানো। দেশের বর্তমান গ্রিড অবকাঠামোকে অধিকতরস্মার্ট করে তোলার লক্ষ্যে হস্তক্ষেপের জন্য অনুদান তহবিল এবং স্বল্প সুদে অর্থায়ন উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী অর্থায়ন কর্মসূচির একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। প্রসঙ্গত, আরও গ্রিড ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য বিকেন্দ্রীভূত স্টোরেজ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনের কথা উল্লেখ করা যায়। অন-গ্রিড ও অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমানোর জন্য সবচেয়ে কম খরচের প্রযুক্তির প্রসাার করা উচিত। স্থানীয় তহবিল সংহতকরণের পাশাপাশি বাংলাদেশের উচিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মতো অতিরিক্ত তহবিলের উৎসগুলোও খুঁজে দেখা। ওই দেশগুলো আন্তর্জাতিক অর্থায়নের এবং বিভিন্ন অংশীদারত্বের সুবিধা নিচ্ছে।

ভবনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি পুনরুজ্জীবিত করা: যদিও বাসাবাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল ব্যবহার আরও বাড়ানোর কর্মসূচিগুলো আগে পুরোদমে কার্যকর ছিল না, তবুও এখন সরকারের উচিত বিদ্যমান ত্রুটিগুলো চিহ্নিত ও সংশোধন করে এর প্রসার বাড়ানোর চেষ্টা করা। সৌরবিদ্যুতের আওতা বাড়ানো যেতে পারে সরকারি অফিস, বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প অবকাঠামো, ধর্মীয় উপাসনালয় এবং অন্যান্য ভবনের ছাদে। গ্রিড

বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভোক্তাদের উৎসাহিত করা উচিত। এর সুবাদে ক্রেতারা সরকারের দেওয়া নেট মিটারিং সুবিধা থেকে লাভবান হতে পারেন। সৌরবিদ্যুৎ ইকোসিস্টেমের দ্রুত প্রসার সহজ করতে সরকার আর্থিক প্রণোদনা দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ভর্তুকি আকারে সুবিধা দেওয়া, ঠিক যেমন সুবিধা কেউ কেউ স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বা আইপিপির মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

বায়োম্যাস জ্বালানি ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া: গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ জ্বালানির জন্য বায়োম্যাস ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু উদ্ভিদ বা প্রাণিজ উপাদান ব্যবহার করে জ্বালানি তৈরির এই ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালোভাবে পরিচালিত হয় না। বায়োম্যাস প্রযুক্তি উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। উদাহরণ হিসাবে বায়োম্যাস থেকে বায়ো গ্যাস তৈরির কথা বলা যায়। এখানে একটি ভালো উদাহরণ হিসাবে চীনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জ্বালানি সমতা ও জ্বালানি নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বললে এটি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায়।

বায়ুবিদ্যুতের সম্ভাবনা নিয়ে অনুসন্ধান করা: জ্বালানি বৈচিত্র্যকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকারের উচিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সমুদ্রে বায়ুবিদ্যুৎ তৈরির সম্ভাবনা বিবেচনা করা। কিছু আলোকপাত/ প্রক্ষেপণ ইঙ্গিত দেয় শুধু গভীর সাগরে অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ থেকে ২০ গিগাওয়াট (জিডব্লিউ) পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা, প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ, সম্পদের প্রাপ্যতা এবং অর্থায়নের সুযোগসমূহ মূল্যায়ন করার জন্য সরকারকে একটি প্রণিধানযোগ্য গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

নবায়নযোগ্য উৎসভিত্তিক বিদ্যুতের জন্য গ্রিড অবকাঠামো উন্নয়ন: সৌরশক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যাপকভাবে বিতরণ করার জন্য অবশ্যই স্মার্ট গ্রিড ও স্মার্ট মিটারিং প্রযুক্তি স্থাপন করতে হবে। এটি সামগ্রিক গ্রিড নির্ভরযোগ্যতাও বাড়াবে। যখন গ্রিড বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে না, তখন অফ-গ্রিড বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ব্ল্যাকআউট ও লোডশেডিংয়ের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত উদ্ভাবনী অর্থায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা। এর লক্ষ্য হবে অনুদান তহবিল ও কম সুদের অর্থায়নে অভিগম্যতা পাওয়া। এই তহবিল দেশের বর্তমান গ্রিড অবকাঠামোকে আরও স্মার্ট করে তোলার লক্ষ্যে নেওয়া কর্মকাণ্ডের অনুকূলে ব্যবহৃত হতে পারে। স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি বাজার প্রতিযোগিতার সক্ষমতা জোরদার করবে, জ্বালানির দক্ষতা বাড়াবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা দেবে। এটি নিশ্চিত করবে যে বর্তমান পাওয়ার গ্রিড সিস্টেমগুলোকে প্রভাবিত করে এমন বহুবিধ সমস্যা মোকাবিলার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ করা হবে।

সীমান্তলগ্ন দেশের সঙ্গে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের (সিইবিটি) সুযোগ অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা: বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগের মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সম্ভাবনা আরও অনুসন্ধান করা উচিত। সৌহার্দ্যমূলক/ভারসাম্যপূর্ণ/ সংগতিপূর্ণ নীতি কাঠামো এবং আঞ্চলিক জ্বালানি সহযোগিতা সরকারকে ভারতের মধ্য দিয়ে নেপাল ও ভুটানে উৎপাদিত জলবিদ্যুতের অভিগম্যতা পাওয়ার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে সহায়তা করবে। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে নেপাল ও ভুটানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ সক্রিয়ভাবে যাচাই করা উচিত। তবে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বিদ্যুৎ বাণিজ্য প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমদানির জন্য একক দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কৌশলগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ একটি উদ্যোগ হিসেবে দেখা দিতে পারে। এই ধরনের সমস্ত প্রস্তাব একটি স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা জরুরি।

নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পরিত্যক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কাজে লাগানো: দেশে কিছু কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। এ ধরনের অবকাঠামোগুলো সংস্কার করে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা উচিত। যেমন মহেশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্র। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে নতুন করে

পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য শক্তির প্রকল্প হিসেবে পুনরায় উন্নয়ন করা হলে মূল্যবান সম্পত্তির উৎপাদনশীল ব্যবহারে সহায়ক হবে। অন্যথায় তা অব্যবহৃত থেকে যেতে পারে। এই ধরনের কয়লানির্ভরতা থেকে সরে গিয়ে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপকারী হবে।

বায়োম্যাস প্রযুক্তির উন্নয়নে জোর দিতে হবে: বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার অধিকাংশই বায়োম্যাসের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেখানে বায়োম্যাস ব্যবস্থাপনা খুবই অবহেলিত। গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক পরিসরে গৃহস্থালি ডাইজেস্টার স্থাপন করা হলে তা বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জ্বালানি ব্যবহারে উন্নতি ঘটাবে। চীনে এ প্রযুক্তির ব্যবহারে ভালো সাফল্য রয়েছে। ডাইজেস্টারগুলো কেবলরান্নার জন্য দূষণমুক্ত গ্যাস সরবরাহ করবে না,কৃষি ও গৃহস্থালির বর্জ্য পরিশোধনেও সহায়তা করবে। এমনকি এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্যানিটারি ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জনে সহায়তা করবে।

আর্থিক চাপ কমানো

জরুরি ভিত্তিতে কুইক রেন্টাল (কিউআর) এবং ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরে আসার কৌশল প্রণয়ন করা: যদিও কুইক রেন্টাল এবং অন্যান্য ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৎকালীন বিরাজমান জ্বালানি সংকটের আশু সমাধান হিসেবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সময় এসেছে এগুলো থেকে সরে আসার বিষয়ে গুরুত্বসহ চিন্তা করার। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো এখনো চালু আছে এবং ক্যাপাসিটি বা সক্ষমতা চার্জ লাভ করছে। এই ধারাবাহিক চার্জ প্রদান দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে এবং উল্লেখযোগ্য হারে সরকারের রাজস্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সরকারকে অবশ্যই এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং তা আগামী দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করা হলে তা বিদ্যুৎ উৎপাদনের মিশ্রণে তরল জ্বালানির হিস্যা কমাতেও সাহায্য করবে। পরিণামে জ্বালানি খাতে বিপুল ভর্তুকি কমাতে এ উদ্যোগ সাহায্য করবে। অর্থনীতিতে ভর্তুকি বহুমুখীকরণের প্রেক্ষাপট থেকেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য হারে আর্থিক বোঝা কমাতে সরকারকে বর্তমান চুক্তি ও লাইসেন্সগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করার উদ্যোগ নিতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে সহসাই এই ধরনের কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া সম্ভবপর নাও হতে পারে। এর পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক এবং চুক্তিতে উল্লেখিত বিষয়াদির সীমাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে বন্ধ করার লক্ষ্যে একটি সময়সীমাবদ্ধ প্রস্থান পরিকল্পনা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়ে বিশ্বজুড়ে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সফল মডেলগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

জ্বালানি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা: ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষায় সরকারকে অবশ্যই জ্বালানি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার মাধ্যম হবে সব ধরনের অযাচিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করার আইন প্রণয়ন করা। যাতে জ্বালানি ইউটিলিটি সংস্থাগুলোয় পরিচালকদের রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ সীমিত করা হয়; বিইআরসি-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সংশোধনী বাতিল করা হয়; জ্বালানি-বিষয়ক সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত অতিরিক্ত চার্জ গ্রহণ বন্ধ করা হয় । জ্বালানি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এসডিজি ৭ অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসডিজির এই লক্ষ্য জ্বালানি নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্য ও সামর্থ্যেরে কথা বলে। দেশের জ্বালানি খাত-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবশ্যই একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতিতে হতে হবে। এতে সংশ্লিষ্ট সব গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকা উচিত।

বিদেশি/ভিনদেশি কোম্পানির ওপর নির্ভরতা কমানো: সরকারের অবশ্যই জ্বালানি খাতের জন্য বিদেশি পরামর্শক-নির্ভর মহাপরিকল্পনা অনুমোদন করা উচিত হবে না। এই ধরনের পরিকল্পনায় ব্যাপকভাবে বিদেশি পরামর্শদাতা, বিদেশি ঋণ ও বিদেশি কোম্পানি, আমদানি করা কয়লা, পারমাণবিক শক্তি এবং এলএনজির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করা হয়।

বিদেশি খনিজ অনুসন্ধানকারী কোম্পানিগুলোর ওপর নির্ভরতা প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত আহরণ, বাড়তি মূল্য নির্ধারণ ও রপ্তানির জন্য চাপ বাড়ানোর ঝুঁকি তৈরি করে। তাই সরকারকে অবশ্যই জ্বালানি খাতের সুচিন্তিত

একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এই পরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে দেশের সক্ষমতা বিনির্মাণের মাধ্যমে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সম্পদ অনুসন্ধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিদেশি কোনো কোম্পানিকে সম্পৃক্ত করার কথা তখনই বিবেচনা করা যেতে পারে, যেক্ষেত্রেজাতীয় সক্ষমতা দিয়ে নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করার সামর্থ্য ও প্রস্তুতি থাকেনা।

জাতীয় স্বার্থের চাহিদা পূরণ করে এমন সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছভাবে পরিকল্পিত নীতি প্রণয়ন করা

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন করা: দেশে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি সুরক্ষার স্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রয়োজনসমূহ, জাতীয় জ্বালানি মাস্টারপ্ল্যান, নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন উদ্যোগগুলো পর্যালোচনা, সংশোধন এবং হালনাগাদ করতে হবে। এ-সংক্রান্ত সব ধরনের সিদ্ধান্ত একটি স্বচ্ছ পদ্ধতিতে বিস্তৃত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। সকল প্রাসঙ্গিক নথি সব সংশ্লিষ্ট অংশীদারের জন্য অভিগম্য হওয়া উচিত। যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ করে দিয়ে এবং আলোচনা ও সংলাপে অংশীদারদের জড়িত করার মাধ্যমে নীতিগত ত্রুটিগুলো প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেই ধারাবাহিকতায় সঠিকভাবে সমাধানও করা যেতে পারে। দক্ষ সরবরাহ-অনুষঙ্গী ব্যবস্থাপনা (উৎপাদন ও বিতরণ) এবং নির্ভরযোগ্য চাহিদা সম্পর্কিত বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যবস্থা জ্বালানি পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হওয়া উচিত। জ্বালানি খাত পরিচালনার সর্বোত্তম অনুশীলনে আঞ্চলিক জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ নিতে হবে।

জ্বালানিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করা: অনেকেরই জানা আছে জ্বালানি অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বৃহৎ পুঁজি সংশ্লিষ্ট একটি কাজ। জ্বালানি অবকাঠামোর অর্থায়নের সব চাহিদা শুধু সরকারি বিনিয়োগ দিয়ে পূরণ করা যায় না। জানা রয়েছে যে, বাংলাদেশে জ্বালানি শিল্পের বিকাশে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করার সময় সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে এটি নির্দেশিকা মেনে করা হচ্ছে এবং দেশ ও দেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপট থেকে জ্বালানি খাতে বেসরকারি ব্যবসা, বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের সংশ্লিষ্টতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে সঠিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।

কার্যকর জ্বালানি উপাত্ত ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা: নিরাপদ জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জ্বালানি সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী উপাত্ত (ডেটা) ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে চাহিদা, বিনিয়োগ ও অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আলোকোপাত করা এবং সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও উপাত্ত ব্যবস্থাপনার দরকার। অথচ বাংলাদেশে জ্বালানি খাতের নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের প্রাপ্যতা একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারকে জ্বালানি খাতের জন্য একটি জাতীয় ডেটা ব্যাংক বা উপাত্ত ব্যাংক তৈরি করতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে। এমনভাবে তা হতে হবে যেন উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচার এবং ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়। আধুনিক ও স্মার্ট প্রযুক্তির সহায়তা এক্ষেত্রে কাজে আসবে। এক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারভিত্তিক উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে হবে। সরকারের একটি এনার্জি ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠার কথাও বিবেচনা করা উচিত। এই ডেটা সেন্টার নির্ভরযোগ্য উপাত্ত ও তথ্যের ভিত্তিতে জ্বালানি খাতের জন্য নির্ভরযোগ্য নীতি প্রণয়ন করতে সহায়তা করবে।

একটি খনিজ সম্পদ রপ্তানি নিষিদ্ধ আইন প্রণয়নের বিষয়ে বিবেচনা করা: বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ (অফশোর ও অনশোর) দেশের জন্য জ্বালানির অন্যতম প্রধান অ-নবায়নযোগ্য উৎস। এই সম্পদ সীমিত। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই সম্পদগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেতে হবে। এই সম্পদগুলো্র অনুসন্ধান কার্যক্রম অবশ্যই রপ্তানি-অনুমোদন চুক্তি সাপেক্ষে হওয়া উচিত নয়। যথাযথ নীতি গ্রহণ করা হলে এই সম্পদ বাংলাদেশকে জ্বালানি নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম করবে। সরকারের উচিত দেশের খনিজ সম্পদ রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা। এই আইনের

লক্ষ্য হবে দেশের খনিজ সম্পদ যেন দেশের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যবহার করা হয়। এগুলো যেন জনগণের হাতেই থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান কাজের প্রক্রিয়া এমনভাবে সাজানো এবং ক্রমান্বয় ঠিক করা উচিত যাতে উত্তোলিত গ্যাস ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাহিদা মেটানো যায় এবং গৃহস্থালি কাজে ও শিল্পকারখানায় ব্যবহার করা যায়। এর ফলে গ্যাস রপ্তানি করা হবে কি না, এমন প্রশ্নই যেন আর না ওঠে।

জ্বালানি দক্ষতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা এবং কার্যকর চাহিদা-নির্ভর ব্যবস্থাপনা (ডিএসএম) নিশ্চিত করা

জ্বালানি দক্ষতার প্রসার ঘটানো: সরকারকে অবশ্যই জ্বালানি দক্ষতার উদ্যোগসমূহ নিতে হবে। এটি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া সরকারকে জ্বালানিসাশ্রয়ী প্রযুক্তির জন্য কর ছাড়ের মাধ্যমে প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। ভোক্তাদেরকে জ্বালানি-সহায়ক কার্যকর গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি কিনতে উৎসাহিত করতে হবে। প্রচুর জ্বালানি সাশ্রয় করতে পারে, এমনগৃহস্থালি সরঞ্জাম ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলা উচিত। এছাড়া জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন আনতে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি চালু করা উচিত। অনুরূপভাবে জ্বালানিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি-সহায়ক পণ্য তৈরি করার জন্য উৎপাদনকারীদের আর্থিক, কর-সংক্রান্ত ও নিয়মমাফিক প্রণোদনা দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার হয়, এ ধরনের পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানো হলে তার বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব পণ্যের দিকে ঝুঁকতে সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করে তুলবে। পিক ও অফ-পিক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ চাহিদা (পিক) কমানো যেতে পারে।

ডিএসএম উদ্যোগকে জোরদার করা: জ্বালানি খাতের কার্যনির্বাহের মানোন্নয়নের জন্য দক্ষ ডিএসএম প্রয়োজন। নিরাপদ লোড ব্যবস্থাপনা জ্বালানি উৎপাদনকারী এবং বিতরণকারীদের প্রাপ্য জ্বালানিকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। জ্বালানি সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ব্যবধান কমাতে এবং সর্বোচ্চ লোডের চাহিদা কমাতে লোড ব্যবহারের এই ধরন আশাব্যঞ্জক সেতুবন্ধের কাজ করে। এই প্রক্রিয়া ব্যাপক মাত্রায় জ্বালানি দক্ষতায় অবদান রাখে। ডিএসএম বিদ্যুৎ সরবরাহকারী ও ভোক্তা দুই পক্ষের জন্যই সুফল বয়ে আনে। এই পদ্ধতি বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা ও পরিচালন দক্ষতা উন্নত করতে সহায়তা করে। ডিএসএম তাদের জন্য আর্থিকভাবে উপকারী হয়। কেননা ডিএসএম পিক সময়ে তরল জ্বালানি তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পর্যাপ্ত ব্যবহার অনুমোদন করে। একই সময়ে অন্যান্য কারখানার ধারাবাহিক পরিচালন কার্যক্রম বজায় রাখে। এর ফলে ভারসাম্যপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে ভোক্তারা জ্বালানি ব্যবহারের ধরন ও পিক সময়ের চাহিদা হ্রাসের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় থেকে উপকার পেতে পারে। এটি সিস্টেম লোড প্রোফাইলের উন্নতিতেও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত হারে অভিযোজনযোগ্য (অ্যাডাপটেবল) লোডের অভাব এবং জনসচেতনতার ঘাটতির কারণে ডিএসএমের সুবিধাগুলো পুরোপুরি নেওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন আশাব্যঞ্জক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য বেস, ইন্টারমিডিয়েট ও পিক হিসেবে লোডগুলোকে শ্রেণিভেদ করার বিষয়টিও বিবেচনা করার যেতে পারে।

আঞ্চলিক ও খাত-নির্ধারিত চাহিদার চিত্র সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ/ বিষয়ে ধারণার কাজ গ্রহণ করা: বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার প্রবণতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ চাহিদাসহ (পিক) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ধরনে পার্থক্য রয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক বিদ্যুতের বাজার এবং সেখানকার চাহিদার জন্য পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এর ফলে খরচকে যৌক্তিক করা এবং পরিবেশগত ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করা হবে। এই পদ্ধতিটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। প্রস্তাবিত অনেকগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে বর্তমানে কয়েকটির নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক চাহিদা নির্ণয় ব্যবস্থা সঠিক জ্বালানি বিতরণ নিশ্চিত করে পরিবহন চাহিদার ভালো ব্যবস্থাপনা করে খরচ কমাতেও সাহায্য করতে পারে। দরকারের চেয়ে অতিরিক্ত কিংবা কম উৎপাদন করতে না চাইলে সরকারকে অবশ্যই জ্বালানি চাহিদার আঞ্চলিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ৫ বছরের সম্ভাব্য জ্বালানি চাহিদার নির্ভরযোগ্য চিত্র তুলে ধরতে হবে। চাহিদার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য অনুমান জনসংখ্যা-ভিত্তিক প্রাক্কলনের ওপর নির্ভরতা দূর করতে সাহায্য

করবে। এর ফলে আরও নির্ভুল জ্বালানি চাহিদার পূর্বাভাস পাওয়া যাবে। বর্তমান সক্ষমতা, জ্বালানি উৎপাদন এবং বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি ও জ্বালানি মিশ্রণের স্তর নির্ধারণের জন্য গৃহস্থালি ও শিল্প চাহিদা সম্পর্কে উপযুক্ত চিত্র উপস্থাপন করা জরুরি।

বিইআরসির সক্ষমতা জোরদার করা এবং একটি স্বাধীন জ্বালানি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা

খরচ ও শুল্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিইআরসির অবশ্যই পালনীয় কাজগুলো করার সক্ষমতা জোরদার করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অবশ্যই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সম্পন্ন করতে হবে। এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেন গণশুনানি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ভোক্তার বক্তব্যতে স্বার্থ রক্ষাকে যেন যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ভোক্তার অধিকার সুরক্ষিত হয়। জ্বালানি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিইআরসির কর্তৃপক্ষের পূর্বের অবস্থান ফিরিয়ে দিতে হবে। সরকারের উচিত একটি বিশেষায়িত স্বাধীন জ্বালানি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা। কমিশনগঠনে সরকারকেজ্বালানি বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ, অর্থায়ন বিশ্লেষক, আইন বিশেষজ্ঞ এবং সুশীল সমাজ ও ভোক্তা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। এই কমিশন বিভিন্ন খাতের অংশীজনদের মধ্যে সংলাপকে উৎসাহিত করবে এবং জ্বালানি কৌশল, নীতিমালা ও দর প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে। স্বাধীন কমিশন জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ এবং জ্বালানি ইউটিলিটিগুলোর কার্যকারিতা পরিমাপের পদ্ধতি (সূত্র) সম্পর্কেও নির্দেশিকা প্রদান করতে পারে।

সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, জ্বালানি খাতে সাইবার-আক্রমণের শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি। দিন দিন ঝুঁকি বাড়তে থাকায় সাইবার-আক্রমণ থেকে জ্বালানি ব্যবস্থা রক্ষা করার কাজ পর্যায়ক্রমে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই কর্তব্য শুধুই জ্বালানি খাতের স্বার্থে নয়, বরং অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও প্রয়োজন। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সাইবার অভিঘাত সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জ্বালানি পরিকল্পনার প্রক্রিয়ায় এবং জ্বালানি-সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিষয়গুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রতিটি পর্যায়ে সাইবার অভিঘাত-সহনশীলতা জোরদার করার জন্য এবং হুমকির উৎস সম্পর্কে আগেভাগেই সতর্ক থাকার জন্য সরকারকে জ্বালানি খাতের সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক রাখতে হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণমান এবং নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করা

স্থিতিশীলতা ধরে রেখে বিদ্যুতের সরবরাহ বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারকে স্থির ভোল্টেজের মাত্রা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে যেন নির্বিঘ্ন প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা করা যায় এবং বিঘ্ন এড়ানো যায়। উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের ব্যবহার জ্বালানি পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে।

সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা

বিদ্যুতের উচ্চ-মাত্রার সঞ্চালন লাইন স্থাপনে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কেননা তা ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র দ্বারা উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ অপসারণের জন্য দরকার হবে। ভোক্তার কাছে ভরসা রাখার মতো এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে সরকারের উচিত একটি কার্যকর বিতরণ ব্যবস্থা চালু করার কাজটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। জ্বালানি খাতের ভবিষ্যতের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের উচিত বড় ধরনের দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের পথ খুঁজে নিয়েকার্যকর সঞ্চালন ও বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা।

একটি বিকল্প রূপান্তরশীল জ্বালানি হিসেবে এলএনজি

প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান কাজ বাস্তবায়ন করতে সময় লাগে। এছাড়া এ কাজে সাফল্যের অনুপাত সীমিত। তাই দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি-মিশ্রণটি কী হতে পারে, সে বিষয়ে কিছুটা পরিষ্কার ধারণা পেতে সময় লাগবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস ফুরিয়ে আসছে। এর একটি মূল কারণ অতীতে গ্যাস অনুসন্ধানে বিনিয়োগের বিষয়ে সরকারের উদ্যোগের অভাব। বর্তমানে সরকার চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান মেটানোর জন্য এলএনজি-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বাড়তি অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশে এখন দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) রয়েছে। এগুলোর মোট ক্ষমতা বছরে ৭৫ লাখ টন। একটি ভূমিভিত্তিক টার্মিনাল তৈরির কাজও চলছে যেটি বছরে ৭.৫ মিলিয়ন টন এলএনজি (এমটিপিএ) দেখভাল করতে পারবে। আশা করা হচ্ছে ৫ বছরের মধ্যেই এটি প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে বিদ্যমান পাইপলাইন নেটওয়ার্ক ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য খুবই সংকীর্ণ বলে মনে করা হয়। তার ওপর আমদানি করা এলএনজির দাম বাড়তি ও অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাংলাদেশে এলএনজি পরিবহনকারী জাহাজগুলোর বেশি ভাড়ার কারণে এফএসআরইউগুলোর পরিচালন ব্যয়ও বেশি। এসব বিষয় বাজারে অসামঞ্জস্য ঘটাতে পারে। ফলে ক্রমাগত উচ্চ মূল্য পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতে সরকারের জন্য একটি অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় ভর্তুকি দেওয়ার মতো প্রয়োজন সৃষ্টি করতে পারে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সক্ষমতা এবং ক্যাপাসিটি চার্জ-সংক্রান্ত সমস্যা ঝুঁকিগুলোও সরকারের চিহ্নিত করা উচিত। একই ধরনের ঝুঁকি রয়েছে এলএনজির সঙ্গে সম্পর্কিত সম্ভাব্য দর পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও । আরও উল্লেখ করা জরুরি যে অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান এবং গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের ব্যয় এলএনজি আমদানির ব্যয়ের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যম থেকে দীর্ঘ মেয়াদে একটি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলএনজির ওপর উচ্চমাত্রায় নির্ভরতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকছে। ব্যাপক বিনিয়োগের আগে সরকারের উচিত এলএনজি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করা। বিশেষ করে আমদানি করা এলএনজির ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বৃহৎ আকারের বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারের উচিত হবে অর্থায়ন, রাজস্ব এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাবগুলো অধ্যয়ন করা । ভবিষ্যতের জন্য জ্বালানি মিশ্রণ কৌশল চূড়ান্ত করার আগে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনার আওতায় অবশ্যই এলএনজি সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি খাতের উন্নয়ন কৌশল নকশা করার মূল কৌশল হিসেবে মহাপরিকল্পনাটিতে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ অফশোর ও অনশোর অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

জ্বালানি খাতে গবেষণা ও উন্নয়নের (আরঅ্যান্ডডি) প্রসার ঘটানো

যেহেতু জ্বালানি বিষয়ক প্রযুক্তি এবং জ্বালানির বিকল্পগুলো জনগণের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ, পরিবেশের গুণমান এবং জাতীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান নির্ধারক সেহেতু এসব বিষয়কে আবদ্ধ রেখে পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রমাণভিত্তিক বিদ্যুৎ খাতের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা যাবে না। জ্বালানি খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগকে অবশ্যই সঠিক নীতি প্রণয়নের মূল পূর্বশর্ত হিসেবে দেখতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের দরকারি সব আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তাদিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার জ্বালানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিযোগিতামূলক ও বিপণনযোগ্য করার জন্য একটি এনার্জি স্টোরেজ ল্যাব প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে পারে। এটি বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সহায়তা করবে। গবেষণা ওউন্নয়নে বর্ধিত বিনিয়োগ বায়ু, সৌর, জৈব জ্বালানি এবং ভূ-তাপীয় জ্বালানি খাতে আরও বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে একটি বৈচিত্র্যময় জ্বালানির মিশ্রণের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

জ্বালানি রূপান্তর প্রক্রিয়া সামনে এগিয়ে নিতে একটি সমন্বিত জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা

গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ালেও দেশকে সামনের দিকে যেতে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় ইতোমধ্যে যে উল্লেখ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রতি সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে অবশ্যই নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসের পক্ষে জ্বালানি পরিবর্তনের দিকে যেতে হবে (বক্তব্য স্পষ্ট হয়নি)। বাংলাদেশকে বিভিন্ন বৈশ্বিক ফোরামে এসডিজির প্রতিশ্রুতি ও অবস্থান সম্পর্কে নিজ কৌশলের বিষয়ে অবহিত করতে হবে। এই ধরনের একটি কৌশল বাংলাদেশকে রূপকল্প ২০৪১-এর আকাক্সক্ষা অর্জন করতে সক্ষম করবে, যেই রূপকল্পে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের একটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই দেশে রূপান্তর করার অভীপ্সা রয়েছে। পরিবেশবান্ধব ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের জন্য সরকারকে অবশ্যই একটি সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে। এই পরিকল্পনায় উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কয়লা ও পরমাণুভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো

সরকারকে অবশ্যই কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঝুঁকি এবং পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়টি স্বীকার করতে হবে। মনোযোগ অবশ্যই টেকসই এবং দূষণমুক্ত জ্বালানি বিকল্পের ওপর নিবদ্ধ হতে হবে। অতিরিক্ত খরচ এবং পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকারক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে হবে। জীবাশ্ম ও পারমাণবিক জ্বালানির সঙ্গে আসা ভয়ংকর পরিবেশগত এবং সামাজিক সংকটের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রেখে সরকারের নীতি তৈরি করতে হবে।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

যে কোনো একটি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জ্বালানি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ বিভিন্ন খাতে জ্বালানি সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। তবে দেশ বর্তমানে জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান নীতি বিবৃতি পূর্ববর্তী সেকশনে কয়েকটি মূল সমস্যাকে সামনে তুলে ধরেছে। জ্বালানি-সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং নীতিমালাকে ঢেলে সাজিয়ে সামনের দিকে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই নীতি বিবৃতিতে বেশ কিছু করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এর মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর, সাশ্রয়ী মূল্যে দুষণমুক্তজ্বালানিতে অভিগম্যতা, অভ্যন্তরীণ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে বিনিয়োগ, এলএনজি-কেন্দ্রিক আমদানি-নির্ভরতা এবং জীবাশ্ম ও পারমাণবিক জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে পিছিয়ে আসার বিষয় রয়েছে। এছাড়া এতেগ্যাস অনুসন্ধানে দেশীয় সক্ষমতা বড়ানো, জ্বালানি খাতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রমাণভিত্তিক সময়-পরিবর্তন নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই বিবৃতিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক ফোরামে বাংলাদেশের এসডিজি প্রতিশ্রুতি এবং অবস্থানের বিষয়ে। একটি পরিবেশবান্ধব, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা অর্জনের চ্যালেঞ্জটি অনেকাংশে নির্ভর করবে দেশটি জ্বালানি বিষয়ে করণীয় সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছে কি না তার ওপর। এটি নির্ভর করছে বাংলাদেশ তার অর্থনীতির প্রয়োজন এবং জনগণের আশা-আকাক্সক্ষা পূরণ করে জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জ্বালানি স্থানান্তরের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় কাজটি করতে সক্ষম কি না তার ওপর।

৫

গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

রাশেদা কে চৌধুরী
কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
এবং
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

পেনহোল্ডার

ড. মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ (প্রিন্স)
সহ-গবেষক
গণসাক্ষরতা অভিযান

ড. মনজুর আহমদ
ইমেরিটাস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
ভাইস চেয়ারপার্সন ও উপদেষ্টা, গণসাক্ষরতা অভিযান

ড. মো. আব্দুল হালিম
অধ্যাপক এবং পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. মনিরুজ্জামান
যুগ্ম পরিচালক (এডুকেশন এন্ড টিভিইটি)
ঢাকা আহছানিয়া মিশন

প্রফুল্ল চন্দ্র বর্মন
প্রোগ্রাম হেড- শিক্ষা
ব্র্যাক

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ
প্রধান সমন্বয়কারী
জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট

রাফেজা আক্তার
প্রজেক্ট ম্যানেজার
এডুকো বাংলাদেশ

রিফাত বিন সাত্তার
পরিচালক – প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি
সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ

ড. শফিকুল ইসলাম
সাবেক পরিচালক
ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি (বিইপি)

সমীর রঞ্জন নাথ
প্রোগ্রাম হেড
ব্র্যাক আইইডি (ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট)

সুক্রেশ জর্জ কস্তা (প্রয়াত)
পরিচালক, প্রোগ্রামস
কারিতাস বাংলাদেশ

তাহসিনাহ্ আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

বেশ কিছুসংখ্যক আর্থসামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের জন্য কৃতিত্বের দাবিদার বাংলাদেশ। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে চলার পথে এই অর্জন বাংলাদেশকে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে। এ অর্জনের পেছনে নানা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও রাষ্ট্র-বহির্ভূত উদ্যোগ উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়টি সুবিদিত যে, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; এই অর্জনে মুখ্য নির্দেশক হচ্ছে গুণগত শিক্ষায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০২৩' অনুসারে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান ১০১তম। এক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের সামগ্রিক স্কোর ৬৫.৯। এ সময় বাংলাদেশ এসডিজির ৩০.৯ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা হয় অর্জন করেছে, অথবা অর্জনের পথে রয়েছে। আর ৪১.২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রায় খুবই সীমিত অগ্রগতি হয়েছে এবং ২৭.৯ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার অর্জন পরিস্থিতির অবনমন হয়েছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখ্যতা হচ্ছে, গুণগত শিক্ষার বিষয় (এসডিজি-৪) যা সেই দুটি অভীষ্টের একটি অংশ, যারবাস্তবায়নে বাংলাদেশ সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে মর্মে মূল্যায়ন করা হয়েছে (অন্য অভীষ্টটি হচ্ছে পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন - এসডিজি ১২)।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ যখন নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত এবং ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণে সংকল্পবদ্ধ, তখন তাআর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির নির্দেশক হয়ে ওঠে। তবে এই দ্বৈত উত্তরণ বাংলাদেশের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জোরালো চ্যালেঞ্জের জন্মদিয়েছে। তবে মানসম্মত শিক্ষা সরবরাহের ক্ষেত্রে এই চ্যালেঞ্জগুলো কোথাও ততটা জোরালোভাবে প্রতিভাত হয় না। বস্তুত বাংলাদেশ যদি এই বৃহৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সম্ভাব্য সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে টেকসই উপায়ে এই দ্বৈত উত্তরণের বিষয়টি অতিক্রম করতে চায়, তাহলে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার দরকার পড়বে। এতৎসঙ্গে বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার এক উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই রূপান্তরের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে, যা এই প্রত্যাশাগুলোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং দেশের উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষার চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথচলার জন্য যে বিষয়গুলো মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে তা হলো উচ্চমাত্রার উৎপাদনশীলতা ও শক্তিশালী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেসক্ষমতা। একই পরিপ্রেক্ষিতে মানসম্পন্ন শিক্ষার ভূমিকাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই, কেননা এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক ও আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার গুণগত মানের দিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি সর্বোচ্চ মনোযোগেরদাবিদার এবং সাম্প্রতিক অতীতে কোভিড অতিমারির বিরূপ প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রম সাধারণভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় এ ক্ষতির হার সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের আকার বিপুল। প্রায় দেড় লাখ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চার কোটি শিক্ষার্থী এবং ১০ লাখের ওপর শিক্ষক শিক্ষা খাতের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ (১৯ মিলিয়ন), আর মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটি ২০ লাখের মতো (সরকার-স্বীকৃত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীসহ)। দেশের মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন নির্দেশিত হয়বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০, ইএফএ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (এনপিএ) ১ ও ২, জাতীয় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি ২০০৬, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০৪১ দ্বারা। মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করতে বছরের পর বছর ধরে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়িতহয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি - পিইডিপি ১, পিইডিপি ২ ও পিইডিপি ৩। বর্তমানে পিইডিপি ৪ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বস্তুত বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের কর্মসূচিগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির অভীষ্ট ৪-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করা।

গত দশকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী ভর্তি ও শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। মোটাদাগে শিক্ষার্থীভর্তির হার (জিইআর) ছিল ১১০.৫ শতাংশ এবং নিট ভর্তির হার (এনইআর) ছিল ৯৭.৬ শতাংশ। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার প্রায় ১৪ শতাংশ (বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২)। প্রাক-প্রাথমিক শিশুশিক্ষার গুরুত্বের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়ে ২০১৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর ভর্তি হওয়ার পূর্বে এক বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ২০২৩ সালে জানুয়ারিতে তিন হাজারেরও বেশি বিদ্যালয়ে দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হয়।

শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যে নাগরিকদের অধিকার এবং সেটি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, সে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টিরকোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তার মান নিয়ে সবসময়ই কিছু না কিছু প্রশ্ন রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষা পরিবেশে কী শেখানো হচ্ছে, সে বিষয়টি শিশুদের কল্যাণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষা তাদের পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় কতটা কাজে আসবে এবং ভবিষ্যতে এই শিক্ষার প্রয়োগযোগ্যতা কতটুকু, সে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবেচনা থেকে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি রচনা করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা মুখ্য ভূমিকা রাখে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশকিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষায় অভিগম্যতা ও মানসম্মত শিক্ষাদান, যথোপযুক্ত অবকাঠামো, যোগ্য শিক্ষকের উপস্থিতি, আধুনিক শিক্ষা উপকরণের প্রাপ্যতা,শিশুদের যথাযথ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য এবং শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষা সহায়ক শিখন পরিবেশ।

এই নীতি বিবৃতিতে বিশেষত বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে গুণগত শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ একটি বিষয় লক্ষ করা গেছে যে, এই সুনির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ধাপের শিক্ষা গ্রহণের ভিত তৈরি করে দেয়। শিশুরা যদি এই স্তরে গুণগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে এর পরবর্তী ধাপগুলোয় তারা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে তা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবেনা। এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, প্রাথমিক শিক্ষা একজন শিশুর প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থার ভূমিকা ঠিক করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি, সম্ভাবনা ও উন্নতির পথ বাতলে দেয়। পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য এ বিষয়টি আরও বেশি মাত্রায় প্রযোজ্য। কেননা,একমাত্র শিক্ষাই তাদের জন্য উন্নততর সুযোগ সৃষ্টি ও জীবনে অধিকতর পূর্ণতা দিতে পারে। একই সঙ্গে শিক্ষা সমাজে তাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে কাজ করে।

সকলের জন্য গুণগত শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাবাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে হবে লক্ষ্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম ও উদ্যোগের মাধ্যমে। 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' এসডিজির এই চেতনার মূল কথা হলো যেসব শিশুর পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে এবং যারা এরই মধ্যে শিক্ষার বাইরে অবস্থান করছে, তাদের জন্য গুণগত শিক্ষা সরবরাহ করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদ বৈষম্য সর্বজনীন মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আজকেরবাংলাদেশের প্রাসঙ্গিকতায় একটি বড় প্রতিবন্ধকহিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিভিন্ন প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, দুর্গম এলাকা এবং ভৌগোলিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত এলাকার শিশুরা অন্যান্য এলাকার শিশুদের তুলনায় শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক কম সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ইতিবৃত্তিমূলক নথিতে (ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এমন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে - ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, চা বাগানের শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী/ সুইপার (দলিত সম্প্রদায়ের সদস্য), ভূমিহীন কৃষক, ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী (হিজড়া), পেশাদার যৌনকর্মী, পরিবেশের শিকার উদ্বাস্তু, ঐতিহ্যগত জেলে জনগোষ্ঠী, কারিগর সম্প্রদায়, দুরারোগ্য দরিদ্ররোগী, গ্রামীণ অভাবগ্রস্তজনগোষ্ঠী, নারী, গৃহহীন ও বেকার জনগোষ্ঠী এবং তাদের পরিবার, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার শিকার জনগোষ্ঠী এবং চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান এলাকা ও নগরের বস্তি এলাকার নারীপ্রধান খানাসমূহ। এ সত্য অস্বীকার করা সুযোগ নেই যে, এসব জনগোষ্ঠীর শিশুরা

অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও অগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুদের তুলনায় অনেক বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি উদ্বেগের বিষয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, অসমতা, ভঙ্গুরতা ও শিক্ষা থেকে বিযুক্তি প্রায়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যদিও সরকার মানসম্মত শিক্ষায় অভিগম্যতা বাড়ানোর বিষয়ে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে নানা ধরনের কাঠামোগত জটিলতা রয়েছে, যেগুলো সরকারের এই প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিতকরছে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসা এই বৈষম্য দীর্ঘস্থায়ী রূপ পাচ্ছে। সে কারণে গুণগত প্রাথমিক শিক্ষায় এলএনওবি জনগোষ্ঠীর শিশুদের অভিগম্যতা বাড়াতে এই বিশেষ অসুবিধা মোকাবিলায় উদ্যোগ নিতে হবে।

যথোপযুক্ত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিতকরণ ও সেগুলোর প্রতিকার করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো, শিক্ষায় অধিকতর অভিগম্যতা এবং গুণগত শিক্ষায় সমান সুযোগ সৃষ্টি কেবল একটি প্রগতিশীল ও ন্যায়পরায়ণ সমাজকেই প্রতিফলিত করে না, বরং এটি এ ধরনেরএকটি সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকেও চালিত করে। গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উদ্দীপিতকরে, অসমতা হ্রাসে ভূমিকা রাখে এবং প্রত্যেক শিশুকে তার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর সুযোগ নিশ্চিত করে।

শিক্ষার অভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বলতে ওইসব ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে, যেসবশিশুরা গুণগত শিক্ষায় অভিগম্যতা পাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়তি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। যেসব কারণে এমন চ্যালেঞ্জের উদ্ভব ঘটে, তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষাবিষয়ক উপকরণে অভিগম্যতার স্বল্পতা, শিক্ষাবান্ধব নয় এমন অবকাঠামো, বৈষম্যের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, যা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহীদের পরিপূর্ণভাবে ও সমতার ভিত্তিতে শিক্ষায় অংশগ্রহণের সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এর সবগুলোই শিশুদের নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এমনকি যেসব সুযোগের অভিলভ্যতা রয়েছে, সেগুলো গ্রহণেও তাদের সক্ষমতা কমে যায়।

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া শিশুদের বেশকিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান

গ্রামীণ ও দুর্গম অঞ্চলের জন সম্প্রদায়: অপর্যাপ্ত শিক্ষা অবকাঠামো, বিদ্যালয় থেকে দূরত্ব বেশি হওয়া, পরিবহনের অভাবএবং সামাজিক নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও আচারের কারণে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার শিশুরা প্রায়ই গুণগত শিক্ষা গ্রহণে খুবই সীমিত সুযোগ পায়।

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু: সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিশুরা নানা ধরনের বৈষম্য, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতারও সম্মুখীন হয়। যেসব শিশুর মাতৃভাষা বাংলা নয় এবং যারা তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যবই পড়ারসুযোগ পায় না, সেসব শিশু খুব কম বয়স থেকেই সুবিধাবঞ্চিত থেকে যায়।

পথশিশু ও শিশু-শ্রমিক: নগর ও উপশহর অঞ্চলের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারের শিশু এবং সড়কে অবস্থানকারী শিশুরা এবংঅস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনকপরিবেশে কাজ করা শিশুরা অনুকূল পরিবেশ, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, জীবিকা সংগ্রহের চাপ ও পারিবারিক সহায়তার অভাবের কারণে প্রায়ই আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রতিবন্ধী শিশু: শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ঘাটতির কারণে শিক্ষায় অভিগম্যতা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুরা বাড়তি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। মানসিক প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুরা তাদের উপযোগী বিশেষায়িত বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সুযোগ পায় না।

তরুণ ও কিশোরী: সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশে এখনো জেন্ডার বৈষম্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে কিশোরও তরুণী মেয়েঅনেক সময় বাল্যবিবাহের শিকার হয়। ওই বয়সেই তাদের সংসারের দায়িত্ব নিতে হয় এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কমে যায়।

জলবায়ু-উপদ্রুত শিশু: বাংলাদেশ খুব ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে। এসব দুর্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়।

নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশু: আর্থিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার আর্থিক সংগতি থাকে না। এর ফলে তারা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে এবং শ্রমবাজারে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। এতে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হার অনেক বেড়ে যায়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জিম্মায় থাকা শিশু: এতিমখানা ও একই ধরনের প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী শিশুদের যে ধরনের স্নেহ, সমর্থন ও পরিচর্যা প্রয়োজন হয়, তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এর ফলে তারা যথাযথ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

কোভিডের নেতিবাচক পদচিহ্ন: বাংলাদেশের শিশুরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ছিল, কোভিড অতিমারির কারণে সাম্প্রতিক অতীতে তা আরও বেশি জোরালো হয়েছে। অতিমারির সময়কালে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় এলএনওবি গোষ্ঠীর অনেক শিশু পিছিয়ে পড়েছে। যখন স্কুল বন্ধ ছিল, তখন তারা শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর বাংলাদেশ সেসব দেশের মধ্যে অন্যতম, যেখানে অতিমারির কারণে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে অর্থাৎ ১৮ মাস স্কুলে পাঠদান বন্ধ ছিল। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুরা এক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি মাত্রায় দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল। কারণ তাদের বৃহদংশেরই ভার্চুয়াল মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। ওই সময়ে তাদের অনেকেই শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে এবং শ্রমবাজারে যোগ দেয়। অন্যদিকে মেয়ে শিশুদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। লিঙ্গ সহিংসতা বৃদ্ধি পায় উদ্বেগজনক হারে। কোভিডের প্রতিক্রিয়া কমে আসার পর যখন পুনরায় বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়, তখন নতুন শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা আয়ত্তের সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এর ফলে আরও অতিরিক্ত সংখ্যকশিশু শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, এ কথা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে, কোভিড শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি নেতিবাচক পদচিহ্ন রেখে গেছে। বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের সমগ্র প্রজন্মেরওপর এটি একটি মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে।

এনসিটিবির এক সমীক্ষায় দেখা যায়, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কোভিড-১৯-এর কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে। করোনার কারণে স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার পর পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষায় গড় শিখন ৩৬ শতাংশে নেমে আসে, করোনার আগে যা ছিল ৪৯ শতাংশ। বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ওই একই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গড় শিখন হারে অবনমন লক্ষ করা যায়। ২০১৯ সালে যেহার ছিল ৬৮.০ শতাংশ, তা২০২২ সালে ৫১.৬ শতাংশে নেমে আসে। তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতির মাত্রাও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনুরূপ ছিল।

মাতৃভাষার মাধ্যমে: বাংলাদেশের ভাষাতাত্ত্বিক চিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ। ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে দেশের সকল শিশুর জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু আদি নৃ-গোষ্ঠী (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদবি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনা মূল্যে অ-বাংলা ভাষায় রচিত বই বিতরণ শুরু করে। ২০১৭ সালে বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষা (এমএলই) কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু হলেও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে সাম্প্রতিক অতীতে ওইকার্যক্রম শ্লথ হয়ে গেছে।

পুষ্টি-সংক্রান্ত বঞ্চনা ও শিখন ফলাফল: সুবিধাবঞ্চিত ও এলএনওবি জনগোষ্ঠীর অনেক শিশু খালি পেটে স্কুলে যায়। এ বিষয়টি তাদের বেড়ে ওঠা, শিখন কার্যক্রম ও খেলাধুলার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এমন ক্ষুধার্ত

শিক্ষার্থীদের পক্ষে শ্রেণিকক্ষের পাঠে মনোযোগ ধরে রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। এতে করে তাদের শিখন ফলাফল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রান্তিক খানার শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার পরিবেশন (মিড-ডে মিল) আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দেয়। ২০২৩ সালের স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের এ উদ্যোগ পুনরায় চালু করা উচিত। সরকার সম্প্রতি দেশের দারিদ্র্যপ্রবণ ১৫০টি উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য দুপুরের খাবার পরিবেশন (স্কুল ফিডিং) পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি বাড়ানো ও ঝরে পড়া হ্রাসকরণ। দেশের সকল শিশুকে এই কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।

শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য সরকার শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী প্রত্যেক শিশুর জন্যতার মাকে মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে ১৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। তবে এ বৃত্তি পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে শিশুর ৮৫ শতাংশ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয়। পূর্বে এ বৃত্তির পরিমাণ ছিল মাসিক ১০০ টাকা, যা ১৮ বছর পর বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করা হয়েছে। তবে শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যয় বিবেচনায় এই বৃত্তি যৎসামান্য।

সাম্প্রতিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে শিক্ষা-সম্পর্কিত উপকরণের মূল্য অনেক বেড়েছে। নিম্ন ও নির্দিষ্ট আয়ের যেসব পরিবারে স্কুলগামী শিশু রয়েছে, শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ওইসব পরিবার বিরাট চাপের সম্মুখীন হচ্ছে।

২০২২ সালের শিক্ষা পর্যবেক্ষণ/এডুকেশন ওয়াচ সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, শিশুরা অতিমাত্রায় গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ের ৭৯ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করা ও পরীক্ষার জন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা গাইড অনুসরণ করে।২০২২ সালের প্রথম ৯ মাসে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী গড়ে গাইড বইয়ের পেছনে ব্যয় করে ৬৬৯ টাকা। সন্দেহাতীতভাবে এটি দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলোর ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। মূল্যস্ফীতির চাপের কারণে এসব পরিবার এরই মধ্যে বিশাল চাপে রয়েছে এবং এর পাশাপাশি তাদের ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা পূরণে দেশের শিশুদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তুত করেশিশুদের সেই অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যমান চাকরির বাজার ও কোভিড-১৯-পরবর্তী নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতির (নিউ নরমাল) বাস্তবতায় নতুনভাবে উদীয়মান প্রয়োজনসমূহ মেটানোর ক্ষেত্রে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা খুব বেশি কাজে আসবে না এবং এটি নতুন বাস্তবতায় প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও গুণগত শিক্ষা অর্জনে শিশুদের সহায়তা করতে একটি মিশ্র শিক্ষা কার্যক্রমের প্রচলন ঘটাতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বর্তমানে ১৩টি মন্ত্রণালয় ‘মিশ্র শিক্ষা ও দক্ষতা-বিষয়ক মহাপরিকল্পনাবাস্তবায়নে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাল পাঠ্য ও ই-শিখন উপকরণসমূহ সরবরাহ করছে। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা-সংক্রান্ত ভিডিওর উন্নয়ন ও ব্যবহার, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ামূলক মাল্টিমিডিয়া পাঠ্য এবং অনলাইন কোর্স। নিঃসন্দেহে এ উদ্যোগ প্রশংসারযোগ্য। যাহোক, এক্ষেত্রে বিলম্ব পরিহার করে আরও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

সম্প্রতি পাঠ্যক্রমের যে বিকাশ সাধিতহয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর আনন্দময় ও কার্যকর করে তোলা। এই শিক্ষা ধারণার লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, শ্রবণ ও বিশ্লেষণী সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সমস্যা সমাধানে দক্ষ করে তোলা। নতুন উদ্যোগের কল্যাণে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা কারিকুলামে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুসারে ২০২৩ সালে প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির জন্য নতুন কারিকুলাম চালু করা হয়েছে এবং ২০২৬ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের বাকি শ্রেণিগুলোয় নতুন পদ্ধতির শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। এ বিষয়টি সত্যি যে, নতুন পাঠ্যক্রমে সমষ্টিগত পদ্ধতির তুলনায় শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, যা ভালো উদ্যোগ। তবে দক্ষতাভিত্তিকএই কারিকুলাম বাস্তবায়ন করতে হলে

দক্ষ ও ভালোভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন পড়বে, যারা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান এবং বাস্তবভিত্তিক ও যৌক্তিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ। যদিও সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে, নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের পর্যাপ্ত মাত্রায় প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। বস্তুত নতুন শিক্ষা পদ্ধতির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে সুপ্রশিক্ষিত ও সুপ্রস্তুত শিক্ষাকর্মীর অভিলভ্যতার ওপর।

সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে কোনো শিশু যাতে পিছিয়ে না পড়ে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিখনের মাত্রা বিবেচনায় নেওয়া, পাঠদান-শিখনের গুণগত পদ্ধতির ওপর নজর দেওয়াএবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের যথাযথ মূল্যায়ন সম্পন্ন করার পাশাপাশি শিক্ষাসংক্রান্ত পাঠ্য ও উপকরণের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা।

উল্লিখিতসকল বিষয়ে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতাসমূহ এবং তার নৈতিকতা ও মূল্যবোধের মানদণ্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এসব বিষয় বাস্তবায়নে আরও যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তার মধ্যে রয়েছে, ডিজিটাল জ্ঞানেরব্যবহার, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগত অবকাঠামো এবং সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দকরণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়টিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতা পঞ্চম শ্রেণি থেকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা। ২০১০ সালের শিক্ষানীতি অনুসারে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার আওতা বাড়ানোর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা ছিল। কিন্তু সেই নীতি এখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

এখানে একটি হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের ক্রমহ্রাসমান ধারা। এ খাতে যে পরিমাণ বরাদ্দ দরকার তার চেয়ে অনেক কম বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট বাজেটের ১১.৬ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ১৪.৪ শতাংশের তুলনায় অনেক কম। জিডিপির শতকরা হার হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মাত্র ১.৬ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে জিডিপির ২.৫ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যেসব দেশে শিক্ষায় বরাদ্দ খুব কম, বাংলাদেশও সেই তালিকায় রয়েছে। এমনকি এই বরাদ্দ ইউনেসকোর সুপারিশের তুলনায়ও অনেক কম। ইউনেসকোর সুপারিশ অনুযায়ী, শিক্ষায় দেশের মোট জিডিপির ৪ থেকে ৬ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার কথা। শিক্ষা খাতে উচ্চহারে বরাদ্দ দেওয়া এখন সময়ের দাবি। একই সঙ্গে বরাদ্দকৃত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, জবাবদিহি ও দক্ষতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

শিক্ষা পর্যবেক্ষণ/এডুকেশন ওয়াচ সমীক্ষা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সূত্রে প্রাপ্ত দ্বৈতীয়িক (Secondary) উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তা নিচে বর্ণনা করা হলো:

শিক্ষার গুণগত মান: বাংলাদেশের অনেক স্কুল ও কলেজে শিক্ষার গুণগত মানের বিষয়টি প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরনো আমলের শিক্ষা পদ্ধতি, গুণমানসম্পন্ন শিক্ষকের ঘাটতি ও অপর্যাপ্ত শিক্ষা অবকাঠামোর কারণে শিখন অভিজ্ঞতার গড়পড়তা মানের চেয়েও খারাপ এবং এর থেকে প্রাপ্ত শিখনফল অন্তোষজনক।

শিক্ষায় অভিগম্যতা: সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হলেও বিশেষত পল্লি ও প্রত্যন্ত এলাকায় এখনো শিক্ষায় অভিগম্যতার বিষয়টি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। অনেক শিশু, বিশেষত মেয়েরাএখনো নানা কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, বিদ্যালয়ের দূরত্ব এবং সামাজিক

ও সাংস্কৃতিক নানা প্রথা। একটি বিদ্যালয়ে শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের যে ধরনের বিশেষ সেবার পরিবেশ থাকা দরকার, সেটি থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

উপচে পড়া শ্রেণিকক্ষ: শ্রেণিকক্ষে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর উপস্থিতির বিষয়টি খুবই সাধারণ একটি বিষয়, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এটির প্রবণতা বেশি। এর ফলে কার্যকরভাবে পাঠদান ও শিখন কার্যক্রম বিঘ্নিতহয়। ফলত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দিকেপৃথকভাবে নজর দেওয়া যায় না, যে বিষয়টি মানসম্মত শিখনফল পাওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যথাযথ পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের ঘাটতি: শিক্ষা কারিকুলাম যেভাবে হওয়াপ্রয়োজন, পাঠদানের মান সেই পর্যায়ের নয়। এটি একটি উদ্বেগের কারণ। আবার অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমে এমন কিছু বিষয়ও থাকে, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরবর্তী ধাপ এবং গ্রামীণ ধারার/পরিসরের শিক্ষার্থীদের প্রকৃত চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়।

শিক্ষক ও তাদের প্রশিক্ষণের গুণমানের দুর্বলতা: শিক্ষকদের গুণমানের নানা ক্ষেত্রে রয়েছে পার্থক্য । অনেক শিক্ষক যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন নন এবং তাদের উপযুক্তপ্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। এ বিষয়টির বিরূপ প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের গৃহীত সামগ্রিক শিক্ষার মানের ওপর।

পরীক্ষাকেন্দ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা: পরীক্ষাকেন্দ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করে। পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য প্রায়ই শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি শিক্ষা ও পাঠ্যবিষয় মুখস্থ করার বিষয়ে জোর দেওয়া ও উৎসাহিত করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের স্বাধীন/সমালোচনামূলক চিন্তা (critical thinking) করার সক্ষমতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে এবং তাদের অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগিক ব্যবহারও বিঘ্নিতহয়।

লিঙ্গ/জেন্ডার বৈষম্য: শিক্ষায় লিঙ্গ সমতায় অগ্রগতি সাধনে নানা প্রচেষ্টা নেওয়া সত্ত্বেও এখনো লিঙ্গ/জেন্ডার বৈষম্য রয়েছে, বিশেষ করে লী পল্লি অঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথার কারণে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণে সীমিত অভিগম্যতার সুযোগ পায়। আর যেসব মেয়ে-শিশুর বিশেষ ধরনের সেবা ও মনোযোগ প্রয়োজন হয়, তারা সেক্ষেত্রে দ্বিগুণ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

দুর্বল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা: ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুথিগত বা একাডেমিক শিক্ষাকেন্দ্রিক এবং এখানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সবসময়ই কম হস্তক্ষেপ করা হয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একদম প্রাথমিক পর্যায় থেকে প্রায়োগিক/বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলনে আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। এতে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অবকাঠামো ও অপর্যাপ্ত সম্পদ: বাংলাদেশের অনেক বিদ্যালয়ে সুষ্ঠুঅবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। এমনকি সেগুলোয় পরিচ্ছন্ন পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও বিদ্যুতের মৌলিক সুবিধাদিরও ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণের মতো শিক্ষা সরঞ্জামের স্বল্পতাওভাবনার বিষয়।

অনুকূল পরিবেশের ঘাটতি: একটি শিক্ষা ব্যবস্থা ভালোভাবে পরিচালনারজন্য অনুকূল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ আবশ্যক। কখনো স্থানীয় নানা ঘটনা এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিতও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান শিখন সময় ব্যাহত হয়। এর ফলে শিখন ফলেরমান হ্রাস পায়।

মুখস্থনির্ভর শিক্ষা বনাম সমস্যা সমাধানভিত্তিক শিক্ষা: মুখস্থ ও আবৃত্তিনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার বিকাশ, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার বিষয়টি কম গুরুত্ব পায়। এতেশিশুদের চেতনায় সারা জীবনের জন্যএকটি নেতিবাচক ছাপ থেকে যায়।

চাকরি-বাজারের সঙ্গে অসংগতি: দক্ষতা অর্জনের নিরিখে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান চাকরির বাজার ও এরভবিষ্যৎ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে সাজানো হয়নি। এ ধরনের ব্যবস্থা শিক্ষা গ্রহণকারীদের নিয়োজনের বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং নিয়োগকর্তার প্রত্যাশা ও চাকরি অনুসন্ধানকারীদের দক্ষতার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

উপরিউক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য একটি সুসমন্বিত ও সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রচেষ্টার মধ্যে থাকতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণে উপযুক্ত নীতিমালাও কর্মসূচি বাস্তবায়ন; যেসব পরিবারের অভাব-অনটন রয়েছে, তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান; নিরাপদ ও অভিগম্যতাসম্পন্ন শিখন পরিবেশ সৃষ্টিকরণ এবং সকল শিশুর জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার গুরুত্বের বিষয়ে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা।উদীয়মান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি সংস্থা, শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় সম্প্রদায় ও অন্যান্য বেসরকারি অনুঘটকের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ওপর। এ বিষয়ে এরই মধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আরও অনেক পদক্ষেপ নেওয়া এখনো বাকি। টেকসই উপায়ে এ ধরনের প্রচেষ্টাসমূহ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

এসডিজি ৪ অর্জন ও শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাপূরণে নিচেনীতিনির্ধারকদের জন্য কিছু সুপারিশ ও মৌলিক কার্যক্রম তুলে ধরা হলো। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া ও দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের বিষয়টিকে মনোযোগের কেন্দ্রে স্থাপন করে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে এসব পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. সুপারিশমালা

শিখন ঘাটতি মোকাবিলায় প্রতিকারমূলক পদক্ষেপসমূহ অব্যহত রাখা

- শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ এবং শিখন ক্ষতির মাত্রা পরিমাপ করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- মূল্যায়ন ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- যেসব শিক্ষার্থী তাদের পাঠসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারে না বা সাধারণভাবে যারা শিখন কার্যক্রমে দুর্বল, তাদের চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট গ্রেডের পাঠ্যসূচির সঙ্গে তাদের খাপ খাওয়ানোর জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক কোচিং ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।
- শিশুদের মানসিক কল্যাণ নিশ্চিত করতেতাদের জন্য মনঃসামাজিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গুণমানসম্পন্ন পাঠ্যক্রম, যথোপযুক্ত পাঠদান পদ্ধতি ও যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীসহ সকল শিশুর জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

- প্রকল্পভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক কার্যক্রম, হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রকৃতজাগতিক সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অর্জনভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার ঘটাতে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- উচ্চতর স্তরের শিক্ষায়শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা ও শিখন অভিজ্ঞতার মাত্রা বাড়াতে শিক্ষা কার্যক্রমে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ও শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ঘটাতে হবে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার আয়ত্ত করতে পারে।

- শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির সমন্বিত মূল্যায়ন কার্যক্রমের প্রচলন ঘটাতে কাঠামোবদ্ধ মূল্যায়নসহ (কুইজ, শ্রেণিকক্ষে আলোচনা, নিবিড়মূল্যায়ন) নানামুখী মূল্যায়ন কার্যক্রম পারিচালনা করতে হবে এবং সমষ্টিগত মূল্যায়নভিত্তিক (প্রকল্প প্রণয়ন ও উপস্থাপনা তৈরি) শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা উন্নয়ন ও দল গঠন সামর্থ্য শক্তিশালী করতে সকল বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে, কার্যক্রমগুলো যেন অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ কোনো শিশু যেন সেখান থেকে বাদ না পড়ে, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুরা।

যোগাতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের পেশাগত দক্ষতা নিশ্চিতকরণেপদক্ষেপ গ্রহণ

- শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে। যোগ্য স্নাতকদের এমনভাবে প্রণোদিত করতে হবে, যাতে তারা শিক্ষাকতা পেশা বেছে নিতে আগ্রহী হন। শিক্ষকদের জন্য যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণেরব্যবস্থা করতে হবে। অনতিবিলম্বে ২০২০ সালের শিক্ষানীতি অনুসারে কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটি শিক্ষক নিয়োগ।

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় থেকে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কারিকুলামপ্রণয়নে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন উপাদানের পাশাপাশি শিশুর বিকাশ ও মনস্তত্ত্ব, মিথস্ক্রিয়ামূলক শিখন, সামাজিক আবেগনিষ্ঠ শিখন, মূল্যায়ন কৌশল, মিশ্র শিক্ষা কার্যক্রমের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং তাদের মানসিক কল্যাণ সাধনের বিষয়টি পূরণের লক্ষ্যে শিশুদের মনঃসামাজিক বিষয়ে প্রাথমিক সহায়তাদানে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।

- শিক্ষকরা যাতে তাদের শিখন-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়করতে পারেন, সেজন্য ‘শিক্ষক বাতায়ন’ এগিয়ে নিতে হবে।

- সকল শিক্ষার্থী যাতে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকসহ ভালো মানের শিক্ষক অর্থাৎযেসব শিক্ষকের শিক্ষকতা-জীবনের রেকর্ড অনেক ভালো, তাদের মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেসব শিখন পদ্ধতি সর্বোত্তম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্যও মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষায় অভিগম্যতার ঘাটতি থেকে উদ্ভূত অসমতাসমূহ হ্রাসকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ

- শিখন ফলেরযথাযথ পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিচ্ছিন্ন উপাত্ত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

- সকল শিক্ষার্থী জন্য বৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে, যাতে বৃত্তির অর্থে তাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয় সংকুলান হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিমাসে এই বৃত্তির পরিমাণ হওয়া উচিত ন্যূনতম ৫০০ টাকা।

- চর, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলের মতো দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়সমূহে আবাসন সুবিধা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- ঝরে পড়া শিশুদের (যেমন, বাল্যবিবাহে ক্ষতিগ্রস্ত ও শ্রমে নিয়োজিত শিশু) পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের প্রণোদনামূলক কর্মসূচি চালু করতে হবে।

- দেরিতে শিখতে পারে এমন ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক কোচিং চালু করতে হবে।সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের শিশু এবং প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে তাদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

- সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য শিক্ষকেরসক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

- যেসব এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যক্রমের বিকাশ সাধন হয়েছে, সেসব এলাকায় বহু-ভাষাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম (এমএলই) বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে।

- 'জাতীয় আহার নীতি ২০১৯' অনুসারে স্কুলে মিড-ডে মিল কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে হবে। মিড-ডে মিল পুনরায় চালু করা সরকারের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে শিক্ষার্থীদের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর পাশাপাশি চর, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও বিদ্যালয়কে এ সুবিধার আওতায় আনতে হবে।

শিক্ষায় প্রযুক্তি ও মিশ্র পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগ ঘটাতে হবে

- শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিকল্পনায় মিশ্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানোর বিষয়ে জোর দিতে হবে, যাতে করে কার্যকরভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে অন্যান্য আধুনিক উপকরণের সংযোগ ঘটাতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের স্বপ্রণোদিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

- মিশ্র শিক্ষা গ্রহণে দক্ষ করে তুলতে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য ডিজিটাল ডিভাইসে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকেঅনলাইন শিখন প্ল্যাটফর্ম, ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষ ও ওয়েবিনার, ই-বুক ও ডিজিটাল লাইব্রেরি, মোবাইল শিখন প্রভৃতি সুযোগের আওতাভুক্ত করতে হবে।

- শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রচলন ঘটাতে হবে। তাদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে তারা পাঠদান কার্যক্রমে যথাযথভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষা কার্যক্রমে অভিভাবক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব যুক্ত করতে হবে

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সংশ্লিষ্ট কর্তব্যের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপীপ্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে।

- সকল বিদ্যালয়ে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতিকে (পিটিএ) শক্তিশালী করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী/আদিবাসী প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি থাকে। কমিটিতে অধিকসংখ্যক নারী/মা প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং পিটিএতে কমপক্ষে একজন স্থানীয় বিশিষ্ট এনজিও প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নিয়মিত ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

- শিক্ষার মানোন্নয়নে 'সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা'র আলোকেজাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সংগঠন/প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ নেয়া উচিত।

শিক্ষায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান ও শিক্ষা আইন উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

২০১০ সালের শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতেমোট বাজেটের মধ্যে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ কমপক্ষে ১৫ শতাংশে উন্নীত করেএবং পর্যায়ক্রমে এ বরাদ্দ ২০২৬ সাল নাগাদ ২০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

- নতুন পাঠ্যক্রমের চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত করে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

- শিক্ষকদের মাসিক বেতন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা বাড়াতে হবে, যাতে সপ্রতিভ ও মেধাবী গ্র্যাজুয়েটরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে আগ্রহী হন।

- সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি/অনুদান/আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তাদের শিক্ষা ব্যয়ের চাপ কমে আসে এবং বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ও শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের সংস্থান হয়।

- প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল পঞ্চম শ্রেণি থেকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার একটি সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

- একটি বিকেন্দ্রীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে হবে এবং শিক্ষা বাজেটের দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেজবাবদিহি ও পরিবীক্ষণ কৌশল শক্তিশালী করতে হবে। একই সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনের জন্য শিক্ষা বাজেটের অর্থের যথাযথ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে।

- ২০১০ সালের শিক্ষানীতির সঙ্গে সংগতি রেখে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রস্তুত ও প্রণয়ন করতে হবে এবং আইন বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরতে হবে।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগত মান নিশ্চিতকরণের বিষয় এমন একটি জরুরি বিষয় হিসেবে সামনে এসেছে,যা সম্পন্ন করতে জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগ প্রদান ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য একটি অবশ্য করণীয় বিষয়ে রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশের টেকসই দ্বৈত উত্তরণ (গ্র্যাজুয়েশন) পর্যাপ্ত মাত্রায় দক্ষ মানবসম্পদের ওপর নির্ভর করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তর হওয়া এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে দেশের যে আকাঙ্ক্ষারয়েছে, তা বাস্তবায়নে গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টিকে অবশ্যই মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে গুণগত শিক্ষায় সকল শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কোনো শিশুকেইপেছনে ফেলে রাখা যাবে না। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু ও স্থানিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের চাহিদাগুলোকে এই প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি বাস্তবায়ন করতে হলে সরকার, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং উন্নয়ন সহযোগীসহ সকল অংশীজনের তরফ থেকে সমন্বিত ও লক্ষ্যনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে।

এই নীতি বিবৃতিতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতে যে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলো মোকাবিলার গুরুত্বসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। কারিকুলামের পাঠ্য ও পথনকশা প্রণয়ন, মানসম্পন্ন শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিখনের কার্যকারিতা, পুষ্টি-সংক্রান্ত দৃশ্যপটের উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, অন্তর্ভুক্তিতার বিষয়াদি, মূল্যায়নের যথাযথ উপকরণ এবং গুণগত পাঠদান ও অভিগম্যতা বাড়াতে ডিজিটাল উপকরণসমূহ সংযুক্ত করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বিষয়ে এ বিবৃতিতে বেশকিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে। এই নীতি বিবৃতিতে যুক্তিসংগতভাবে দেখানো হয়েছে যে, আজকের শিশুরা আগামী দিনের চাকরির বাজারের চাহিদা পূরণে কতটা সক্ষম হবে, তা নির্ভর করছে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরি হওয়া শিক্ষা কার্যক্রমের ভিত্তির ওপর। শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করার বিষয়ে সরকারকে অবশ্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রদান, লক্ষ্যনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের দক্ষতা এবং অর্জিত ফলাফলের দক্ষতাভিত্তিক সরবরাহের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে। জনমিতিক লভ্যাংশের সংকীর্ণ জানালা থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো তখনই কাজে লাগানো সম্ভব হবে, যদি আজকের শিশুরা প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতায় সমৃদ্ধ হয়। সেই শিশুরাইবাংলাদেশকে টেকসই ও উচ্চ গতির উন্নয়নের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হবে।

৬

গুণগত স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন অভিগম্যতার উন্নয়ন সাধনে সেবাগ্রহীতার দৈনন্দিন খরচ বহির্ভূত ব্যয় (আউট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার) হ্রাসকরণ

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

ড. মুশতাক রাজা চৌধুরী
কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
আহ্বায়ক, বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ
এবং
সাবেক ভাইস চেয়ারপারসন, ব্র্যাক

পেনহোল্ডার

ড. ইয়াসমিন আহমেদ
উপদেষ্টা
বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ডা. দিবালোক সিংহ
নির্বাহী পরিচালক
দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)

অধ্যাপক হাসনাত এম আলমগীর
পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং
সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি

ডা. লিমা রহমান
পরিচালক, স্বাস্থ্য পুষ্টি ও এইচআইভি/এইডস সেক্টর
সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ

রফিকুল ইসলাম
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
সাইটসেভার্স বাংলাদেশ

অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহাবুব
চেয়ারম্যান, স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের জাতীয় কমিটি
এবং সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল
অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ)

ড. সাবিনা এফ রশিদ
অধ্যাপক, মুশতাক চৌধুরী চেয়ার ইন হেলথ অ্যান্ড
পভার্টি
ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ

ড. সোহানা শফিক
প্রধান, ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ এন্ড আরবান
হেলথ, আইসিডিডিআর,বি

ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ
অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইন্সটিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

বিগত পাঁচ দশকে স্বাস্থ্যসেবার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ সময়ের ব্যবধানে মাতৃমৃত্যুর হার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে; এক বছরের কম বয়সী ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৪৪ শতাংশ ও ৩৫ শতাংশ; বাংলাদেশের মোট প্রজনন হার (TFR) বর্তমানে প্রায় প্রতিস্থাপন পর্যায়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে যাসর্বনিম্ন (শ্রীলঙ্কা ব্যতীত)। বেশকিছু রোগ হয় বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, নতুবা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এমন রোগের মধ্যে রয়েছে গুটিবসন্ত, ম্যালেরিয়া ও ডায়রিয়া; ৩৬ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে অন্ধত্ব। সরকারি খাতে পুষ্টি-সংক্রান্ত কার্যক্রম মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করা, কৃষি উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতার প্রসার এবং এক্ষেত্রে সহায়ক নীতির ফলে শিশুদের মধ্যে কৃশতার হার অর্ধেকে নেমে এসেছে। এছাড়া শিশুর খর্বতা ও কম ওজনের উপস্থিতিও কিছু কমে এসেছে। এর আগে এমডিজিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে অগ্রগতি অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশ বেশকিছু স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লিখিত অর্জনগুলোর পেছনে বেশকিছু উপাদান অবদান রেখেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে সময়ানুগ নীতি প্রণয়ন, বিভিন্ন বিষয়ের সাশ্রয়ীসমাধান, ব্যাপকভিত্তিক ও উদ্ভাবনী জনস্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্যোগ, সেবাদান সরবরাহ কার্যক্রমে এনজিও'কে যুক্তকরণ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসেবায় বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ। যাহোক, এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্য খাতের মৌলিক কিছু বিষয়ে সহজেইফল অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তবেবাংলাদেশ এখনো গুণগত স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ-সংক্রান্ত শেষ ধাপের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার সম্মুখীন।

স্বাস্থ্য খাতে সাফল্যের শেষ ধাপে উপনীত হওয়া ও গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অনেকটা পর্বতারোহণের মতোই দুরূহ কাজ। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য খাতে অভ্যন্তরীণ নানা চ্যালেঞ্জ ও ইস্যু রয়েছে। এটি একপ্রকার বাস্তুতন্ত্রের মতো, যা স্বাস্থ্য খাতকে চালিত করে। বর্তমানে এই বাস্তুতন্ত্রে নানা উদ্বেগজনক বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। এ খাতটি বেশকিছু জটিল সমস্যায় নিমজ্জিত। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে সুশাসন ও ন্যায্যতার ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ও অসাম্যের বিস্তার, ১৮ শতাংশের ওপরে দারিদ্র্য বিদ্যমান থাকা এবং কোভিড অতিমারি ও ইউক্রেন যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপ।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি বহুধাভিত্তিক ও খণ্ডিতব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেবা এবং একটি গ্রামীণ ও শহুরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পাশাপাশি অবস্থান করছে। আর এক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সুনির্দিষ্ট জবাবদিহির কাঠামো নেই। বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবার যে কাঠামো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেটি এমন সময় বিকাশ লাভ করেছিল যখন দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল গ্রামের অধিবাসী, সাক্ষরতার হার ছিল অনেক কম এবং আর্থিক সক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। এমন পরিস্থিতিতে একটি বহুস্তরবিশিষ্ট গ্রামভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো গড়ে উঠেছিল, যে ব্যবস্থায় মানুষের দোরগোড়ায় নানা সেবা ও স্বাস্থ্যতথ্য পৌঁছে দেওয়া হতো। যাহোক সময় বদলেছে, এখন এসডিজি (অভীষ্ট ৩) ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের একটি উন্নত দেশের তালিকাভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে একটি সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা (ইউএইচসি) প্রচলনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ইউএইচসির স্বপ্ন হচ্ছে সকল মানুষের জন্য তাদের প্রয়োজনানুসারে পূর্ণ মাত্রায় গুণগত স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ যখন যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো স্থানে স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন হলে কোনো ধরনের আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। তবে এক্ষেত্রে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে দ্রুততার সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শহরে স্থানান্তর, রোগের ধরন বদলে যাওয়া, চাহিদা ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের পাশাপাশি আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে রোগী/সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশা ও চাহিদার পরিবর্তন হওয়া, প্রাথমিকভাবে মুনাফাকেন্দ্রিক বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার বিকাশ এবং অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, জলবায়ুগত ও ভৌগোলিক বিষয়সমূহ। এসব বিষয় ক্রমবর্ধমান হারে নানা চ্যালেঞ্জের

জন্ম দিচ্ছে, যা স্বাস্থ্য খাতের বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে ইউএইচসির বাস্তবায়নকে কঠিন করে তুলেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার যে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, সময়ের বিবেচনায়ও সেটি অর্জনে বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে, কেননা এক্ষেত্রে যে সময়সীমা রয়েছে তা খুব বেশি নয়। এর বাইরে সম্পদের অপ্রতুলতাসহ বিদ্যমান নানা ধরনের জটিলতার সমাধান করা আবশ্যক। ফলে এক্ষেত্রে কঠিন কিছু বাছাই কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব মানুষ সবচেয়ে বেশিদুর্দশাগ্রস্ত, তাদের দুর্ভোগকে লক্ষকরে কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, সংশ্লিষ্ট রচনাবলি পর্যালোচনা ও বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে এই নীতি বিবৃতি প্রস্তুত করা হয়েছে। এটির উদ্দেশ্য হলো - স্বাস্থ্য খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা এবং এ-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা। এসডিজি ৩-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশে একটি সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই বিবৃতিতে একগুচ্ছ সুসংহত প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের ক্ষেত্রে বর্তমানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু প্রধান বাধা হিসেবেচিহ্নিত: একটি হচ্ছে সেবাগ্রহীতার নিজস্ব ব্যয় (আউট অব পকেট - ওওপি) এবং অন্যটি হচ্ছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করা।

বাংলাদেশে মোট স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের (টিএইচই) বড় অংশই সেবাগ্রহীতাকে নিজস্ব উৎস থেকে নির্বাহ করতে হয়। এ ব্যয় বেড়েই চলেছে। ১৯৯৭ সালে রোগীর নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় ছিল ৫৫ শতাংশ। বর্তমানে এটি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭ শতাংশ হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জাতীয় স্বাস্থ্য হিসাব তথ্যভাণ্ডার সূত্র অনুসারে, ওওপি একটি খানার সরাসরি ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ব্যয়ের মধ্যে বিভিন্ন আনুতোষিকও উপহার-স্বাস্থ্যসেবা অনুষঙ্গী সামগ্রীও অন্তর্ভুক্ত হবে। যেসব খাতে এ ব্যয়ের অর্থ বণ্টিত হয়, সেগুলো হচ্ছে চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও ওষুধ কোম্পানির বিভিন্ন সরবরাহ বাবদ মূল্য পরিশোধ, শারীরিক সেবা (থেরাপি) সংক্রান্ত বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় এবং অন্যান্য পণ্য ও সেবাবাবদ ব্যয়। এসব ব্যয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের অবস্থা পুনরুদ্ধার বা স্বাস্থ্যগত উন্নতি সাধনে অবদান রাখা। সাধরণত ওপিপি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যয়ের অংশ। এই বিষয়টি বিবেচনায় বাংলাদেশের ওপিপিকে যদি বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় এটি অনেক বেশি এবং সেটি বাংলাদেশের জন্য বেশ অস্বস্তিকর। বাংলাদেশের ওপিপি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং বৈশ্বিক গড় ৩২ শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি।

বাংলাদেশে ওপিপি ব্যয়ের বড় অংশই যায় ওষুধের পেছনে (৬৪ শতাংশ)। এর পরের অবস্থানে রয়েছে হাসপাতালের সেবা-সংক্রান্ত ব্যয় (১৪ শতাংশ) এবং এর পরের অবস্থানে রয়েছে রোগ নির্ণয়-সংক্রান্ত ব্যয় (৮ শতাংশ)। উল্লেখযোগ্যভাবে এই বিশাল ব্যয় দেশের ৯ শতাংশ খানার ওপর বাড়তি চাপ ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ ব্যয় সবচেয়ে ধনিক গোষ্ঠীর খানার ব্যয়ের তুলনায় চার গুণ বেশি। এই দৃশ্যকল্পটি গত তিন দশকে দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্যকে কিছুটা হলেও ভিন্নভাবে প্রকাশ করে। স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যয় যদি স্বাস্থ্যব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয় যা সাধারণত জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, তাহলে স্বাস্থ্যসেবায় প্রকৃত ওপিপির পরিমাণ আরও অনেক বেশি হবে। স্বাস্থ্যসেবার জন্য এরও অতিরিক্ত যেসব খাতে অর্থ ব্যয় হয়, তার মধ্যে রয়েছে রোগী ও তার সহযোগীদের পরিবহন, আবাসন, যোগাযোগ, খাবার ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে, ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায়, ওই সময় ৪.৫ শতাংশ (৮.৬১ মিলিয়ন) মানুষ স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত ব্যয় মেটাতে গিয়ে দারিদ্র্যের কবলে পড়েছেন (সায়েম আহমেদ, ইন্টারন্যাশনাল হেলথ, ভলিউম ১৪, ইস্যু ১, জানুয়ারি ২০২২, পৃষ্ঠা ৮৪-৯৬)।

একটি বিষয় সুবিদিত যে, এসডিজি এজেন্ডার মৌলিক বিষয়বস্তু হচ্ছে ‘কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না’। এই ধারণার মোদ্দা কথা হচ্ছে একটি দেশের সঙ্গে অন্য দেশ এবং একটি দেশের অভ্যন্তরে কোনো বৈষম্য থাকবে না; অর্থাৎ ‘সমতা ও বৈষম্যহীনতার জন্য একটি সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধপূর্ণ ধরিত্রী প্রতিষ্ঠা’। এ লক্ষ্যে ‘কোনো

প্রকারের ভেদাভেদ ছাড়াই মানবাধিকারের বিষয়টির প্রতি সম্মান, এটির সুরক্ষা ও প্রসার ঘটাতে হবে।' কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ব্যতীত সমতা নিশ্চিত করার একটি মূল বিষয় হচ্ছে সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার অভিগম্যতা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান। এই পরিপ্রেক্ষিতে এসডিজি এজেন্ডা প্রান্তিক, দুর্দশাগ্রস্ত ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে তাদের প্রান্তিকতা, অসুবিধগ্রস্ততা ও বিচ্যুতির নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বিষয়ে আহ্বান জানাচ্ছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ(সিপিডি) ২০১৭ সালের এক সমীক্ষায় প্রান্তিকীকরণের ১৩টি বিষয় চিহ্নিত করে। এগুলো হচ্ছে - রোজগার, জেন্ডার, ভৌগোলিক অবস্থান, জীবনচক্র, নাগরিক পরিচিতি, অক্ষমতা, শিক্ষা ও দক্ষতা, স্বাস্থ্য, পেশা, ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গভিত্তিক পরিচিতি এবং অসুবিধাগ্রস্ততার সঙ্গে সম্পর্কিত অভিঘাত ('কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে' বিষয়টি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তর; এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ; সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ; ডিসেম্বর ২০১৭)।

উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহনিশ্চিতকরণেনারী ও শিশুদের সেবাদানের বিষয়টিকে জরুরি ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর পাশাপাশি আরও যেসব জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন, তাদের মধ্যে রয়েছেন দুর্গম ও জলবায়ু উপদ্রুত এলাকায় বসবাসকারী মানুষ (হাওর, চর ও উপকূলীয়অঞ্চল), আদিবাসী সম্প্রদায় (পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরতজনগোষ্ঠী, সাঁওতাল, গারোও চা বাগানের শ্রমিক), বস্তিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, মানসিক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধিতাসহ নানা প্রতিবন্ধিতার শিকার মানুষ, এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায় এবং ধর্মীয়ভাবে অচ্ছুত জনগোষ্ঠী (যেমন, দলিত)। এসব জনগোষ্ঠীর বাইরেও বাংলাদেশের শ্রমবাজারের বিদ্যমান কাঠামো ও কর্মপরিবেশের কারণে বিচ্যুতির শিকার হয়ে ক্রমবর্ধমানহারে বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে (তৈরি পোশাক কারখানা) এবং অনানুষ্ঠানিক (যেমন, গৃহকর্মী, রেস্তোরাঁর কর্মচারী, মোটরগাড়ির গ্যারেজের শ্রমিক, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কর্মী) কর্মরত নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীরা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকরা (যেমন: জাহাজ-ভাঙা শিল্পের শ্রমিক ও লেদ মেশিনের শ্রমিকরা)। এসব জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রয়োজনসমূহও মনোযোগের দাবি রাখে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ/ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনে সাম্প্রতিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

সেবাগ্রহীতার নিজস্ব ব্যয় (ওপিপি) হ্রাসকরণ ও কাউকে পেছনে ফেলে না রাখার নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশকিছু মৌলিক চ্যালেঞ্জ যথেষ্ট মাত্রায় সমাধান করতে হবে। নিচে এমন চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করা হলো:

ক. ওষুধের দাম ও প্রাপ্যতা

ওপিপি ব্যয়ের ৬৪ শতাংশই হচ্ছে ওষুধের খরচ ব্যয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ১৯৮২ সালের ওষুধনীতি বাংলাদেশের ঔষধের বাজারে নানাভাবে বেশকিছু শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ওই নীতিতে যেসব ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তার মধ্যে মানকয়েকটি হচ্ছে - জরুরি ওষুধের তালিকা উপস্থাপন, যৌগিক ওষুধ নিষিদ্ধকরণ এবং স্থানীয় উৎপাদন কার্যক্রমেপ্রণোদনা দান ও উৎসাহ প্রদান। তবে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে ২০০5 ও ২০১৬ সালের সংশোধনীতে এই নীতিটি অনেক বেশি মাত্রায় বাণিজ্যিক স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এসব সংশোধনীর মাধ্যমে ওষুধ নীতিতে যেসব বিষয় যুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জরুরি ওষুধের তালিকা থেকে অনেক ওষুধের নাম বাদ দিয়ে তালিকা ছোট করা, যৌগিক ওষুধের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট ওষুধের দাম ক্ষেত্রবিশেষে ১০ গুণ বেড়ে যাওয়া, ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিনিধির প্রবিধান যুক্ত করা এবং ১৯৮২ সালের নীতির ভিত্তিতে গৃহীত ওষুধের দাম নির্ধারণে বাজারভিত্তিক ফর্মুলার পরিবর্তে ওষুধের 'যৌক্তিক' খুচরা দাম নির্ধারণের বিষয়ে ওষুধ কোম্পানিকে ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। ২০২২ সালের জুনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (ডিজিডিএ) ৫৩টি জরুরি ওষুধের দাম

গড়ে। এর মধ্যে খুব বেশি হারে ব্যবহৃত দুটি ওষুধ প্যারাসিটামল ও মেট্রোনিডাজলের দাম বাড়ানো হয় প্রায় ৭০ শতাংশ। যদিও উন্নত কিছু দেশের বিচারে ওপিপির ক্ষেত্রে ওষুধের ওই উচ্চ ব্যয় তেমন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু ওষুধের এই ধরনের 'ওষুধের দাম যৌক্তিককরণের' প্রভাব বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসার প্রাপ্যতার ওপর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশে ওষুধের মোট চাহিদার ৯৭ শতাংশ পূরণ হয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উৎস থেকে। তবে ওষুধের ৯০ শতাংশ কাঁচামাল বা অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট (এপিআই) প্রধানত ভারত ও চীনের মতো দেশ থেকে আমদানি করা হয়। এপিআই'র ক্ষেত্রে আমদানিনির্ভরতার কারণে দেশে ওষুধের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং এর ফলে অনেক সময় সরবরাহের ক্ষেত্রে নানা অভিঘাতের উদ্ভব হয়, যেমনটি দেখা গিয়েছিল কোভিড অতিমারির সময়কালে। এক দশক আগে একটি এপিআই শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, কিন্তু এখনো সেগুলো উৎপাদনক্ষম হয়ে ওঠেনি। এই এপিআই শিল্প পার্ক যদি পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, তাহলে দেশের ওষুধশিল্পের মোট এপিআই চাহিদার অন্তত অর্ধেক চাহিদা সেখান থেকে মেটানো সম্ভব হবে। এর ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদন খরচ এবং ওষুধের খুচরা দামও কমে আসবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এপিআই পার্কটি উৎপাদনসক্ষমকরার বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিনা মূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হলেও এক্ষেত্রে ভোক্তাকে বেশকিছু প্রচ্ছন্ন ব্যয় বহন করতে হয়; যেমন: সেবাকেন্দ্রে আসার পরিবহণ ব্যয়, দৈনন্দিন মজুরির ক্ষতি ইত্যাদি। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি সেবাকেন্দ্রে ওষুধের প্রাপ্যতাবৃদ্ধি পেয়েছে, তা সত্ত্বেও নানা ধরনের অসমর্থিত সূত্রের তথ্য থেকে জানা যায়, মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ পার না হতেই সেখানে সরবরাহে টান পড়ে। ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা প্রভাব বিস্তার করে সরকারি সেবা ব্যবস্থা থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে বলে সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় মূল প্রাপকরা বঞ্চিত হয়।যেসব ওষুধ জরুরি ওষুধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়, সেগুলো বাইরে থেকে ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় সংগ্রহ করতে হয়। এই সুযোগে বেসরকারি ফার্মেসিগুলো ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত ওষুধ ও নিজস্ব কাউন্টারে (ওটিসি) ওষুধ বিক্রির মাধ্যমে দ্রুত সময়ে ব্যবসা করছে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয় অহরহ ঘটছে, তা হলো চিকিৎসক, ওষুধ কোম্পানি ও বেসরকারি রোগ নির্ণয়কেন্দ্রগুলোর যোগসাজশ। ওষুধের আগ্রাসী বিপণন বজায় রাখা বহুশ্রুত ঘটনা।

খ. দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত চাহিদাসমূহ

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে মোটামুটি পরিশীলিত ও বিস্তৃত মাত্রায় বহুস্তর বিশিষ্ট স্বাস্থ্য অবকাঠামো বিদ্যমান। এর বিপরীতে নগরাঞ্চলের স্বাস্থ্য অবকাঠামো চিত্র বেশ অসংগঠিত। নগরাঞ্চলে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের যে অবকাঠামো দেখা যায় তা হচ্ছে, এনজিও কর্তৃক পরিচালিত একটি সুশীল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক, যেটির প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেস্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। এছাড়া নগর অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কিছু ডাক্তারখানা আছে। নগর স্বাস্থ্যসেবায় যে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান, তা পূরণ হয় মূলত ফার্মাসি, বেসরকারি ক্লিনিক, রোগনির্ণয়কেন্দ্র ও হাসপাতাল এবং বেসরকারি চিকিৎসা-পেশাজীবীরমাধ্যমে। এই স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানে একটির সঙ্গে অন্যটির নানা মাত্রায় ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় এবং সেবা পেতে উচ্চমূল্য পরিশোধ করতে হয়। কিছু অনানুষ্ঠানিক সন্দেহভাজন সেবাদানকারী রয়েছেন, যাদের স্বাস্থ্যসেবা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তারাও নগরীর এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অংশ। এছাড়া ব্যবস্থাপত্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা চর্চার ওপর নজরদারি, তাদের জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বল।

বর্তমানে দুর্গম এলাকা ও জলবায়ু উপদ্রুত এলাকা বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ নগরাঞ্চলে বসবাস করেন। আর তাদের বসবাসের স্থান মূলত শহরের বস্তি, যা নগরের৩৫ শতাংশ মানুষের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। নানাবিধ কারণে এসব মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সেবা থেকে বঞ্চিত।এছাড়া

দুর্গম ও জলবায়ু উপদ্রুত এলাকা এবং আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যেমন : দলিত শ্রেণি, চা-শ্রমিক ও যাযাবর শ্রেণি (বেদে সম্প্রদায়ের মানুষ) যারা বিক্ষিপ্তভাবে দেশের নানা প্রান্তে বসবাস করেন, তাদের পক্ষে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে সেবা গ্রহণের বিষয়টি এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। তাদের সেবার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়শ তাদের নানাবিধ সামাজিক পরিস্থিতি ও সামাজিক অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়। এর বাইরে যারা শারীরিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আরও বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। দেশের স্বাস্থ্যসেবা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী বান্ধব নয়।

গ. প্রবিধান, জবাবদিহি ও শাসন পদ্ধতির ঘাটতি

স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ তদারকি এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন প্রয়োগের দায়িত্ব যেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছে, যথাযথ নেতৃত্ব ও প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে তারা সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই ব্যর্থতার বিরূপ প্রভাব বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতে দারুণভাবে প্রতিভাত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই রোগী ও তার স্বজনরা আর্থিক শোষণের শিকার হন, কোনো ধরনের জবাবদিহি না থাকায় প্রায়ই ভুল চিকিৎসার ঘটনা ঘটে, দেওয়া হয় অতি মাত্রায় ওষুধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরামর্শ । অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালগুলোয় দেখা যায়, সেখানকারচিকিৎসকরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সঙ্গে যুক্ত। ফলে তারা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্ব পালনে কম গুরুত্ব দিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ছুটতে থাকেন এবং রোগীদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পরামর্শ দেন। এর ফলে রোগীর চিকিৎসার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি নানা সমস্যায় পড়েন রোগী ও তার স্বজনরা। ডিজিএইচএস-এর ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত মাত্রায় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে বেসরকারি যেসব সেবার বিষয়ে লাইসেন্স প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। ১৯৮২ সালে মেডিকেল প্রাকটিসেস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ অর্ডিন্যান্স জারি করা হলেওওই অধ্যাদেশ আর পর্যালোচনা করা হয়নি। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে, তার বাস্তবতায় ওই অধ্যাদেশের অনেক বিধানই আজকাল আর কার্যকর নেই। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা নানা সময়ে স্বাস্থ্য খাতের জন্য অপূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা প্রদান করেছে। এসব নির্দেশনা স্বাস্থ্য খাতের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনের মানোন্নয়নে খুবই সীমিত অথবা কোনো প্রভাবই রাখতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই মুনাফা বাড়ানোর জন্য এসব সেবার কিছু অংশ হয়তো কর্তন করা হয়েছে অথবা গুণগত মানের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট সেবার মূল্য বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাসমূহ পরিপালন হয়নি এবং এ বিষয়ে কমিটি গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রবিধানমালা এখনো অনুসরণ করা হয়নি।

ঘ. যোগসাজশের সংস্কৃতি ও কুফল

একদিকে চিকিৎসক অন্যদিকে রোগ নির্ণয়কেন্দ্র, ওষুধ কোম্পানি ও হাসপাতালগুলোর মধ্যকার দুষ্টচক্র ভেঙে দেওয়া গেলে রোগ পরীক্ষা ও ওষুধ ক্রয়বাবদ রোগী ও স্বজনদের যে অর্থ ব্যয় হয়, তা হ্রাস করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সুফল পাওয়া যাবে। একজন চিকিৎসক কোনো ডায়াগনস্টিক স্টোরে রোগ পরীক্ষার জন্য রোগী পাঠানোর বিপরীতে যে কমিশন পান, তা মোট ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ব্যয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ। এই কমিশন (দস্তুরি?) যদি পরিশোধ করতে না হয়, তাহলে রোগ নির্ণয়ের খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। হাসপাতালে রেফার করা ও ওষুধের ব্যবস্থাপত্রের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য।

ঙ. মানসম্মত দক্ষতাও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাদির গুণমানে ঘাটতি

খুব কম সংখ্যক সরকারি সেবাকেন্দ্র পূর্ণ সক্ষমতা নিয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সেবাদানকারীর অভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সেবা সরবরাহ করতে পারছে না। এর পেছনে মূলত দায়ী সেবাকেন্দ্রের শূন্য পদ পূরণ না করা এবং চিকিৎসক ও সেবাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মীদের অনুপস্থিত থাকা।

এ সমস্যা আরও বেশি ঘনীভূত হয় যথোপযুক্ত সুবিধাদির অনুপস্থিতি ও সরঞ্জামের অভাব, পর্যাপ্ত মাত্রায় ও স্বচ্ছন্দ ওষুধ সরবরাহের কমতি এবং রোগীদের প্রতি সেবাদানকারীদের অসৌজন্যমূলক ও অসম্মানজনক আচরণের কারণে। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে সেবাকেন্দ্রে পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি ও দীর্ঘ অপেক্ষার জন্য সময় অপচয়। এসব কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরাসবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হন। ফলতসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ অনীহা প্রকাশ করেন।

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো কখনো কখনো সংকটাপন্ন রোগীদের ভর্তি করানো ও চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ এসব ক্ষেত্রে রোগীর কোনো অঘটন ঘটলে তার স্বজন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সম্ভাব্য হামলার ঝুঁকি থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রোগী অথবা কোনো প্রসূতি রোগীর যদি এক্লাম্পসিয়া (খিঁচুনি)অথবা রক্তক্ষরণের লক্ষণথাকে, তাহলে চিকিৎসকরা জরুরী চিকিৎসা না দিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এমনকি সেক্ষেত্রে রোগীকে স্বাভাবিক করার কোনো পদক্ষেপও নেওয়া হয় না। এমন পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে গুরুতর সংকটে ফেলেএবং এতে খরচ বাড়ারপাশাপাশি কঠিনতর অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি হাসপাতালগুলোকে পূর্ণ সক্ষমতায় চালু রাখা এবং সেগুলোর ওপর অর্পিত সেবাদানের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পরিপালন করা একটি জরুরি দায়িত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এখন মানুষের আবাসস্থলের কাছাকাছি জায়গায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার প্রাপ্যতা বাড়ানোর মাধ্যমে মানুষকে সহায়তা করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওপিপি ব্যয় হ্রাসকরণেও বিষয়টি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

চ. স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহির ঘাটতি

সরকারি খাতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার জবাবদিহির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য-কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। সরকারের প্রশাসনিক শাখাসমূহের কাঠামো এমনকি স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদেরও এই জবাবদিহির আওতা থেকে মুক্ত। যদিও দায়বদ্ধতা কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক এবং রুটিন বিষয়গুলো কিছু মাত্রায় কাজ করে (যেমন বিভিন্ন সমন্বয় সভা, অবহিতকরণ, লজিস্টিকস সরবরাহ প্রবাহ ইত্যাদি)। কিন্তু রোগীদের স্বার্থ রক্ষা, সেবাদানকারীদের অনুপস্থিতির বিষয়টি মোকাবিলা, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোয় সুবিধাসামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জামাদির মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার কাঠামো তেমন কাজ করে না, বরং এক্ষেত্রে দায়বদ্ধতায় চিড় ধরেছে। অনুপস্থিতির বিষয়টি বিশেষভাবে জটিল সমস্যায় রূপ নিয়েছে এবং উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়টিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যা, কাজের অবস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের প্রত্যাশার সঙ্গেপেশাগত অভীষ্টের মধ্যকার অসামঞ্জস্যএবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক রাজনৈতিক নেটওয়ার্কেও এর প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা, ক্ষমতা ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গেযাদের সংযোগরয়েছে, তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে পার পেয়ে যেতে পারেন। এর মাধ্যমে তারা তাদের সহকর্মীর মধ্যকার কর্মস্পৃহা কমিয়ে দেন, যাদের এমন সক্ষমতা নেই। ফলে এসব সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের বিপরীতে বেসরকারি ক্লিনিকে বেশি সময় অতিবাহিত করেন। (নাহার এন এট এএল, ২০২২। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি এর কাঠামোগত চালিকা শক্তি কী? স্বাস্থ্য খাতে গুণগত গবেষণা (২.১০০০৮৯. ১০.১০১৬/j.ssmqr.২০২২.১০০০৮৯).

সংসদ সদস্যদের নেতৃত্বে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক সহায়তা কমিটি গঠন করা হলে সেটি সরকারি স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার ওপর নজরদারি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের কার্যকারিতা বাড়বে। যাহোক, দুঃখজনক হলেও সত্য যে,এসব কমিটিহয় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অথবা যথাযথ গুরুত্বসহ তাদের দায়িত্ব পালন করে না। বেসরকারি খাতের ক্ষেত্রেও রোগী ও ক্লায়েন্টদের কাছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও খুবই দুর্বল।

২. সুপারিশমালা

উপর্যুক্ত/উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ওপিপি ব্যয় হ্রাস করা ও সুনির্দিষ্টভাবে দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত চাহিদাসমূহ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

সকলের জন্য বিশেষ করে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে গুণমানসম্পন্ন ওষুধ নিশ্চিত করতে হবে

- জরুরি ওষুধের তালিকা পর্যালোচনা ও তালিকায় ওষুধের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ: ১৯৮০ সালের ওষুধনীতিতে ১৫০টি ওষুধকে জরুরি ওষুধ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে ১৯৯৫ সালে সরকার একটি বিশেষপ্রজ্ঞাপনঘোষণাপত্র জারির মাধ্যমে জরুরি ওষুধের তালিকা ১১৭টিতে নামিয়ে আনে। ২০১৬সালে সংশোধিত ওষুধনীতিতে ২৮৫টি ওষুধকে জরুরি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এই তালিকা খুবই অপূর্ণাঙ্গ, কারণ ওই তালিকার ৩০৯টি ওষুধের মধ্যে ৩৭টি ওষুধ রয়েছে যেগুলো অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) প্রতিরোধে কার্যকর। ডব্লিউএইচওর সুপারিশ অনুসারে প্রতি দুই বছর পরপর এই তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার বাধ্যবাধ্যকতা রয়েছে। জরুরি ওষুধের তালিকার পরিধি এবং এসব ওষুধের দাম অবধারিতভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিতহতে হবে।

- অন্যান্য ওষুধের দাম হ্রাসকরণ: যেহেতু ওপিপি ব্যয়ের ৬৪ শতাংশই ওষুধের পেছনে চলে যায়, তাই ওষুধের দাম নির্ধারণ নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করার মাধ্যমে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ ও কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে এবং দাম-সংক্রান্ত এ নীতিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগ করার পাশাপাশি সে দাম অনুসৃত হচ্ছে কি না, সে বিষয়টি পরিবীক্ষণ করতে হবে।

- দেশের অভ্যন্তরে ওষুধের উৎপাদন সামগ্রীর উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে হবে: ওষুধের উৎপাদন সামগ্রীর আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত ওষুধের দাম হ্রাসকরণে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ উদ্যোগ ওষুধের সরবরাহ ব্যবস্থার ভঙ্গুরতাকেও রোধ করবে।

- জরুরি ভিত্তিতে একটি আধুনিক ওষুধভাণ্ডারব্যবস্থাপনার চালু করতে হবে: জাতীয়ভাবে একটি তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কেন্দ্রীভূত ওষুধ ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা করা গেলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে সময়মতো ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে এবং এর ফলে ওষুধের কাঙ্ক্ষিতগুণাগুণ রক্ষা করে নিষ্কণ্টকভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়টি ওষুধ ও অন্যান্য সরঞ্জামের অভিলভ্যতা পরিবীক্ষণে, ওষুধের ঘাটতি ও মজুত শেষ হয়ে যাওয়ার সমস্যা মোকাবিলায়, ওষুধ মজুতকরণের গুণমান বৃদ্ধিতে এবংওষুধের বিস্তারিত তালিকা ও মজুতকরণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে সহায়ক করবে।

অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত চাহিদা পূরণে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে

- প্রান্তিক সম্প্রদায় ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে: পূর্বের সেকশনে বর্ণিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবিলা করে এসব জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্যসেবার অভিগম্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারকে এনজিও/নাগরিক সংগঠন (সিএসও)-এর সঙ্গে দলবদ্ধভাবে কাজকরতে হবে। এটা করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রয়োগ করে উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতেহবে (যেমন, টেলিমেডিসিন, স্যাটেলাইট/ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকের মাধ্যমে)। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গমনাগমন সহজ করতে হবে (ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সের মতো পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে)। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এনজিওগুলো নানা সফল উদ্যোগের প্রয়োগ ঘটিয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এনজিওগুলোর উদ্যোগসমূহ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া উচিত।

- পর্যায়ক্রমে সকল ধরনের সেবা প্রতিবন্ধীবান্ধব করে তুলতে হবে: সরকারের পুনঃপুন প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এখনো সরকারি সুবিধাগুলো প্রকৃত প্রতিবন্ধিতার শিকার জনগোষ্ঠীর উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি। এমনকি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতেও তাদের অভিগম্যতা খুবই সীমিত। সকল সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করার জন্য সরকারকে অবশ্যই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবাকেন্দ্রের অবকাঠামোতে র‌্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে। এর পাশাপাশি সকল সেবাকেন্দ্রে প্রতিবন্ধীবান্ধব অভ্যর্থনা ও তাদের জন্য উপযোগী প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। সেরকারি স্বাস্যসেবা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নে শর্ত হিসেবে এই সুবিধা দুটি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

- জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী খানাগুলোর জন্য প্রিপেইড কার্ড প্রবর্তন: এক্ষেত্রে দুটি প্রিপেইড কার্ড থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যেতে পারে। এর একটি হচ্ছে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা (পিএমজেএওয়াই)' এবং ভারতের সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এবিএইচএ স্কিম। এই দুটি কার্ডের মাধ্যমে নিম্নআয়ের মানুষ তালিকাভুক্ত স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা পেয়ে থাকে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যখন জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয় বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো অসুস্থতার শিকার হয়, তখন সেই জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ভিজিএফ বা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি/নিরাপত্তা জাল স্কিমের মাধ্যমে এ ব্যবস্থার আওতাভুক্ত মানুষদের জন্য যৌক্তিক পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আগে থেকেই সরকারি বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধিতএকটি কার্ডের প্রচলন ঘটানো যেতে পারে।

- স্বাস্থ্য আইনের অধিকার: বাংলাদেশের সংবিধানে যদিও মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষার অধিকারের বিষয়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে, কিন্তু সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। কোভিড-১৯ অতিমারির অভিজ্ঞতা থেকেএ ধরনের একটি আইনের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতহয়েছে। যদিও এ ধরনের আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নানা ইস্যু জড়িত, তথাপি এটি বাস্তবায়ন করা হলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ অন্তত তাদের অধিকার দাবি করার বিষয়ে একটি আইনি ভিত্তি পাবে (এ আইনটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আদলে হতে পারে)।

- প্রথম পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করতে হবে: এমন শর্ত যুক্ত করে সকলের জন্য একটি ন্যূনতম সুবিধা প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। এ বিষয়টি পরে অধিকতর ও উন্নততর চিকিৎসার জন্য একটি সুপারিশ-ভিত্তিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

- সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনমাফিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির (এসএসকে) একটি পর্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনার পদক্ষেপ নিতে হবে।

- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে প্রবিধান, জবাবদিহি ও শাসন ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন

- ১৯৮২ সালের প্রাইভেট প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স পর্যালোচনা, আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন: ১৯৮২ সালের ওই অধ্যাদেশ বর্তমান বাস্তবতায় অকেজো হয়ে পড়েছে, কারণ এটি ঘোষিত হয়েছিল চার দশকেরও বেশি সময় পূর্বের বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে। বিগত বছরগুলোয় দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাত অভূতপূর্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেজন্য সরকারের উচিত এই অধ্যাদেশ পর্যালোচনা ও সংশোধন করার মাধ্যমে বর্তমান সময়ের প্রয়োজন অনুসারে একটি যথোপযুক্ত কাঠামো প্রণয়ন করা, যার আলোকে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম একদিকে কার্যকরভাবে পরিচালিত হবে, অন্যদিকে তাদের জবাবদিহির আওতায়ও আনাসম্ভব হবে।

- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষগুলোর সক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র শক্তিশালীকরণ: জনবল বাড়ানো, স্বয়ংক্রিয়তাওডিজিটাইজেশন, আর্থিক সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত মাত্রায় লজিস্টিক সহায়তা প্রদান

এবং কার্যক্রম পরিচালনায় নতুন পন্থা প্রচলনের মাধ্যমে ডিজিএইচএস, ডিজিএফপি, বিএমডিসি ও ডিজিডিএ'র মতো সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেগুলো সফলভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

- স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান তদারকির জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ গঠন: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করতে হবে। সেই কমিটিকে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযোগের ভিত্তিতে কাজ করার এখতিয়ারপ্রদান করতে হবে। এ কমিটি সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের বিষয়ে কাজ করবে। এক্ষেত্রে নানা ধরনের উপকরণের প্রয়োগ ঘটানো যেতে পারে। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান, পরিবীক্ষণের উদ্দেশে পরিদর্শন এবং কারিগরি ও নৈতিক বিষয়ে মান নিয়ন্ত্রণ। এ কমিটি 'স্বাস্থ্যের অধিকার' বাস্তবায়নে ক্রমান্বয়েকাজ করবে।

যোগসাজশের সংস্কৃতি ও কুফল মোকাবিলা করে শাসনব্যবস্থা/পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

- ওষুধ ও রোগ নির্ণয় কার্যক্রমেরনৈতিক সম্প্রসারণে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন: ওষুধের বিপণন নিয়ন্ত্রণ এবং ওষুধের বাজার সম্প্রসারণে ওষুধ কোম্পানিগুলো ও রোগ নির্ণয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবস্থাপত্র প্রদানকারী চিকিৎসক ও সেবাদানকারীদের প্রদত্ত সুবিধা এবং এ খাতের অশুভ জোট নিয়ন্ত্রণে ২০১৬ জাতীয় ওষুধনীতির ফলাফলের আলোকে অথবা স্বতন্ত্রভাবে সরকারকে কঠোরনির্দেশিকা প্রস্তুত করতে হবে। বাড়তি খরচের বিষয়ে রোগীদের অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্তে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা জিআরএস ব্যবস্থার সহযোগে ডিজিএইচএস-এ একটি মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের সামগ্রিক শাসন/ পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো একটি অগ্রাধিকারের বিষয় হিসেবে সামনে এসেছে, যা সমাধান করা আবশ্যক।

সরকারি সেবা ব্যবস্থায় সেবা সরবরাহের দক্ষতা ও কার্যকারিতা সর্বাধিকরণ

- সকল ধরনের সরকারি স্বাস্থ্য সুবিধাকে পূর্ণ শক্তিতে কার্যকর করতে পদক্ষেপগ্রহণ: বিপুলসংখ্যক মানুষের দোরগোড়ায় ব্যাপকতরভাবে স্বাস্থ্যসেবার অভিলভ্যতা ও অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে সরকারি সেবাকেন্দ্রগুলোর শূন্য পদসমূহ পূরণ করতে হবে। করে। এ উদ্যোগ ধীরে ধীরে রোগীর ওপিপি ব্যয় কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে এবং দূরবর্তী সেবাকেন্দ্রে সেবা নিতে যাওয়া ঝক্কিঝামেলা ও হয়রানি থেকে তারা নিস্তার পাবেন।

- অপেক্ষার সময়-ব্যবস্থাপনা: দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় (বিভিন্ন সরকারি সেবাকেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন) থাকার বিড়ম্বনার কারণে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোয় সেবা নিতে মানুষ আগ্রহী হন না। এই অপেক্ষার সময় কমিয়ে আনতে বিভিন্ন সেবার চাহিদাসমূহ আগে থেকে নিরূপণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী এগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের পাশাপাশি সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় রসদ ও সরবরাহ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

- আচরণগত বিষয়সমূহের সমাধান: সেবাগ্রহীতারা যদি সেবা প্রদানকারীদের তরফ থেকে অধিকতরসম্মানজনক আচরণ পান, তাহলে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ সরকারি ব্যবস্থা থেকে গ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত হবেন। এই পরিবর্তনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে আচরণিক/আচরণগত সংস্কৃতি পরিবর্তনের বিষয়টি জড়িত, যে সংস্কৃতি পরিবর্তনের ভিত রচিত হওয়া উচিত বিভিন্ন স্তরের প্রকার স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময়কালে। স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মকালে তাদের আচরণগত বিষয়াদি আবশ্যিকভাবে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নজরদারি করতে হবে।

- মডেল ফার্মেসি প্রতিষ্ঠা: ওষুধের গুণগত মান বজায় রেখে সরবরাহের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে দেশব্যাপী আরও বেশি সংখ্যায় মডেল ফার্মেসি স্থাপনে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যায়ক্রমে সকল ফার্মেসিকে ডিজিডিএ'র তালিকাভুক্ত হতেহবে। মডেল ফার্মেসিগুলোয় অবশ্যই প্রশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট নিয়োগ দিতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ কার্যক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠাকরণ

- অবিলম্বে স্থানীয় পর্যায়ের সকল পক্ষকে সক্রিয় করতে হবে: কমিউনিটি ক্লিনিক গোষ্ঠী, কমিউনিটি ক্লিনিক সহায়তা গোষ্ঠী, ইউনিয়ন পর্যায়ের পরিবার পরিকল্পনা কমিটি এবং সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসব কমিটির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদেরও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব। বর্তমানে এমন অস্তিত্ব থাকলেও হয় সেগুলো নিষ্ক্রিয়, অথবা বিশেষ মুহূর্তে সক্রিয় হয়। কোনো প্রকার বিলম্ব ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় সরকারি নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে এসব কমিটিকে সক্রিয় করতে হবে এবং এগুলো পরিচালনায় একটি মানদ-ভিত্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এসব কমিটিকে অবশ্যই স্থানীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম তদারকি ও স্থানীয়ভাবে সমাধান করা সম্ভব এমন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা দিতে হবে। একই সঙ্গে তাদের কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে।

- বর্তমানে সেবার মানের বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে সিএসও/ এনজিওগুলো সেবাগ্রহীতাদের নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করতে পারে, যেধরনের প্ল্যাটফর্ম সেবাগ্রহীতাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করবে। এ ধরনের প্ল্যাটফর্ম রোগীর সহায়তাকারীর অভাব পূরণে সেতুবন্ধনের কাজ করবে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু বরাদ্দ দেওয়া হলে তা এ ধরনের প্ল্যাটফর্ম গঠনও সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

স্বাস্থ্য খাতের বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা পর্বতারোহণসম কঠিন কাজ। তবে এক্ষেত্রে যদি উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাহলে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ: প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা; ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ; এবং অভাবী জনগোষ্ঠীর কাছে গুণগত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বেসরকারি অনুঘটকদের সহায়তা করার বিষয়ে সরকারের ইচ্ছা। স্বাস্থ্য খাতে আমলাতন্ত্র, প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক স্টোর এবং স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের মধ্যে যে অশুভ যোগসাজশ রয়েছে, সেটি ভাঙার জন্যও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃস্থানীয় পর্যায় থেকে এসব বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জোরালো অঙ্গীকার ব্যতীত এসব প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা যে খুবই কঠিন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি প্রদান এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা তৈরিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং যখন ওই রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যাবে, তখন এ বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে স্বাস্থ্য খাতের পেশাজীবী ও কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত স্বার্থ চরিতার্থ করার বিষয় থেকে উত্তরণেরজন্যও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। তবে এই গোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটব্যাংক এবং তাদের নিজ নিজ সমিতির মাধ্যমে যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতা রয়েছে।

এখানে যেসব সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলো যদি বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে স্বাস্থ্যখাতে সন্দেহাতীতভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। ক্রমবর্ধমান জিডিপি ও সম্পদের অভিলভ্যতার বাস্তবতায় বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবেই গুণগত স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে বাড়তি অর্থ ব্যয় করার সক্ষমতা রাখে। বর্তমানে স্বাস্থ্য

খাতে সরকারি ব্যয় মোট বাজেটের মাত্র ৫.৪ শতাংশ, যা ডব্লিউএইচওর সুপারিশকৃত ১৫ শতাংশ মাত্রার তুলনায় অনেক কম। এমনকিএই স্বল্প বরাদ্দের মধ্যেও প্রতিবছর ২০-৩০ শতাংশ অর্থ অব্যবহৃত থেকে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে স্বাস্থ্য বাজেট বাস্তবায়ন ও বরাদ্দের দ্বৈততা পরিহারের মাধ্যমেও সরকার সেবা সরবরাহ বাড়াতে পারে। একই সঙ্গে সরকারকে স্বাস্থ্য খাতে ধীরে ধীরে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে ডব্লিউএইচওর সুপারিশকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আগামী কয়েক বছর ধরে প্রতিবছর স্বাস্থ্যখাতে মোট বাজেটের ১ শতাংশ অর্থ বরাদ্দবরাদ্দ বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের মোট স্বাস্থ্য বাজেটের ২৫ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায়, ৩৯ শতাংশ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবায় এবং ৩৬ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয় তৃতীয় পর্যায় বা টারশিয়ারি পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্যই সেবাকেন্দ্রে বেশি যান। এক্ষেত্রে বাজেটের অর্থ বণ্টনের কাঠামোটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদান্তে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা খাতে বরাদ্দ ৩৫-৪০ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন (উন্নয়নসমন্বয়, সেপ্টেম্বর ২০২২। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় - বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ কর্তৃক অনুমোদিত সমীক্ষা)। বাংলাদেশকে পর্যায়ক্রমে বর্তমানের সরবরাহকেন্দ্রিক অর্থায়ন মডেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং চাহিদাভিত্তিক বরাদ্দ প্রদানের দিকে অগ্রসর হতে হবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির (এসএসকে) বর্তমান অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সাহসী ও ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বিগত এক দশক বা তারও কিছু বেশি সময় ধরে স্বাস্থ্য খাতে সরকার ও নাগরিক সমাজের মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান দূরত্ব তৈরি হয়েছে । স্বাস্থ্য খাতে বর্তমানে নাগরিক সমাজের জোরালো ভূমিকা অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছে এবং এক্ষেত্রে দৃঢ় নেতৃত্বের ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া নাগরিক সমাজের কণ্ঠস্বর ও সুপারিশমালা আমলে নেওয়ার বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের পক্ষ থেকেও উদার মানসিকতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে সরকারি ও বেসরকারি অনুঘটকদের মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে আমলাতন্ত্রের নেতৃত্বের মধ্যেও একটি উদারনৈতিক মনোভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি স্বার্থান্বেষী মহলের হীন স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ মোকাবিলা করে একটি সামাজিক জনহিতকরসমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়ে নতুন কর্মপন্থা চালু করতে হবে।

একটি স্বাস্থ্যবান ও উৎপাদনশীল কর্মিবাহিনী ব্যতিরেকে দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং রূপকল্প ২০৪১-এ বাংলাদেশ যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি অভিযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে একটি ন্যায়সংগত সময়সীমার মধ্যে ইউএইচসির উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের বিষয়টিকে। কোনোরূপ কালবিলম্ব না করে এ কাজ শুরু করতে হবে এবং এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্য খাতের বাইরের সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে ইউএইচসির বাস্তবায়নকে বাস্তবে রূপ দিতেহলেআবশ্যিকভাবে একটি দৃঢ় সময়-আবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন।

৭

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

শাহীন আনাম
কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
এবং
নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

পেনহোল্ডার

ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ
অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড)

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

আসিফ সালেহ্
নির্বাহী পরিচালক
ব্র্যাক

ড. ইমরান মতিন
নির্বাহী পরিচালক
ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
(বিআইজিডি)

মোঃ হারুন অর রশীদ
নির্বাহী প্রধান
লাইট হাউজ

ড. মোহাম্মদ মাহফুজ কবির
গবেষণা পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড
স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)

ড. মুস্তফা কে মুজেরী
নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স
অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইএফডি)
এবং
সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা
প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

ড. এস. এম জুলফিকার আলী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

তোফাজ্জল হোসেন মঞ্জু
নির্বাহী সদস্য ও গবেষক
রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সূচকসমূহে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত শতকের গোড়া থেকে বাংলাদেশের বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছয় শতাংশের কাছাকাছি অবস্থান করছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে এ ধারা আরও গতি পেয়েছে এবং একই সঙ্গে দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। একসময় দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ, যা ২০২২ সালে ১৮.৭ শতাংশে নেমে আসে। তবে দারিদ্র্য প্রশমনে উল্লেখযোগ্য কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান এবং এক্ষেত্রে নানামুখী ভঙ্গুরতা মোকাবিলা করে অগ্রসর হতে হচ্ছে, যা প্রবৃদ্ধির ইতিহাসকেপ্রভাবিত করে। স্মরণীয় যে, ন্যূনপক্ষে একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় রয়েছেন এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দেশে মাত্র ২৮ শতাংশ। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ (HIES)-এর তথ্য অনুসারে, নগর অঞ্চলে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের পরিধিঅপেক্ষাকৃত কম, শহরের মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ এ সুবিধা পেয়ে থাকেন। অধিকন্তু সাম্প্রতিক অতীতে কোভিড-১৯ অতিমারির আক্রমণবাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতাসমূহ উন্মোচন করে দিয়েছে। অতিমারির ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় কর্মী ছাঁটাই করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মারাত্মক দুর্বলতার চোখে পড়ে। কেননা, এই পদ্ধতি হঠাৎ করে কর্মহীন হয়ে পড়া ব্যক্তিকেযথাযথ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থ হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেযেসব মানুষ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তারা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। যদিও অতিমারির বিষয় এখন আর সমস্যার অগ্রভাগে নেই, কিন্তু এখন ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি বিশেষত নিম্নআয়ের খানাসমূহ ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। নিত্যপণ্যের অব্যাহত দরবৃদ্ধির পরিস্থিতির সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে তাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে; সরকারের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির সুযোগ নিতে তাদের অনেককে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। উপর্যুক্তপরিস্থিতি ছাড়াও বাংলাদেশে জলবায়ুকেন্দ্রিক নানা চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেউপদ্রুত এলাকায় এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর সন্দেহাতীতভাবে সেই বিরূপ প্রভাবের ফলে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হন প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ।

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতেসুনির্দিষ্টভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি) 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না (LNOB)' শীর্ষক যে মৌলিক প্রত্যয়/লক্ষ্যবস্তুরয়েছে, তা অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা (USP) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ একটি জরুরি প্রয়োজন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নীতিনির্ধারকদের জরুরিভিত্তিতে মনোযোগ দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। বস্তুতসামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে দেশের সংবিধানে অঙ্গীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করারলক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার কারণে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি রাষ্ট্রের উন্নয়ন এজেন্ডার একটি মুখ্য উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ফিনল্যান্ড, কানাডা, জাপান ও যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশসমূহে ৯০ শতাংশের বেশি নাগরিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সহায়তার আওতাভুক্ত উপভোগ করে থাকেন।

বাংলাদেশে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন মোটাদাগে সামাজিক সুরক্ষা খাতের চারটি বিষয়কে শক্তিশালী করার ওপর জোর দেবে: সর্বজনীনআচ্ছাদন; ঝুঁকির বিবেচনায় সমন্বিত সুরক্ষাআচ্ছাদন; জীবনচক্রভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা; এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার টেকসইকরণ।

বাংলাদেশের যখন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের সহায়তা বিতরণের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তখন ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) গ্রহণের বিষয়টি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে নতুনভাবে দাঁড় করাতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্মারকস্তম্ভ হিসেবে দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশের

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনয়নের বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছে এনএসএসএস। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশে 'সর্বজনীন' সামাজিক সুরক্ষা ও একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ বিষয়টি এনএসএসএসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।

'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না'- এনএসসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার এই মূলমন্ত্রের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন এর মুখ্য উপাদানসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা। একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শের/চিন্তারনিরিখে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক ধারণাসমূহ সঠিকভাবে উপলব্ধি করা আবশ্যক। 'সর্বজনীন' সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়নের জন্য এর সঙ্গে সম্পর্কিত নিচের প্রতিটি উপাদান পরীক্ষা করার প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান:

- সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি নীতি ও কর্মসূচির সমন্বয়ে এমন একটি ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে, যে ব্যবস্থা সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় সকল নাগরিকের ন্যায়সংগত অভিগম্যতা প্রদান করে এবং নাগরিকদের সকল প্রকার বঞ্চনা এবং তাদের জীবিকা ও কল্যাণের পথের সকল ঝুঁকি মোকাবিলা করে জীবনচক্রভিত্তিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

- একটি সর্বজনীন ব্যবস্থায় শতভাগ নাগরিকের সুরক্ষা আচ্ছাদনে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট দুর্দশা অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আসার যোগ্য বিবেচিত হবে।

- পরবর্তী উপাদান হচ্ছে ব্যক্তির ঝুঁকিগ্রস্ততা অনুযায়ী সমন্বিত সুরক্ষা প্রদান। এক্ষেত্রে যেসব ঝুঁকি জন্মের পূর্বাবস্থা থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একজন মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সর্বজনীন সুরক্ষা ব্যবস্থায় সেগুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে সংবিধানে নিশ্চিতস্বাভাবিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে এবং সুরক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও আর্থ-সামাজিক প্রান্তিকীকরণ প্রতিরোধ এবং সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক মাত্রার বিষয়াদিকে বিবেচনায় নিতে হবে।

- সর্বজনীন সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যাপ্ততার বিষয়টিকে উল্লেখকরে। এর অর্থ হলো যে ধরনের সুরক্ষা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে, তা যেন বিশেষ ধরনের দুর্বলতাথেকে উদ্ভূত সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিমোকাবিলায় যথেষ্ট হয়।

- সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই টেকসই হতে হবে যাতে সুরক্ষা কর্মসূচি সীমিত সম্পদের ওপর বোঝা সৃষ্টি না করে। বরং এক্ষেত্রে অর্থায়ন কাঠামোটি এমন হবে, যা সরকারে বাজেট ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেরসঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং উত্তরোত্তর টেকসই পরিস্থিতির দিকে চালিতহবে।

- সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় নিশ্চিত করতে হবে যে, সমাজের প্রত্যেক মানুষ যেন তাদের জীবনকালব্যাপী সম্মুখীন হওয়া নানা ধরনের ঝুঁকির বিপরীতে পর্যাপ্ত মাত্রায় সুরক্ষা পায়। একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ; তা হলো: সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা মানে প্রত্যেককে নিয়মিত ভিত্তিতে সুবিধা দিয়ে যেতে হবে- এমন নয়; বরং এটি নির্ধারণ করতে হবে সর্বজনীন মূল আয় (UBI)-এর ওপর ভিত্তি করে। এই ধারণার মধ্যে আরও যে বিষয়টি থাকতে হবে, তা হচ্ছে লক্ষ্যনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিশেষ স্কিমের আওতায় এনে তাদের জন্য শোভন রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করে অবস্থার উন্নতি ঘটানো।

স্মরণরাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ ব্যাপকভিত্তিক বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একটি বড়সংখ্যক দেশ একক সর্বজনীন শিশুকল্যাণ মঞ্জুরি অথবা মিশ্র বহুমাত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আর্জেন্টিনায়

৮০ শতাংশেরও বেশিসংখ্যক শিশু বিভিন্ন সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে সহায়তা পেয়ে থাকে। নিচে এমন কিছু সহায়তার বিষয় উল্লেখ করা হলো:

- সামাজিক সহায়তা: অর্থনৈতিক সংকটও দুর্দশার সম্মুখীন পরিবার বা ব্যক্তিকে সরাসরি সরকার অথবা দাতব্য সংস্থা সমূহের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান ও সহায়তা প্রদান করা হয়। সরাসরি সরকার অথবা দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে এ সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে।

- সামাজিক বিমা: এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তি ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট তহবিলে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করে। এর বিপরীতে চাঁদা প্রদানকারী ব্যক্তি অসুস্থতাজনিত স্বাস্থ্যসেবা বা অবসর গ্রহণের পর নিয়মিত অবসর ভাতার মতো বিভিন্ন ধরনের সুবিধা উপভোগ করেন। সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সবার জন্য একই মাপের নীতি প্রযুক্ত হলেতা ইউএসপি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কোনো কাজেই আসবে না। সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গও সুনির্দিষ্ট ভঙ্গুরতাসমূহকে বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য এসডিজির মূল প্রেরণা'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না (LNOB)'-কে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। সামাজিক সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব জনগোষ্ঠী সর্বাধিক দুর্দশারশিকার এবং সে কারণে যারা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগেরমধ্যে আছেন, তাদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও এই এলএনওবি ধারণা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দেশে বহু সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী রয়েছে; যেমন: শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষ, আদি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ , যৌনকর্মী, তৃতীয় লিঙ্গের (ট্রান্সজেন্ডার) জনগোষ্ঠী প্রভৃতি যারা সুনির্দিষ্ট দুর্দশার শিকার। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, , সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদির সমন্বিত বিবেচনায় এসব জনগোষ্ঠী ঝুঁকির মুখে সমাজের মূল স্রোতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এলএনওবির মূলনীতির সঙ্গে সংগতি রেখে একটি সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন করতে হলে সরকারকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, যেসব মানুষের সহায়তা প্রয়োজন এবং যে মাত্রায় সহায়তা প্রয়োজন, তা সরবরাহ করার জন্য সামাজিক সুরক্ষার পরিধিসর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে।

উপর্যুক্তবিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে এই নীতি বিবৃতিতে কতিপয় কর্মমুখী সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি সমন্বিত সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করার পথ সুগম হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থা ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে তাদের জীবনপ্রবাহেনানা অভিঘাত মোকাবিলার জন্য সক্ষম করে তুলবে।

২. সুপারিশমালা

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সহযোগে দুর্দশাগ্রস্তজনগোষ্ঠীকে মনোযোগের কেন্দ্রে রেখে তাদের প্রয়োজনসমূহের বিষয়ে একটি সমন্বিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে নানা ধরনের দুর্বল/অসহায়জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের ঝুঁকির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে। যদিও, বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের চলমান সামাজিক নিরাপত্তা জালের কর্মসূচিসমূহের (SSNPs) সক্ষমতার অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নগদ সহায়তা প্রদান কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে মাথাপিছু যে অর্থবিতরণ করা হয়, তা অত্যন্ত অপ্রতুল এবং গণহারে নির্ধারিত। এছাড়া আরও একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে, খণ্ডিতভাবেযেসব কর্মসূচির বিস্তার ঘটানো হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করা অর্থ প্রার্থিত সুফল বহন করে আনেনি। এক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক পন্থা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনসমূহকে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ কর্মসূচির আওতা বাড়ানোর জন্য স্বল্পমেয়াদে একটি বাস্তবানুগ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের

উদ্যোগ বাংলাদেশে মধ্যমেয়াদে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। একটি যথোপযুক্ত ইউএসপি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে প্রতিটি ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছাই করতে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষকে(যেমন: জেলা পর্যায়) নিয়েমূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক। এ ধরনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে জাতীয় ও প্রান্তিক উভয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক সংলাপ ও পরামর্শ সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের নেতা ও সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহন করতেহবে। এমন উদ্যোগ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সাড়াপ্রদানকারী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। কেননা এর মাধ্যমে বহুধাভিত্তিক দুর্দশাগ্রস্তজনগোষ্ঠী এবং তাদের বহুমাত্রিক দুর্ভোগেরবিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া সম্ভব হয়। ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনসমূহের ওপর পরিচালিত মূল্যায়নের ফলাফলসমূহ নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করার মাধ্যমে বিদ্যমান সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধা বৃদ্ধিকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং নতুনতরকর্মসূচি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

এক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক, এ ধরনের চর্চা অব্যাহত রাখলে তা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ক্ষেত্রধীরে ধীরে সম্প্রসারণেসহায়ক হবে; যেমন: আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরণ করার মাধ্যমে নাগরিকদের প্রতি মৌলিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব হবে। সাধারণভাবে একটি কার্যকর সামাজিক সুরক্ষার আবরণেচার ধরনের নিশ্চয়তা চিহ্নিতকরা হয়:

- অপরিহার্যস্বাস্থ্যসেবা
- শিশুদের জন্য আয়ের নিরাপত্তা
- বেকার, ছদ্ম বেকার, শারীরিকভাবে অক্ষম, অসুস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের নিরাপত্তা
- বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আয়ের নিরাপত্তা

সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং জনগোষ্ঠীর চাহিদা পরিমাপের ফলাফল কাজে লাগিয়ে একটি বাস্তবানুগ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন

একটি চলমান সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা স্কিম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। একাধিক/বহু বছরব্যাপী বাস্তবায়নযোগ্য একটি কর্মপরিকল্পনার নকশা প্রণয়নের জন্য বিষয়টির সঙ্গে ব্যাপক মাত্রায় অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক। যে উদ্দেশ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে, সেটি সফল করা এবং এটিকে সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সুনিশ্চিত অংশীজনদেরঅংশীজনদের সঙ্গে সামাজিক সংলাপ আয়োজন আবশ্যক। বিশেষভাবে ঝুঁকিগ্রস্ত ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের এ ধরনের সংলাপ আয়োজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি যথাযথভাবে এমন সংলাপের আয়োজন বাস্তবায়নকরা যায়, তাহলে এই সামাজিক সংলাপসমূহ একটি এলএনওবি-কেন্দ্রিক সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে।

এ ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বাংলাদেশে একটি সমন্বিত সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় অভিযোজন উপকরণ, আইনি কাঠামো, অর্থায়ন পদ্ধতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং উপাত্তের প্রয়োজনীয়তাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলোর বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের জন্য সহায়ক হবে। টেকসই ও সাড়া জাগানোউদ্যোগসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে অবহিত হয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং পরে সেসব কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালায় সমন্বয় করে সংশ্লিষ্টপরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

যেসব প্রধানঅংশীজনকে পরামর্শ কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাদের তালিকা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ না রেখে নিচে দেওয়া হলো:

- কর্মসূচি থেকে সরাসরি সুবিধাভোগী ব্যক্তি
- উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যরা।
- স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি দায়িত্বপালকারী ব্যক্তি, যেমন: জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি, তথা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ।
- ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) খোলা বাজারে বিক্রয়কর্মসূচির তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীসহ কর্মসূচি বাস্তবায়নে যুক্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।
- সুশীল সমাজ=কেন্দ্রিকসংগঠন ও অধিকার প্রতিষ্ঠারযুক্ত গোষ্ঠী, বিশেষত যারা দুর্দশাগ্রস্তজনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অধিকারের বিষয়ে সালিশিকরে থাকে।

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য উপযুক্তও টেকসই অর্থায়ন পদ্ধতিপ্রণয়ন

সংবিধান ও জাতীয় কৌশলসমূহের সঙ্গে সংগতি রেখে সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক নীতিসমূহ ও কর্মসূচি যদি একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে সেটি বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বচ্ছ ও সমন্বিত অর্থায়ন পদ্ধতিপ্রয়োজন হবে এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদিও বছরের পর বছর ধরে অনেকগুলো সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, তথাপি সরকারের বিদ্যমান আর্থিক সক্ষমতার মধ্যেই এর আওতা আরও বাড়ানো এবং সুবিধাভোগীদের সুবিধার পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক সুরক্ষা অর্থায়নের জন্য একটি সুচিন্তিত পথচিত্র/পথরেখা তৈরি করে তাটেকসইভাবে বাস্তবায়নযোগ্য করতে হবে।

একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ফ্রেডরিখ-এবার্ট-শিফটাং কর্তৃক পরিচালিত এক প্রাক্কলন থেকে জানা যায়, সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যমান আয় ও স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন ঘাটতি মোকাবিলার জন্য জিডিপির ৩.৫ শতাংশ হারে অতিরিক্তবিনিয়োগ করতে হবে। যদিও এটি কোনো সুনির্দিষ্ট/সংহত প্রাক্কলন নয়, তবে প্রস্তাবিত সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা স্কিম বাস্তবায়নের জন্য কী মাত্রায় সম্পদের প্রয়োজন হবে, সে বিষয়ে এটিতে কিছু নির্দেশক বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে।

বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বৃহদাংশইরাজস্ব অর্থায়ননির্ভর। এ খাতে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তা দেশের মোট জিডিপির প্রায় ২.৫২ শতাংশের সমতুল্য। দেশের কর-জিডিপি অনুপাত (বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী) ২০২৩-২৪ অর্থবছরেরলক্ষ্যমাত্রা ৯.৯৯ শতাংশের তুলনায় ২০৩০-৩১ অর্থবছর নাগাদ এর বৃদ্ধি ১৯.৬ শতাংশ এবং ২০৪০-৪১ অর্থবছর নাগাদ ২১.৯ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা যদি অর্জিত হয়, তাহলে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে অর্থায়নেরসক্ষমতা বাড়বে। এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সরকার প্রয়োজনীয় রাজস্বসক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহের বিষয়সমূহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকার প্রতি অর্থবছরে জিডিপির আনুপাতিক হার অনুসারে সামাজিক সুরক্ষা খাতে সম্পদ বরাদ্দের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে পারে। রাজস্ব সংগ্রহের বর্ধিষ্ণু লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সংগতি রেখে বাজেট ও জিডিপির বিপরীতে শতকরাহিসাবে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ক্রমান্বয়ে বরাদ্দ বাড়ানো যেতে পারে।

এটি অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, একটি আদর্শ ইউএসপি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো রাজস্ব খাতের ব্যয় ও সুবিধাভোগীদের নিজস্ব অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচির সমন্বয়ে ভারসাম্য বিধান করে অংশীদারি সুরক্ষা মাধ্যমে

বেকার জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দান এবং স্বাস্থ্যবিমা, ফসল হানি ও জলবায়ু ঝুঁকির মতো বিষয়গুলো মোকাবিলার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। কোন কোন কর্মসূচি সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, আর কোনগুলো অংশদানকারীব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, সে বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিবেচিত হতেপারে। এক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল দেখা গেছে যে, অর্থায়নের জন্য 'ঝুঁকি-শ্রেণিকরণ পদ্ধতি' এ ব্যবস্থা এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভালো উপায় হতে পারে। যেসব ঝুঁকি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেরওপর উচ্চমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে (যেমন, অভিঘাত ও ঝুঁকির তীব্রতা), সেগুলোকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে ঝুঁকি-শ্রেণিকরণ পদ্ধতি। তবে কিছু বিষয়ে সহায়তার ফ্রিকোয়েন্সি কম হতে হবে (সম্ভবত একজন ব্যক্তির জীবনকাল জুড়ে কয়েকবার মাত্র)। বিশেষ করে প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যবিমার বিষয়টি অংশগ্রহণেরভিত্তিতে হওয়া উচিত। অন্যদিকে যেসব ঝুঁকি মানুষের জীবনে বারংবার সংঘটিত হয়, কিন্তু সেগুলোর তীব্রতা কম, যেমন: ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে রাজস্ব খাত থেকে অর্থায়ন করা যেতে পারে। কোন কর্মসূচিগুলো অংশগ্রহণমূলকহবে এবং কোনগুলোর ক্ষেত্রে রাজস্ব খাত থেকে অর্থায়ন করা হবে, সেটি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের উচিত বেসরকারি খাতকে সঙ্গে নিয়ে সেগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই করা। সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) মাধ্যমে অর্থায়ন করতে পারে।

পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে চাকরির সঙ্গে সংযুক্ত করতে জেলা কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও সক্রিয়করণ/সচলকরণ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কাজের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমেএক ধরনের রূপান্তরধর্মী প্রভাব পাওয়া যায়। এ প্রক্রিয়া টেকসই উপায়ে নানা ধরনের আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করে। যদিও এদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার কিছু গণপূর্ত কাজ করে থাকে, তবে সেসব কাজের মাথাপিছু সুবিধার পরিমাণ খুবই কম। এছাড়া এ প্রক্রিয়ায় যে ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন জনবল দরকার পড়ে, তা মূলধারার শ্রমশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, যুব বেকারত্ব, দক্ষতার অসামঞ্জস্য ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তি দেশের শ্রমবাজারের বৈচিত্র্যের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

উৎসাহব্যঞ্জক ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জেলা কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি সক্রিয় শ্রমবাজার নীতির মাধ্যমে এ বিষয়টি একটি সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহ তিনটি ভিন্ন ধরনের সহযোগ প্রদান করতে পারে: শ্রমবাজারের কর্মচাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান, চাকরিতে নিযুক্তিরবিষয়ে পরামর্শ দান এবং স্টার্ট-আপ/ব্যবসায় উদ্যোগের বিষয়ে সহায়তা। এসব চাকরি ক্ষেত্রপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা প্রত্যাশাকরা যেতে পারে। দেশের শ্রমবাজারের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও শ্রমবাজারের উপযোগী শ্রমশক্তি তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ ও চাকরিতে নিযুক্তিরসুযোগ সৃষ্টির জন্য এসব কেন্দ্রের সঙ্গে স্থানীয় বেসরকারি খাত ও ব্যবসায় উদ্যোগগুলোকেও যুক্ত করা যেতে পারে। এসব কেন্দ্র শ্রমশক্তির চাহিদা ও সরবরাহ উভয় বিষয়ে শ্রমবাজারের ওপর প্রয়োজনীয় উপাত্ত সৃষ্টি ও শ্রমবাজারের তথ্যের ওপর একটি সমন্বিত উপাত্ততৈরিতেও সহায়তা করতে পারে। এ ধরনের পন্থাশ্রমশক্তির উৎপাদনমুখী সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করবে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে সহায়তা করবে। এসডিজির স্থানীয়করণ পন্থারসঙ্গেও এ ব্যবস্থার সংগতিবিধান করা যেতে পারে। স্থানীয়করণ পন্থায় স্থানিক ঝুঁকিসমূহকে আমলে নেওয়ার পাশাপাশি শ্রমবাজারের প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় নেওয়া হয়।

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো সৃষ্টি

টেকসই উপায়ে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করার জন্য একটি কার্যকর আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। এটি সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও হতে পারে, অথবা সামাজিক নিরাপত্তা ও

সামাজিক বিমা বা অন্য কোনো মাধ্যমেও সম্ভব। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশে কী ধরনের আইনি কাঠামো রয়েছে, তা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সামাজিক সুরক্ষার দায়িত্ব বণ্টন এবং নাগরিকদের অধিকার ও সুবিধাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাবিধানে সুষ্ঠু আইনি ভিত্তি প্রদানে আইনি কাঠামোসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আইনি কাঠামো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

একটি সুবিন্যস্ত ও আইনি প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সামনে বেশকিছু সুবিধা হাজির করে। এটি সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এ-সংক্রান্ত বিষয়াদির বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশিকা ও বিধিবিধানকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের বিষয়ে স্পষ্টতা, ন্যায্যতা, আইনি ভিত্তি ও স্থায়িত্বশীলতা প্রদান করে। এটি বৈষম্য প্রতিরোধ করবে এবং টেকসই অর্থায়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নতি ঘটাবে।একটি সুস্থ আইনি কাঠামো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদেরমধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি জোরদার করে এবংএর পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভাবসমূহ মোকাবিলায় বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টিকে মেনে নেয়।

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অধিকতর ভালোভাবে বাস্তবায়নে উপাত্তের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি আমলে নিতে হবে

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি বিস্তৃতও মানসম্মত উপাত্তপঞ্জি (ডেটাবেজ) থাকা আবশ্যক। এনএসএসএস সঠিকভাবেই সেই উপাত্তপঞ্জির প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করেছে। যাহোক, সেই উপাত্তপঞ্জি এখনো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। জেনে রাখা দরকার যে, বর্তমানে যে ১১৩টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে, সেগুলোর জন্য কোনো সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) নেই। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপযুক্ত সুবিধাভোগী বাছাই করার সুবিধার্থে খানা পর্যায়ের উপাত্ত বিন্যাস করার মাধ্যমে একটি জাতীয় খানা তথ্যপঞ্জি (এনএইচডি) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। একটি সমন্বিত এমআইএস ব্যবস্থা না থাকার অর্থ হলো সুবিধাভোগী বাছাইয়ের জন্য গতানুগতিক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হবে। এ ধরনের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে প্রক্সি মিনস টেস্টিং (পিএমটি), অথবা স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সহায়তায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে সুবিধাভোগী বাছাইকরণ। এর ফলে সুবিধাভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণ ব্যাহত হয় এবং বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় বেশ অপচয় হয়। হালনাগাদ উপাত্তের ঘাটতি থাকার ফলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য নির্ধারিত সুবিধা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রাপ্তিরসুযোগ বেড়ে যায়। একটি সুবিন্যস্ত এমআইএস ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সমস্যার প্রশমন ঘটানোসম্ভব। একটি গতিশীল এমআইএস ব্যবস্থায় নিয়মিত ভিত্তিতে খানাসমূহের পরিবর্তিত হালনাগাদ অবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে। এটা যদি করা সম্ভবপর হয়, তাহলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী চিহ্নিত করা ও বাছাই করা আরও বেশি মাত্রায় নির্ভুল হবে এবং অপচয় ও বিচ্যুতির পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ ধরনের উপাত্তপঞ্জি একটি ভালো ভিত হিসেবে কাজ করবে, যার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সর্বজনীন ও ব্যাপকইউএসপি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

এনএসএসএসে প্রস্তাবিত জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামোর সঙ্গে সংগতি রেখে ইউএসপি কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ ও আনুপাতিক বিস্তারসাধন

এনএসএসএস দলিলে মানুষের জীবনচক্রভিত্তিক চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির চিন্তা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ দলিলের লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসূচির ব্যর্থতাকমিয়ে আনা এবং সঠিক ব্যক্তির কাছে সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার দক্ষতা বাড়ানো। একই সঙ্গে বিভিন্ন দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও পরিচালিত বিক্ষিপ্ত কর্মসূচিগুলোকে একীভূতকরণ। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে বিশালসংখ্যক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে বাস্তবায়িত হয়। এগুলোর

মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নে একীভূতকরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যমান কাঠামোতে অনেক বেশিসংখ্যক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেগুলোর ব্যাপ্তি খুবই ক্ষীণ। এই সমন্বয়হীন ব্যবস্থার নানা ধরনের বিরূপ প্রভাব রয়েছে। এতে একই ধরনের কর্মসূচির পুনরাবৃত্তিদেখা যায়। এতে দক্ষতার সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলেঅপচয় বৃদ্ধি পায়, সুবিধাভোগী শনাক্তকরণ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সপক্ষপাতের মতো ঘটনা ঘটে এবংউপযুক্ত সুবিধাভোগীদের পক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়ে। কর্মসূচিসমূহের একীকরণেরযেসব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, সেগুলো পরিপালন করা হয় অস্থায়ী ভিত্তিতে। তবে ব্যতিক্রমীভাবে বর্তমানে শিশু কল্যাণ কর্মসূচিসমূহ মাতৃভাতা কর্মসূচি ও স্তন্যদায়িনীমাতৃভাতা কর্মসূচির সঙ্গে যুক্তভাবেবাস্তবায়ন করা হচ্ছে (এ কর্মসূচিটির বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে মা ও শিশু সুবিধাকর্মসূচি)। কর্মসূচিগুলোর একীভূতকরণের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলো হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মসূচিগুলোকে একত্রীকরণজীবনচক্রভিত্তিক ঝুঁকি মোকাবিলায় অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিগুলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিতে একীভূতকরণ।

একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রচলন

কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নে একটি স্বচ্ছ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানোর জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। অভিযোগ প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের সক্ষম করে তুলতে একটি নির্দিষ্ট ও বহুত প্রচলিত টোলবিহীন/টোলমুক্ত হেল্পলাইন চালু করা প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রান্তিক এলএনওবি জনগোষ্ঠীর জন্য এটি চালু করতে হবে, যাতে করে তারা যেন নানা ধরনের অসংগতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর সরাসরি অভিযোগগুলো নথিভুক্ত করতে পারে। এতে করে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব উদ্বেগ রয়েছে, সেগুলোর লাঘব হবে। পূর্ব-অভিজ্ঞতা রয়েছে থেকে বলা যায়,কোভিড অতিমারি ও ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগের সময় ৩৩৩ সংখ্যকসার্বক্ষণিক যে হটলাইন চালু করা হয়েছিল তা থেকে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত কার্যকরএকটি সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে যাতে নিশ্চিতভাবে অভিযোগগুলো দ্রুততাও দক্ষতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা যায়। এ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব নিশ্চিত করতে সময়মাফিকনিরীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে।

ইউএসপি কার্যক্রমের দক্ষতা নিরূপণে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ

ইউএসপি কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি একটি কঠোর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M and E) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, সে বিষয়ে সরকারি সংস্থাগুলোর তরফে কোনো মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিদৃষ্ট হয় না। ফলত যে উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, সেই উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিতহচ্ছে কিনা তা বোঝা যায় না। এর ফলে কর্মসূচিগুলোর ব্যয়ন-সুফল (কস্ট-বেনিফিট) মূল্যায়নের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে। এতে করে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ সরকারি অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করছে কিনা, তার বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এটি কর্মসূচিগুলোর সম্প্রসারণের উদ্যোগ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে। একই সঙ্গে এগুলো যখন সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন কর্মসূচির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাসমূহ নতুন প্রতিবন্ধকতার জন্মদেয়। একটি সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ, কর্মসূচি চলমান থাকা অবস্থায় নানা ধরনের সংস্কার সম্পন্ন করা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত যেসব সংস্থা ইউএসপি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সকল পর্যায়েই এই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিচালনা করা উচিত এবং একই সঙ্গে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সকল ধরনের কার্যক্রমও মূল্যায়নের আওতায় আনা উচিত। এ মূল্যায়ন কেবল বিভিন্ন উদ্যোগের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় নাগরিক ও সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ইউএসপি বাস্তবায়ন কার্যক্রমে প্রযুক্তির কার্যকারিতা বিস্তৃতকরণ

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অপচয় হ্রাসকরণ ও এর বিতরণে দক্ষতা বাড়াতে আন্তঃদেশীয় অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সেখানে বর্ধিত মাত্রায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের যথাযথ জ্ঞান আহরণ করা উচিত এবং অনুরূপ ব্যবস্থা প্রয়োগকরার মাধ্যমে অগ্রগামী প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে কর্মসূচিগুলোকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ইউএসপির পথনকশা প্রণয়নের পূর্বেই প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেসব ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো বিভিন্ন অভিঘাতের কারণে ঝুঁকির সম্মুখীন, অগ্রগামী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের যথাসময়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল চাওয়া/ চাহিদাঅনুসারে গতিময়তার সঙ্গে সামাজিক কর্মসূচিসমূহের পরিবর্তন/সংশোধন ঘটানো ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সেবা প্রদানকারীদের খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিঘাত ও তার তীব্রতা বিষয়ে আশঙ্কার পূর্বানুমান করার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতেপারে। এটি কার্যকরভাবে কর্মসূচির আবর্তন, আবর্তনের মাত্রা ও গভীরতা মূল্যায়নে সরকারকে সক্ষম করে তুলবে। এর ফলে সরকার বুঝতে পারে যে কী ধরনের সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। ইউএসপির সমগ্র সরবরাহ-শৃঙ্খলের সঙ্গেই প্রযুক্তির সমন্বয়ঘটানো যেতে পারে। এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, তাদের নিবন্ধন ও তালিকা প্রণয়ন, সেবাপ্রদান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং অভিযোগ নিস্পত্তি। বাংলাদেশে একটি আধুনিক ইউএসপি কর্মসূচি চালু করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাদি গ্রহণের মাধ্যমে তার ভিত রচনা করতে হবে।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে ইউএসপি কর্মসূচি সম্প্রসারণের বিষয়টি ২০৪১ সালের মধ্যে দেশটির একটি উন্নত ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষারসঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টি যেমন নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ, কাজের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের কথা বাংলাদেশের অঙ্গীকারের সংবিধানে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হলে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তবে ভুলগুলো সংশোধনে বেশি সময় ব্যয় না করে নতুনভাবে এ ব্যবস্থা চালু করা দরকার। বিদ্যমান স্কিমগুলো সংস্কারের অংশ হিসেবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদার প্রমাণভিত্তিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে উদ্যোগের সূত্রপাত করা যেতে পারে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ, ত্রুটি হ্রাসও একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বিদ্যমান কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতার প্রভাব মূল্যায়ন করা আবশ্যক। শক্তিশালী ও টেকসই অর্থায়ন কৌশলের মাধ্যমে প্রাপ্য সুবিধাসমূহ ধীরে ধীরে বাড়ানো উচিত। সরকারের রাজস্ব ব্যয় ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার সংমিশ্রণে একটি সুবিন্যস্ত সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অবধারিতভাবে একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা ও সুপরিকল্পিত সময়সীমার মধ্যে এ খাতে বরাদ্দসমূহ বাড়াতে হবে। করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির (সিএসআর) মাধ্যমে বেসরকারি তহবিলেরঅবদান রাখার বিষয়টি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। জেলা পর্যায়ে কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হলে তা শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সহায়ক হবে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের বিষয়ে সহায়তা করা সম্ভব হবে। এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়বে এবং তাদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাদির মুখাপেক্ষী থাকা লাগবে না। সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টিকে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের একটি মৌলিক অনুঘটক হিসেবে দেখা উচিত।

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত উপকারভোগীদের সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ ও বাছাইকরণে সময়ানুগ হালনাগাদ ব্যবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডারপ্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউএসপি

কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে অগ্রগামীপ্রযুক্তিগত উপকরণের সুযোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া ইউএসপি কর্মসূচি সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আইনি সুরক্ষা দিতে হলে একটি সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করতে হবে, যে আইন প্রণীত হবে নাগরিকের অধিকার ও সম্ভ্রমের বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে। সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সংগত সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে পারবে, ফলত বিষয়টি 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না' এ মূলনীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষারয়েছে, তা অর্জনের পথে প্রধান অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে।

ইউএসসির বাস্তবায়ননাগরিকদের অধিকার ও অধিকারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি টেকসই ব্যবস্থাকে আইনি ভিত্তি প্রদান করবে এবংএকটি সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়নে সহায়তাকরবে। ইউএসপি স্কিমেরবাস্তবায়ন কাউকে পিছিয়ে না রেখে বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সংগত সমাজ বিনির্মাণেরপথ প্রশস্ত করতে পারে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নত দেশে উত্তরণে বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষাঅর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউএসপি স্কিমকে একটি গুরুত্বপূর্ণহিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

৮

জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক অভিঘাতসমূহ মোকাবিলা

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

পেনহোল্ডার

ইশতিয়াক বারী
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক
ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ড. এ আতিক রহমান
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ

ফারাহ্ কবির
কান্ট্রি ডিরেক্টর
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ

ড. হাসীব মুহাম্মদ ইরফানুল্লাহ্
ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসালটেন্ট- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও গবেষণা ব্যবস্থা
এবং ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)

ড. মোঃ গোলাম রব্বানী
প্রধান, ক্লাইমেট ব্রিজ ফান্ড সেক্রেটেরিয়েট
ব্র্যাক

ড. মোঃ নাজমুস সাদাত
অধ্যাপক, ফরেস্ট্রি এন্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ নাজমুস সাদেকীন
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মিজান আর. খান
উপ পরিচালক
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইসিসিসিএডি)

পার্থ হেফাজ সেখ
পরিচালক- পলিসি ও অ্যাডভোকেসি
ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

শরীফ জামিল
নির্বাহী পরিচালক
ব্লু প্ল্যানেট ইনিশিয়েটিভ

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী ভৌগোলিক অবস্থান, নিম্নাঞ্চলীয় ভূমিরূপ, বড় বড় নদীর অবস্থান ও নদীতীরবর্তিতা এবং উপকূলীয় বেষ্টনী ও দূরবর্তী প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম সর্বাধিক জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ দেশে পরিণত হয়েছে। এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত নানা রূপে হচ্ছে। জলবায়ুর স্বভাবে ঘনঘন পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে এখানে গ্রীষ্মের দিনগুলোয় তাপমাত্রার ঐতিহাসিক গড়ের তুলনায় ক্রমবর্ধমান হারে গরম অনুভূত হতে থাকবে। একই সঙ্গেবছরের মোট সময়ের মধ্যে গরমের দিনগুলোর স্থায়িত্ব আরও বাড়বে। নির্ধারিত সময়ের তুলনায় দেরিতে বর্ষা শুরু হওয়া এবং স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সময়কালব্যাপী বর্ষাকাল স্থায়ী হওয়া বর্তমানে খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ুগত বিভিন্ন পরিমাপের ক্ষেত্রে এমন অদ্ভুত ও অনিশ্চিত বৈচিত্র্য বর্তমানে খুব ঘনঘন সংঘটিত হচ্ছে এবং এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোয় আকস্মিক বন্যা, সাধারণ বন্যা ও নদীভাঙন; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওরবেষ্টিত জেলাসমূহে আকস্মিক বন্যা ও বজ্রপাত; উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোয় খরা বৃদ্ধি পাওয়া; দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোয় জলাবদ্ধতা; দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও দমকা হাওয়া এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত উল্লিখিত দ্রুত ও ঘনঘন ঘটমান দুর্যোগ (বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) ও ধীরগতিতে দৃশ্যমান দুর্যোগসমূহ (সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ইত্যাদি) নানাভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আর এমনসব দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে নারী, শিশু, তরুণ-তরুণী, নদীনির্ভর জীবিকা নির্বাহকারী মানুষ ও উপকূলীয় এলাকার কৃষক। এসব পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যেও আবার অপেক্ষাকৃত বেশি অসুবিধার শিকার হচ্ছেন শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম মানুষ ও ট্রান্সজেন্ডার (হিজড়া)/রূপান্তরিত লিঙ্গ জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়; কেননাতাদের জীবনে সুনির্দিষ্ট অসুবিধা রয়েছে এবং তাদের দুর্যোগ-সহনশীলতার মাত্রা কম। অপর্যাপ্ত সম্পদ, দুর্যোগকবলিতদের সহায়তা কার্যক্রমের দুর্বলতা এবং দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ প্রশমনে অভিযোজনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তহবিলের অভিলভ্যতার সীমাবদ্ধতার কারণে দুর্যোগের বিরূপ প্রভাবের মাত্রা দীর্ঘায়িত হয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের মতো ধীরগতির দুর্যোগের ফলাফলসমূহ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলার কৃষকদের মাঝে বেশি প্রতিভাত হচ্ছে। এর ফলে তাদের চাষাবাদের ধরন পরিবর্তন করতে হচ্ছে বেশি মুনাফার আশায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এতে ফসলহানির শঙ্কা থেকে যায়। এ বিষয়টি উল্লিখিত অঞ্চলের কৃষি কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিবর্তন আনয়ন করছে। এর ফলে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য কৃষকদের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ কৃষকদের অধিকতর লবণাক্ততা-সহিষ্ণু আবাদের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে। কিন্তু ফসলের এসব নতুন জাতের উৎপাদনশীলতা অপেক্ষাকৃত কম। দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকার কৃষকদের একটি অংশ লবণাক্ততার কারণে তাদের আবাদি জমি বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করা কৃষকদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং তারা নিজেরা চিংড়ি ঘেরের শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ, যাদের সুন্দরবনের আশপাশের জেলাগুলোয় বসবাস, তারা চরম মাত্রায় লবণমুক্ত ও নিরাপদ পানীয় জলের অভাবের শিকার। উচ্চ মাত্রার লবণাক্ততার কারণে প্রজননক্ষম বয়সের নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং কিশোরী ও তরুণীদের স্বাস্থ্য ও অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দুই দশক ধরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ ঘনঘন শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ও দমকা হাওয়া মোকাবিলার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। আইলা, সিডর ও আমফানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ তাদের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনদের হারিয়েছেন। একই সঙ্গে তাদের কৃষিজমি ও ঘরবাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অনেকে এখনো

চরম দুর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন এবং ঋণের জালে আটকে আছেন। দুর্যোগে ঘরবাড়ি ও গৃহস্থালি হারিয়ে এসব মানুষের অনেকে আশপাশের চর ও সুন্দরবন-সংলগ্ন ভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী আরও বেশি মাত্রায় ধারাবাহিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকিতে নিপতিত হয়েছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোর জনসমষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অবকাঠামোগত ক্ষয়-ক্ষতি ও আবাসস্থলের অন্যান্য কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মুখোমুখি হয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্য প্রভাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গাছপালার বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া এবং জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে মাড়াই মৌসুমে ফসলহানি বৃদ্ধি পাওয়া ও দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা (চর্মরোগ সংশ্লিষ্ট) দেখা দেওয়া।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অধ্যুষিত জেলাগুলোর মানুষ সাম্প্রতিক সময়ে অধিকতর ঘনঘন ও তীব্র মাত্রার আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এই বন্যার ফলে কেবল তাদের ফসল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য আয়-রোজগারেই ক্ষতিসাধন হয়নি, বরং তাদের অনেকে দৈনন্দিন ব্যয় মেটানোর তাগিদে গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক মাত্রায় পানীয় জলের উৎসগুলো দূষিত হওয়ায়বিশেষত নারী ও শিশুরা নানা ধরনের পানিবাহিত রোগের শিকার হচ্ছে। ফলত এ অঞ্চলগুলোতেশিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নদীরওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বন্যার কারণে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। নদীভাঙনের কারণে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষ ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হওয়ায়তাদের কৃষিজমি সংকুচিত হয়ে পড়ে, ঘরবাড়ি বিলীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ব্যবসা-বণিজ্য, দোকানপাট ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি হয়। সাধারণত বর্ষাকালীনবন্যারপরবর্তী সময়ে এই নদীভাঙন সংঘটিত হয়। যেসব মানুষের জীবিকা আন্তঃসীমান্ত নদীর ওপর নির্ভরশীল, নদীতে অনিয়মিত পানিপ্রবাহের কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। উদাহরণস্বরূপ, আন্তঃসীমান্ত নদী তিস্তা ও এর উপনদীগুলোর ওপর নির্ভরশীল কৃষি কার্যক্রম ও নৌ-চলাচল অনিয়মিত পানিপ্রবাহের কারণে ব্যাপকভাবে বিঘ্নিতহয়। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের মানুষ তীব্রভাবে অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহের সংকটেভোগেন। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পানির কারণে তারা ঘনঘন আকস্মিক বন্যার শিকার হন।

এর বিপরীতে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় চরম মাত্রায় খরার শিকার হন। ফসলের জমিতে সেচদান ও পোকামাকড় দমনে তাদের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আশপাশে বসবাসকারী মানুষজনের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে তারা পর্যাপ্ত মাত্রায় সুপেয় পানির প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রার তীব্রতার কারণে মানুষের দেহেপানিশূন্যতা দেখা দেয় বিধায় সাম্প্রতিক সময়ে তীব্র গরমজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে এ অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাওয়া, অকালে ফসল হানি, জীবিকার সুযোগ হারানোএবং পরিবারের সদস্যদের নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এর ফলে কখনো কখনো পারিবারিক পর্যায়ে সহিংসতা ও দ্বন্দ্বের হার বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্ভোগের শিকার হন, কারণ বিরূপ প্রভাবসমূহ মোকাবিলার এবং শহর বা অন্য কোনো স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার সক্ষমতাও তাদের থাকে না। ফলতনিজ আবাসস্থলে অবস্থান করেই তাদের উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে হয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের মতো ধীরগতির দুর্যোগের উপস্থিতি বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার এক কোটি ৩০ লাখেরও বেশি (১৩ মিলিয়ন) মানুষের জীবন ও জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এর ফলে অনেকেই নগরও নগরের উপকণ্ঠেস্থানান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছেন, অথবা বনভূমির লাগোয়া জমিতে আশ্রয় নিচ্ছেন। এই নগরগুলোতেস্থানান্তরে মানুষের জটলা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ণ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এতে করে নগরেদারিদ্র্য ও অপুষ্টির হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপর্যুক্তবিষয়সমূহ সম্ভাব্যসামাজিক সংহতিকে বিঘ্নিত করতে পারে এবং শহুরে বস্তিগুলোয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সদ্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্বাস্তুদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির বিষয়টিকে উৎসাহিত করতে পারে। গবেষণায়দেখা গেছে, জলবায়ুর অভিঘাতজনিত কারণে স্থানান্তরের শিকার মানুষ প্রায়ই ব্যাপকমাত্রায় মানবপাচারের শিকার হন।

অন্যদিকে মানববসতি স্থাপনের জন্য সীমাহীনমাত্রায় বনভূমি দখল করা হলে বাস্তুতন্ত্রের ভরসাম্য বিনষ্ট হতেপারে। এই সমস্যা আরও বেশি ক্ষতির কারণ হবে, কারণ বাংলাদেশে বনভূমিমোট ভূমির মাত্র ১০.৭ শতাংশ । যদিও বাংলাদেশ বৈশ্বিক মোট কার্বন নিঃসরণের মাত্র ০.৪৮ শতাংশের জন্য দায়ী, তবুদেশটি বিশ্বের সর্বাধিক মাত্রায় জলবায়ু উপদ্রুত অঞ্চলগুলোর অন্যতম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১.৩২ শতাংশ। বৈশ্বিক পর্যায়ে খুবই ক্ষুদ্র কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে কোনো প্রকার শর্ত ছাড়া জাতীয়ভাবে স্বনির্ধারিতঅবদান (এনডিসি) রাখার মাধ্যমে বিদ্যমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেরআওতায়কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ৬.৭৩ শতাংশ কমিয়ে আনার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । ২০৩০ সালের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে এ নির্গমন ১৫.১২ শতাংশ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেশটি দিয়েছে। এই অনুষঙ্গে ও এনডিসির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননাএসডিজির অনেক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

এনডিসির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারকে (জিওবি) ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে ধাবিত হওয়ার (বটম আপ অ্যাপ্রোচ) নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতেহবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্থানীয় পর্যায়ের অভিঘাতগুলো ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলোর বিষয়ে গভীর জ্ঞানের ঘাটতি বিদ্যমান। আরও যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজন ও প্রশমন উভয় ক্ষেত্রেই নানা কর্মসূচি ও নীতি গ্রহণে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সঠিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা । অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্বলতাগুলো মোকাবিলার পরিপ্রেক্ষিতে আটটি নীতির ওপর ভিত্তি করে স্থানীয়ভাবে প্রণোদিত অভিযোজন (এলএলএ) পদ্ধতি প্রয়োগ করেজলবায়ুর প্রভাবজনিত অভিঘাতগুলো মোকাবিলার বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে। সমষ্টিগতভাবে ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিকঅভিঘাতসমূহ মোকাবিলার উপায় চিহ্নিত করতে এলএলএ'র সঙ্গে সংযুক্ত স্থানীয় জলবায়ু ব্যবস্থাপনাপদ্ধতি নতুন সুযোগ করেদিয়েছে। একটি প্রশংসাপত্রে/স্বাগত পত্রে বাংলাদেশ সরকার এলএলএ'র গুরুত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। একটি অর্থপূর্ণ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগ রেখে বাংলাদেশের 'জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি) ২০২৩-৫০'- এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহের আবির্ভাব ও সেগুলো মোকাবিলার গুরুত্ব বিবেচনায় এই নীতি বিবৃতির উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের যেসব স্থানিকঅভিঘাত বাংলাদেশকে প্রভাবিত করছে, সেগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ তুলে ধরা; উপস্থাপিতসুপারিশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অসুবিধাসমূহকে মনোযোগের কেন্দ্রে স্থাপন করা ।

২. সুপারিশমালা

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় (২০২৩-৫০) উল্লেখিত উদ্যোগসমূহবাস্তবায়ন করতে হবে এবং জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এগুলোর সন্নিবেশ ঘটানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজনে পরবর্তী ২৮ বছরের (২০২৩-৫০) জন্য এনএপি বাংলাদেশের প্রাথমিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ কাঠামোয় ভূমিকা রাখছে। এনএপিতে ছয়টি সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: ক) জলবায়ু পরিবর্তন থেকে উৎসারিত অভিঘাতসমূহ ও জলবায়ু প্রণোদিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ প্রতিরোধ নিশ্চিত করা; খ) খাদ্য, পুষ্টি ও জীবিকার নিরাপত্তায় জলবায়ুর অভিঘাতেসহনশীল কৃষির উন্নতি ঘটানো; গ) উন্নততর নগর পরিবেশ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় জলবায়ুর ঘাতসহনশীল শহরের বিকাশ সাধন;ঘ) বনসম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও জনসম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সমস্যার সমাধানসমূহের সম্প্রসারণ; ঙ) পরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রক্রিয়ায় অভিযোজনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সুশাসনের সূত্রপাতকরা; এবং চ) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (সিসিএ)-এর জন্য রূপান্তরমুখী সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও উদ্ভাবন নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশের **১১**টি জলবায়ু উপদ্রুত অঞ্চলে বাস্তবায়নের জন্য এনএপিতে মোট **১১৩**টি উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রায় ২০ লাখ কোটি টাকা (২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান) অর্থায়ন প্রয়োজন পড়বে,যার ৭৫ শতাংশই প্রয়োজন হবে ২০৪০ সালের মধ্যে।

অঞ্চলভিত্তিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীনির্ভর অভিযোজন উপায় চিহ্নিত করতে হবে এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন দ্বারা উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সেসব উদ্যোগ সম্প্রসারণ করা যায় কি না, তার সম্ভাব্যতা আমলে নিতে হবে/যাচাই করতে হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্ভাবিত বেশকিছু সংখ্যক অভিযোজন পদ্ধতির দেখা মেলে। উপদাহরণস্বরূপ, দেশের উত্তরাঞ্চলে স্থানীয় মানুষ ছোট ছোট নদীর ভাঙন কমিয়ে আনা ও ভাঙনপ্রবণ এলাকায় কৃষিজমি পুনরুদ্ধারের জন্য দেশি বাঁশের কাঠামোয় 'বান্দাল' তৈরি করে থাকেন। এছাড়া 'বাইরা' বা ভাসমান কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়, যা একটি ঐতিহ্যগত কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কচুরিপানা ও অন্যান্য জলীয় উদ্ভিদ স্তূপ করে ফসল উৎপাদনের জন্য ভাসমান জমিন তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতি মানুষের আয় বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলাবদ্ধতার বিরুদ্ধে ঘাতসহনশীলতা প্রতিষ্ঠায় স্থানীয়দের শক্তি জোগায়। নদীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে বান্দালের মতো কাঠামো কার্যকর কিনা সে বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (আরআরআই) বর্তমানে তিনটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালনা করছে। এই প্রকল্পগুলোর একটি ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায়। অন্যদিকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ভাসমান কৃষিকে বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ঐতিহ্য ব্যবস্থা (জিআইএএইচএস) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় অঞ্চলভেদে জলবায়ু প্রভাবের ভিন্নতার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়ে সে অনুযায়ী উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে স্থানীয়ভাবে প্রণোদিত অভিযোজন সমাধানকে আরও বেশি সম্প্রসারণ করতে হবে।

হাওর এলাকায় বসবাসকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিতে বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিশেষ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।

হাওরের বাস্তুতন্ত্র অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। কেননা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাওরের প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিবর্তিত হয়। শুষ্ক মৌসুমে জলমগ্ন এলাকার মানুষ জমি চাষ করার সুযোগ পান। কিন্তু পানিপ্রবাহের মৌসুমে এ এলাকার অধিকাংশ জমি পানির নিচে চলে যায় এবং পুরো এলাকা মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ হাওর অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণের জন্য জলমহাল ইজারা দেওয়ার আইনি কাঠামো রয়েছে। এর ফলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তজলমহালের নিকটস্থ মানুষ সেখানে মাছ ধরতে যেতে পারেন না। এ বিষয়টি ওইসব মানুষের জীবিকার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বলা যায়, উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার কালে হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিশেষ সহায়তা হস্তান্তরে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

লবণাক্ততা ও খরাপ্রবণ এলাকার মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পানীয় জলের নিশ্চয়তা বিধানে সংরক্ষিত এলাকার আওতা বাড়াতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও ইউনিসেফের এক যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচির (জেএমপি) প্রতিবেদনের তথ্যমতে, জনগোষ্ঠীর ৪১ শতাংশ তথা বাংলাদেশের ৬ কোটি ৮৩ লাখ (৬৮.৩ মিলিয়ন) মানুষ এখনো যথাযথভাবে ব্যবস্থিত পানীয় জলের অভিগম্যতা থেকে বঞ্চিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট লবণাক্ততার

অনুপ্রবেশ ও উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সেখানে ক্রমবর্ধমান হারে স্বচ্ছ পানির/নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ কমে যাচ্ছে। অধিকন্তু অনেক এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আরও নিচে নেমে গেছে। এর ফলে শ্যালো মেশিন ও গভীর নলকূপে ঠিকমতো পানি উঠছে না। এক্ষেত্রে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিকল্প পানির উৎস হয়ে উঠতে পারে বৃষ্টির জল ও পুকুর। লবণাক্ততা প্রতিরোধে বিভিন্ন স্থানীয় সমাধানও কাজে লাগানো যেতে পারে; যেমন: বৃষ্টির পানি ধরে রাখা এবং সমুদ্রের পানি লবণমুক্ত ও বিশুদ্ধ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহস্থালির কাজে সরবরাহ করা। যাহোক, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে আইনে সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে সেসব অনুশাসন অনুসরণ করতে হবে। বন উজাড়ীকরণ প্রতিরোধ এবং জলাশয় থেকে বালি ও পাথর উত্তোলন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় লক্ষ্যনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশের কৃষিনীতিতেও এসব বিধান অনুসরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব অনুধাবনে একটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সূচনা করতে হবে। এ ধরনের সমীক্ষা আগামীদিনে জলবায়ু-সংক্রান্ত প্রকল্পের নকশা প্রণয়নে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করবে। অর্জিত অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রাপ্ত এইসব জ্ঞানকে/বিদ্যাকে প্রদর্শন দৃশ্যমান করতে হবে।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) গঠিত হওয়ারপর থেকে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ তহবিলে মোট ৩,৯৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে ১,৪৪৭ কোটি টাকা রিজার্ভ হিসেবে গচ্ছিত রেখে ২,৫০৭ কোটি টাকা ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৮৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ধারণাগত বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন খাতে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ । মোট বরাদ্দের ৫৯ শতাংশই এ খাতে বরাদ্দকৃত। বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে এর পরের অবস্থানে রয়েছে কার্বন প্রশমন ও স্বল্পমাত্রারকার্বন নিঃসরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন খাত। এ খাতে রয়েছে বরাদ্দের ২৩ শতাংশ। এর বাইরে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে দেওয়া হয়েছেবরাদ্দের ১৩ শতাংশ; গবেষণা, সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৬ শতাংশ এবং সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে দেওয়া হয়েছে ১ শতাংশ। এ তহবিলের বাস্তবায়ন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে ব্যাপককোনো মূল্যায়ন হয়নি, যার মাধ্যমে ব্যবহৃততহবিলের দক্ষতা এবং তহবিলের অর্থে গৃহীত প্রকল্পগুলোর স্থায়িত্ব ও তহবিল ব্যবহারের দায়বদ্ধতার বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। বিসিসিটিএফ-এর অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও সেগুলো থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর একটি ব্যাপক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার এখনই উপযুক্ত সময়। যে উদ্দেশ্যে প্রকল্পগুলো গৃহীত হয়েছিল, তার নিরিখে বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েএর মূল্যায়ন হওয়া উচিত। এ ধরনের অনুশীলনের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিতে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ওপর এরপ্রভাব নিরূপণ।

বৈশ্বিক পরিসরে ক্ষতিপূরণের জন্য দরকষাকষির লক্ষ্যে কার্বন নিঃসরণ পরিস্থিতির প্রতিবেদন আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করা এবং বন সম্পদ থেকে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক সুবিধার মূল্যায়নেরজন্য 'বনের বাস্তুতন্ত্র মূল্যায়ন'-এর ওপর একটি বিস্তৃত/ব্যাপক সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বন পরিবেষ্টিত/বনসংলগ্ন ভূমির পরিমাণ ১০.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। যদিও বাস্তব সত্য হলোদেশের মোট ভূমির ১৭.৫ শতাংশ বনভূমি হিসেবে চিহ্নিত (এর মধ্যে সামাজিক বনায়নের আওতাভুক্ত ভূমিও অন্তর্ভুক্ত)। বনভিত্তিক বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবা মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বনসম্পদের ওপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণেওগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বনাঞ্চলএক অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে সুবিদিত। একই সঙ্গে এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব থেকে সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ প্রতিরোধেও জোরালো ভূমিকা রাখে। এর সবকিছুরই অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে, যেগুলোর হিসাব হওয়া উচিত এবং

নীতিমালা প্রণয়নে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অমূল্য ও সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সূক্ষ্ম বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও এই পর্যালোচনার/অনুশীলনের মধ্যে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। বনকেন্দ্রিক বাস্তুতন্ত্রের অর্থনৈতিক মূল্যমান নির্ধারণ করা হলে সেটি বনজ সম্পদ সংরক্ষণের আর্থ-সামাজিক ও বাস্তুতান্ত্রিক সুফলের বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের অবহিত করতে সহায়তা করে। এ বিষয়টি উত্তর-প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও টেকসই ভবিষ্যৎ তৈরি করার বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিতে নীতিনির্ধারকদের উদ্বুদ্ধ করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জাতীয়ভাবে সৃষ্ট 'লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি' পরিমাপের জন্য সমীক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে।

জলবায়ু-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনায় লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নতুনভাবে গুরুত্বসহ আলোচনায় উঠে এসেছে। অবশেষে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নতুন সহায়তা তহবিল সৃষ্টির বিষয়ে ২০২২ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সপ্তবিংশ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে (কপ২৭) একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে ইউএনএফসিসিসি। যেসব দেশ নির্দিষ্টভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে দুর্ভোগের শিকার তাদের জন্যই এ তহবিল। জলবায়ু উপদ্রুত ক্ষয়ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধার এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের প্রতি সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। তবে এ তহবিল পরিচালনার পদ্ধতি এবং অর্থ হস্তান্তরের শর্তাবলি এখনো চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এ বিষয়ে আগামী কপ২৮-এ একটি সুপারিশ তুলে ধরার লক্ষ্যে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট আপৎকালীন/ক্রান্তিকালীন কমিটি গঠন করা হয়েছে (২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে)। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের উচিত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের 'লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতির' মূল্যমান প্রাক্কলনের জন্য একটি সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালনা করা। এটি করতে পারলে বাংলাদেশ ক্ষতিপূরণ আদায়ের দরকষাকষিতে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের উপাত্ত ও প্রমাণভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করতে পারবে।

একটি জলাশয় ব্যবস্থাপনাকৌশল পরিকল্পনা আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

ভৌগোলিকভাবে একটি স্বতন্ত্র নিষ্কাশন এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে ভূমি, উদ্ভিদ জগৎ ও পানিসম্পদের একটি সমন্বিত ব্যবহারের বিষয়টি জলাশয় ব্যবস্থাপনা (ডব্লিউএম) হিসেবে পরিচিত। এ বিষয়টি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ও উপকূলীয় এলাকার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত একটি ব-দ্বীপকেন্দ্রিক সমভূমি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হওয়ার কারণেসম্ভবত পার্বত্য চট্টগ্রামের উঁচু এলাকার জন্য বাংলাদেশে নির্দিষ্ট কোনো জলাশয় ব্যবস্থাপনা কৌশল বা পরিকল্পনা নেই। যেসব জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকার জন্য এই জলাশয়যুক্ত বাস্তুতন্ত্র এবং এই পানিতে অভিগম্যতার ওপর নির্ভরশীল, বর্তমানে তারা জলজ বাস্তুতন্ত্রের ধারাবাহিক ক্ষয়প্রাপ্ততার কারণে চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণভিত্তিক জলাশয় বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে বাংলাদেশ সরকারের উচিত জরুরি ভিত্তিতে একটি জলজ বাস্তুতন্ত্র কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এই উদ্যোগ গ্রহণ দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

জলজ আবহাওয়াবিদ্যার বৈচিত্র্য অনুসারে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের মানোন্নয়ন, পর্যালোচনা ও রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ।

বাংলাদেশে জল-আবহাওয়াবিদ্যার বৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহের গুণগত মান নিয়ে অব্যাহতভাবে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞাত নীতিকৌশল প্রণয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার জন্য এই উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর

অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ক্ষতিকর দিকগুলো হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেনিয়মিত ভিত্তিতে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত মান ও লবণাক্ততার ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ ও পরিবীক্ষণ পরিচালনা করার বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের নানা সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করা এবং সেগুলো কোন পরিস্থিতিতে কোথায়প্রয়োগ হবে, তা নির্ধারণে বাংলাদেশ সরকারেরকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা গ্রহণ করা উচিত। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপাত্তের সমন্বয় সাধনের জন্য এ বিষয়টি বিশেষভাবে জরুরি।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সঞ্চালন, গৃহায়ন, পরিবহন এবং জলবায়ু বান্ধব কৃষি সমাধান খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ।

নবায়নযোগ্য উৎস থেকে জ্বালানি উৎপাদনের পাশাপাশি অধিকতর কার্যকরভাবে সবুজায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নতুন সুযোগ এনে দিতে পারে। এ ধরনের রূপান্তর বিশেষভাবে তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক-সংখ্যক পরিবেশবান্ধব/প্রতিবেশ-বান্ধব চাকরি সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে সরকার ও বেসরকারি খাতের উচিত সবুজায়নের জন্য আরও অধিকসংখ্যক যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের মোট জ্বালানি চাহিদার ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে পূরণের জাতীয় প্রতিশ্রুতি অর্জনে কেবল জ্বালানি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম স্থাপনেই বিনিয়োগ করতে হবে ১৯.২ থেকে ৩৭.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ সংগ্রহের জন্য আরও অধিক মাত্রায় বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন পড়বে। প্রয়োজনীয় সংস্কার উদ্যোগের উদ্ভাবনকে উৎসাহিতকরণ এবং খাতনির্দিষ্ট জলবায়ু-বান্ধব সমাধান দক্ষতা সম্প্রসারণের জন্যও এ ধরনের সহযোগিতা আবশ্যক।

স্রেডার অধীনে গৃহীত নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে করতে হবে।

উৎপাদন সক্ষমতার মধ্যে মাত্র ৩.৫ শতাংশ নবায়যোগ্য শক্তিভিত্তিক। ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ সরকার দেশের মোট শক্তির ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎসের মাধ্যমে উৎপাদনের এক আশাবাদী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তবে এর আগে ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা অর্জিত হয়নি। সেই ব্যর্থ অবস্থানের ওপর ভিত্তি করেই নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অতীতের ওই অভিজ্ঞতার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে টেকসই ও নবায়নযোগয় জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)-এর অধীনে চলমান সৌরপার্ক ও বায়ুবিদ্যুতের প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন তালিকাভুক্তি নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ খাত প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে আরও ত্বরান্বিত করবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ এখন জলবায়ু পরিবর্তনের যে ঝুঁকিরয়েছে, তা প্রশমনেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। অধিকন্তু 'নেট মিটার' ভিত্তিক প্রকল্পগুলো চালু করার বিষয়টিকে উচ্চতর নীতিগত অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই অগ্রাধিকারের মূল লক্ষ্য হবে পরিচালন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার অভিলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং মানবসম্পদের সক্ষমতা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা। বাংলাদেশ সরকারকে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির সকল প্রকল্পে যেন ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বর্জ্য নিষ্কাশনেরসুব্যবস্থা থাকে।

অবৈধ বালি উত্তোলন এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিবেশগত মূল্যায়ন ব্যতিরেকে যাতে কাউকে বালি উত্তোলনের বিষয়ে আইনগতভাবে অনুমতি দেওয়া না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

দেশের নির্মাণ খাতে বর্তমানে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ। আবাসন খাতেও একই হারে প্রবৃদ্ধি চলমান। এমন বাস্তবতায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বালির চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে

চলমান অবৈধ বালি উত্তোলন কার্যক্রম চলমান থাকলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীভাঙনের বিষয়টি আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। বালি উত্তোলনের চলমান বাস্তবতায় জীবনযাত্রার ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব অব্যাহতভাবে দৃশমান হচ্ছে। সেকারণে কোনো প্রকার কালবিলম্ব না করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। একমাত্র যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিবেশগত মূল্যায়ন সম্পন্ন করার পরই কাউকে বালি উত্তোলনের বিষয়ে আইনগতভাবে অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। এ ধরনের অনুমোদনের মাধ্যমে সরকার যে রাজস্ব পাবে, তা স্থানীয় নদীনির্ভরজনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমে ব্যবহার করতে হবে।

বাংলাদেশে দূষণ ব্যবস্থাপনায় জরিমানা নীতি চালু করতে হবে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সরকার প্রথম কার্বন ট্যাক্স আরোপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও এই করের কাঠামো, বিধিমালাও কর নির্দিষ্টকরণের বিষয়গুলো অনেকটা দ্ব্যর্থকতাবাচক/দ্ব্যর্থ, সীমাবদ্ধতার দোষে দুষ্ট, এমনকি এর সুযোগসমূহও পরস্পরবিরোধী, তা তত্ত্বেও সরকার যে দূষণকারীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের বিষয়ে তৎপর হয়েছে, সেটি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশে বায়ু ও পানিদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশের দূষণ ব্যবস্থাপনার নিরিখে 'দূষণকারীর থেকে জরিমানা আদায়' নীতি বাস্তবায়নে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি বিষয় হিসেবে গণ্য/উপস্থিত হয়েছে। এমন উদ্যোগ বায়ু ও পানিদূষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের প্রক্রিয়া প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দূষণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক করারোপের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, করের অর্থ দিয়ে যেন সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত দূষণের ক্ষতি পোষানো যায়। বায়ু ও পানির গুণগত মানোন্নয়ন করা গেলে তা নিঃসন্দেহে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যের জন্য সুফল বয়ে আনবে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে শিশু, নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠী।

জটিল পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলায় আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর পানি বণ্টনে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মিয়ানমারের সঙ্গে তিনটি এবং ভারতের সঙ্গে ৫৪টি অভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে বাংলাদেশের। বড় তিনটি নদীর প্রবাহ এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশ, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল শুষ্ক মৌসুমে তীব্র পানি সংকটের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। পানি সংকটের সমস্যা সবচেয়ে প্রকট রূপ পরিগ্রহ করে কৃষি সেচ কার্যক্রমে এবং আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোয় নৌযান চলাচলের ক্ষেত্রে। অধিকন্তু পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও পরিবেশগত মান অবনমন আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এটি প্রাকৃতিক জলাধারের উৎপাদনশীলতাও কমিয়ে দিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। চুক্তি সম্পাদনের আলোচনা শুরুর উদ্যোগ নিতে দেরি করলে এসব নদীর ওপর যেসব মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল, তাদের বিদ্যমান দুর্ভোগ আরও বেশি তীব্র হবে। এতে অনেক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েঅন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হবে। এই বিষয়টি যে মাত্রায় গুরুত্বের দাবিদার, সেই মাত্রায় যদি গুরুত্ব দেওয়া না হয়, তাহলে জলবায়ুকেন্দ্রিক নানা ধরনের দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে এসব মানুষ যে সংগ্রাম করে চলেছে, তা আরও বেশি কঠিন হয়ে উঠবে।

বৈশ্বিক উদ্যোগের অধীনে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য যথাযথ নথিপত্র, প্রণয়ন, প্রস্তাব তৈরি ও প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে একটি বিশেষায়িত শাখা/দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এটি সুবিদিত যে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী উন্নত দেশগুলো জলবায়ু কার্যক্রমবাড়াতে নির্দিষ্ট হারে বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলে আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো থেকে

জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোকে পৃথক করার বিষয়ে বৈশ্বিক জনমত গঠনে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব প্রদানের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। অতীতে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলের (সিজিএফ) মতো উৎসের অর্থে বাংলাদেশের অভিগম্যতা ছিল না। এর কারণ হচ্ছে এই অর্থ পাওয়ার জন্য যেসব শর্ত অনুসরণ করে একটি প্রস্তাব তৈরি করা দরকার, সেই ধরনের প্রস্তাব তৈরির সক্ষমতা বাংলাদেশের ছিল না। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের সমস্যায় আর পড়তে না হয়, সেজন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনএকটি স্বতন্ত্র অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যে অধিদপ্তরের কাজ হবে জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত বৈশ্বিক তহবিলের অর্থে অভিগম্যতা পাওয়ার জন্যযথোপযুক্ত দলিলাদি, উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করা। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান জলবায়ু-বিষয়ক আলোচনা ও দরকষাকষিতেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। উন্নততর আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে ন্যূনতম যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে জলবায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে/দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

জলবায়ু প্রভাবিত অভিবাসী/বাস্তুহারা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলো পূরণকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি অনুঘটকদের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে জলবায়ু-সংক্রান্ত বিষয়ে শলা-পরামর্শ প্রদানে বেসরকারি অনুঘটকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু নীতির বিস্তার সাধন ও বাস্তবায়নে দেশের নাগরিক সমাজ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ও অন্যান্য বেসরকারি পরামর্শকরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বাংলাদেশ সরকারের উচিত তাদের সেই ভূমিকার আমলে নেয়া। জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও শলা-পরামর্শ প্রদানে এবং এসব কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের উচিত এসব বেসরকারি সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা। সম্ভাব্য জলবায়ু প্রভাবিত উদ্বাস্তু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য বেসরকারি এসব পরামর্শকদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি পরামর্শকদেরঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা গেলে বাংলাদেশের পরিবেশগত স্থায়িত্বের বিষয়টি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে উত্থাপন এবং জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য বৈশ্বিক তহবিল থেকে অর্থায়ন সংগ্রহের প্রক্রিয়া সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া সহজ হবে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলোর প্রতি সংবেদনশীলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিকল্পিত উপায়ে সম্পদ বরাদ্দ প্রদান এবং এ-সংক্রান্ত কৌশল প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

ওপরে উপস্থাপিত দৃঢ় সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের উচিত স্থানীয়ভাবে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমকে সহায়তা দেওয়া এবং উদ্ভাবনী কাজে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। সরকারের উচিত এমন একটি প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা, যেখানে দুর্দশাগ্রস্ত নারী ও তরুণ জনগোষ্ঠী তাদের স্থানীয় জলবায়ু প্রভাবের পরিস্থিতি তুলে ধরতে পারেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও চ্যালেঞ্জগুলোর ক্ষেত্রে তাদের শঙ্কামোকাবিলায় সম্ভাব্য পরামর্শ দিতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ অত্যন্ত বহুমাত্রিক এবং বিভিন্ন ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলভেদে এ প্রভাবের রূপও ভিন্ন। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোয় এ রূপ ধরা পড়ে আকস্মিক বন্যা, মৌসুমী বন্যা ও নদীভাঙনের মধ্য দিয়ে; উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের হাওর-অধ্যুষিত জেলাগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তনের রূপ প্রকাশ পায় আকস্মিক বন্যা ও বজ্রপাতের মাধ্যমে; উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আসে খরার মাধ্যমে; দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে দেখা দেয়জলাবদ্ধতার মাধ্যমে; দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে প্রকাশিত হয় ঘূর্ণিঝড় ও দমকা হাওয়ায়এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এটি প্রকাশ পায় লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। স্থানীয় চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় স্থানভিত্তিক উপায় উদ্ভাবনে জোর দিতে হবে। দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা আবশ্যক। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর ঘটানো অবশ্য করণীয় একটি বিষয়। অনুরূপভাবে টেকসই

উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে জ্বালানি সামর্থ্যও অর্জন করতে হবে। রূপান্তরমুখী অভিযোজন প্রক্রিয়ায় ঘাতসহনশীলতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে বাস্তুহারা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রসঙ্গনির্ভর/প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক দক্ষতার বিকাশসাধন এবং জলবায়ুবান্ধব উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের বিচারে কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না (এলএনওবি)' শীর্ষক যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা বাস্তবায়নে এ পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে উৎসারিত স্থানিক ভঙ্গুরতাসমূহ মোকাবিলায় স্থানভিত্তিক জলবায়ু গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা একটি নতুন প্রাপ্তির দিগন্ত/বাতায়ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৯

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নির্মূলীকরণে আইন ও বিচারপদ্ধতির ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

অ্যাডভোকেট সালমা আলী
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ)

পেনহোল্ডার

এম বি আখতার
উন্নয়নকর্মী ও জেন্ডার বিশ্লেষক

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

আশরাফুন নাহার মিষ্টি
নির্বাহী পরিচালক
উইমেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডব্লিউডিডিএফ)

ড. আয়েশা বানু
অধ্যাপক, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বনশ্রী মিত্র নিয়োগী
ডিরেক্টর- প্রোগ্রামস
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)

জিনাত আরা হক
প্রধান নির্বাহী
আমরাই পারি জোট

জলি নূর হক
পরিচালক, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লার্নিং
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল

ড. মালেকা বানু
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

নবনীতা চৌধুরী
পরিচালক
জেন্ডার, জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি (জিজেডি) এবং প্রিভেন্টিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন ইনিশিয়েটিভ
ব্র্যাক

ড. শাহনাজ হুদা
অধ্যাপক, আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি
অর্থনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২০২১ সালের বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ০.৭১৯ যা এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে অন্যতম। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকেও বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সপ্তম স্থানে। প্রকৃতপক্ষে গত ৫০ বছরের বিবেচনায় বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশি সময় সরকার প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

তবুও নারীর অধিকারের প্রায়োগিক দিকটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগের জায়গা হিসেবে রয়ে গেছে। বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ এবং নারী আন্দোলনকারীরা নারী অধিকারের এবং অক্ষমতাসহ ব্যক্তি-অধিকারের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থেকে নানা পন্থায় সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রত্যাশাকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছে। তারা জোরালো কণ্ঠেসামাজিকভাবে ও যৌনতার দিক থেকে প্রান্তিক নারী সম্প্রদায় ও অক্ষম নারীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে নিয়োজিত থেকেছে। বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হল বিরাজমান লিঙ্গ বৈষম্য, যা বিভিন্নভাবে বিরাজমান; যেমন, পারিবারিক সহিংসতা, সড়কে এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, ধর্ষণ ও বৈবাহিকসূত্রে ধর্ষণ এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে মজুরি বৈষম্য যেখানে একই কাজের জন্য পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেতন স্বল্প। নারী এবং অল্পবয়সী মেয়েরা যখন বিচার প্রক্রিয়ার সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয় তখন তাদের ভাষা-প্রকাশের অক্ষমতার কারণে অতিরিক্ত সমর্থনের জন্য দোভাষীর সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে, দরকার হয় পরিবারের অনুকূল এবং বাচিক ও ব্রেইল সহায়তার। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বর্তমানে বাংলাদেশের কোট কাছারিতে এসব সুবিধা পাওয়া যায়না। প্রতিবন্ধকতা এবং এবং আইনের বাস্তবায়নের নানা ফাঁক-ফোকরেরকারণে তারা ন্যায়বিচার পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এবং একই সঙ্গে আইন প্রয়োগের দীর্ঘসূত্রিতার ন্যায়-বিচার প্রাপ্তির সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত হন। বাংলাদেশে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা। বিশেষ করে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর নারীদের জন্য প্রগতিশীল ও ব্যাপক আইনি সুরক্ষার অনুপস্থিতির কারণেনারীর প্রতি বৈষম্য এবং সহিংসতা অব্যাহত থাকছে। । এই পটভূমিতে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সমাজের অনগ্রসর অংশের নারীরা, যাদের মধ্যে রয়েছে নিম্ন আয়ের গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, হিজড়া, লিঙ্গ রূপান্তরিত নারী-পুরুষ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

আইনি পরিবেশ

বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ১০, ধারা ১৯ (১) ও ১৯ (৩)-এ সবক্ষেত্রে নারীদের সমভাবে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ধারা ২৭-এ স্পষ্ট করা হয়েছে, আইনের চোখে সবাই সমান। ধারা ২৮ (১)-এ বলা হয়েছে, নাগরিকের ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য করবে না। ধারা ২৮ (২)-এ সরাসরি ও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে। ধারা ২৮ (৪)-এ নারীর পক্ষে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করার পক্ষে বলা হয়েছে। সংবিধানের মূলধারার/মৌলচেতনার আলোকে বাংলাদেশ সরকার নারীর প্রতি বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা বন্ধে বেশ কিছু বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে দণ্ডবিধি ১৮৬০, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২, এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০। পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা দিতে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও দমন) আইন ২০১০। বাংলাদেশ সরকার ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশকেও কার্যকর/সক্রিয়/অনুমোদন/প্রণয়ন করেছে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইনি কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনুধাবন করে ২০০৯ সালে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন যুগান্তকারী এক রায় দেন। এই রায়ে প্রতিটি কর্মস্থল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইনি কাঠামো অনুসরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সহিংসতা থেকে নারীর সুরক্ষায় বেশ কিছু নীতি ও পরিকল্পনাও

নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২২ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতি ২০১৩।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে ২০১৩ থেকে ২০২৫ সালের জন্য, এর মধ্যে রয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ-নকশা। এই পরিকল্পনায় সমন্বয়, অগ্রাধিকার এবং কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের বিষয়ে বলা হয়েছে। পরিকল্পনায় এ বিষয়ে অগ্রগতি মূল্যায়নের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) অনুমোদন করেছে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর। তবে মুসলিম শরিয়া আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ব্যাখ্যা দিয়ে সনদের অনুচ্ছেদ ২, ১৩.১ (এ), ১৬.১ (সি) এবং (এফ)-এর ক্ষেত্রে আপত্তি রেখে দেওয়া হয়। তবে ১৯৯৭ সালে সিডও সনদের পারিবারিক সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ১৩ (এ) এবং সমান অবিভাবকত্ব সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ১৬.১ (এফ) সংরক্ষণ তুলে নেওয়া হয়। এ ছাড়াও উল্লেখ করা প্রয়োজন, নারী-পুরুষ এবং ছেলে-মেয়ের সমতা ও সুযোগ নিশ্চিতকরণে ১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলনে যে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ খাত চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেগুলোর ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অন্যতম লক্ষ্য ও অভীষ্ট হচ্ছে লিঙ্গ সমতা অর্জন। ‘কাউকে পেছনে রেখে নয়’ এই চেতনার বাস্তবায়নে এবং এসডিজির লক্ষ্য ও অভীষ্ট অর্জনে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের সুরক্ষায় বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

আইনগত দিক থেকে চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনি কাঠামোয় যথেষ্ট উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে। লিঙ্গ অধিকার সম্পর্কিত নীতি ও আইন বাস্তবায়ন পদ্ধতিতেও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বিদ্যমান আইন এবং আইনি কাঠামোর প্রধান উদ্বেগ ও সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	আইন/বিধি	বাধাসমূহ
১	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (প্রথমবার ২০০৩ সালে এবং ২০২০ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয়বার সংশোধিত) এবং দণ্ডবিধি ১৮৬০	বাধাগুলো নিম্নরূপ: • ধর্ষণের সংজ্ঞায় স্পষ্ট করা হয়নি। বলাৎকার, হিজড়াদের ধর্ষণ এবং বিবাহসূত্রে কৃত/বৈবাহিক ধর্ষণকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। • ১৪ বছর আগে আইন কমিশনের তৈরি করা খসড়ায় ভুক্তভোগীর এবং সাক্ষীর সুরক্ষার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। • আদালতে ভুক্তভোগীর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে প্রতিপক্ষের আইনজীবীদের বাধা দেওয়া হয়নি। • ধর্ষণের সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারকদের বিবেকবোধকে প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এটি সাজার সমানুপাতিকতার বিরুদ্ধে যেতে পারে। • ধর্ষণ থেকে বেঁচে যাওয়া ভুক্তভোগীকে আদালতের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়ন না। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠনের কথাও বলা হয়নি।

ক্রমিক নং	আইন/বিধি	বাধাসমূহ
		• দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ধারা ৩৭৫, ৩৭৭-এর বিষয়ে রয়েছে নিম্নলিখিত উদ্বেগ: ➢ ধর্ষণের অপরাধের মামলায় যৌনমিলন বুঝাতে সঙ্গম শব্দকে যথেষ্ট মনে করা হয়। ➢ স্ত্রীর বয়স তের বছরের কম না হলে, একজন পুরুষ তার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করলে তা ধর্ষণ নয়। ➢ উপর্যুক্তবিধান থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে যৌনমিলনে সম্মতির বয়স ১৪ বছর। কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন ২০০০-এর ধারা ৯ অনুযায়ী, যৌনমিলনে সম্মতির বয়স ১৬ বছর। যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ➢ ধর্ষণের সংজ্ঞা শুধুমাত্র নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এক্ষেত্রে শুধু নারীগামীতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষ এবং ছেলেদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞার্থ নেই। ➢ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ নারীদের জন্য বিবাহের বয়স ১৮-এ উন্নীত করেছে। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বিয়ের বৈধ বয়স যৌনমিলনের সম্মতির বয়স থেকে আলাদা। ➢ ধারা ৩৭৭ পুরুষদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে অপরাধ বলে গণ্য করে এবং সেখানে সম্মতি ও সম্মতিহীন ধর্ষণের মধ্যে পার্থক্য করে না। • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী, ধর্ষণের পর হত্যা এবং গণধর্ষণ-এর জন্য (ধারা ৯ (২) এবং ৯ (৩) অনুযায়ী) দোষী সাব্যস্ত ধর্ষকদের আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা ন্যূনতম ১ লাখ টাকা হতে হবে। আদালত কখনই এর বেশি জরিমানা আরোপ করে না, যা ইঙ্গিত করে এই পরিমাণটি ভিত্তি জরিমানার বদলে সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে মাত্র ৬ দশমিক ৮ শতাংশের ক্ষেত্রে এই জরিমানা ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণে রূপান্তরিত হচ্ছে। ➢ নারী এবং অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে যারা প্রতিবন্ধী, তারা আইনি-সহায়তা না পেয়ে অধিকার বঞ্চিত হয়। কারণ উল্লিখিত আইনে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিবন্ধী সম্পর্কে কোনো কিছুই নির্দেশ করা হয়নি।

ক্রমিক নং	আইন/বিধি	বাধাসমূহ
২	পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০	• আইনটি নিজেই পারিবারিক নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না। বরং এটি নির্যাতনের ভুক্তভোগীদের জন্য গতানুগতিক পন্থায় অপব্যবহারের মাধ্যমে শুধু পারিবারিক নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করে। • আইনের শাসন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং সেবা প্রদানকারী এমন একটি সমাজে বসবাস করেন যেখানে বহু মানুষের মধ্যেই পারিবারিক নির্যাতনকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা রয়েছে। • যথাযথ প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং এবং লিঙ্গসংবেদনশীলতা ছাড়া এই আইনের সম্ভাব্য সুবিধাগুলো ব্যবহার করা কঠিন। • সরকার এবং সেবা প্রদানকারীরা আইনটি প্রচারে যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছে না। বাংলাদেশে ৬৬ শতাংশেরও বেশি নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয় এবং পারিবারিক নির্যাতনের শিকার এই ৭২ শতাংশই বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ করে না।
৩	বাংলাদেশের ব্যক্তিকেন্দ্রিক/ব্যক্তিগত আইন	ব্যক্তিগত আইন একজন ব্যক্তিকে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, দত্তক গ্রহণ, বংশগতি, অভিভাবকত্ব এবং উত্তরাধিকারের মতো বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব আইনের বাধাগুলো নিম্নরূপ: • মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি বাংলাদেশের বেশ কিছু জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব জীবনে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক রীতি অনুসরণ করে। • বাংলাদেশের সংবিধান সব নাগরিকের ধর্মের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয় এবং প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে পৃথক ব্যক্তিগত/নিজস্ব আইন অনুযায়ী জীবনযাপনের স্বাধীনতা দেয়। যদিও এটি সংবিধানের ২৮ (২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও জনজীবনে নারী ও পুরুষ সমান সুবিধা ভোগ করবে। তবে এতে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়টির উল্লেখ নেই।

ক্রমিক নং	আইন/বিধি	বাধাসমূহ
		• বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু বিবাহ 'শরীয়ত ও শাস্ত্রীয়' ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে একজন হিন্দু নারী পারিবারিক আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের দাবি করতে পারেন না, তবে একজন মুসলিম নারী বিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্তির জন্য মুসলিম বিবাহ আইন ১৯৩৯-এর বিধানকে ধন্যবাদ দিতে পারেন। • বাংলাদেশে খ্রিষ্টান ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী, পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন জেলা আদালত বা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়ের করতে হয়। এমনকি জেলা আদালত অনুমতি দিলেও হাইকোর্ট থেকে তা নিশ্চিত হতে হয়, তবে ৬ মাসের আগে না। • মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ (নিবন্ধন) আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। ২০১২ সালে, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন প্রণীত হয়েছিল, তবে ঐ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক। • ব্যক্তিগত ধর্মীয় আইনে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এটি দেশের বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা শাস্তিযোগ্য। • অভিভাবক ও (নাকি পোষ্য?) প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ অনুসারে, শুধুমাত্র একজন পুরুষই একটি সন্তান দত্তক নিতে পারে, কোনো নারী তা পারে না। একজন নারীর শুধুমাত্র তার স্বামীর সম্মতিতে দত্তক নেওয়ার অধিকার রয়েছে। • হিন্দু আইনে অসবর্ণ/আন্তবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ। এটি সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। • মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুসারে, আনুষ্ঠানিক দত্তক নেওয়া ইসলামিআইনে স্বীকৃত না হওয়ায় দত্তক নেয়া সন্তান আইনি অভিভাবকের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অধীনে, দত্তক পুত্র দত্তক নেয়া পিতামাতার উত্তরাধিকারী হতে পারে।
৪	যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮	• কনের পরিবারের কাছ থেকে উপহারের ছদ্মবেশে বা অন্য কোনো নামে যৌতুককে আমাদের সমাজে সামাজিকভাবে ন্যায্যতা দেওয়া হয়েছে ছে। • একজন নারীকে পরিবারের বোঝা বিবেচনা করে যৌতুককে প্রায়ই ন্যায্যতা দেওয়া হয়।

ক্রমিক নং	আইন/বিধি	বাধাসমূহ
৫	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২	• মানব পাচার এবং পাচার সম্পর্কিত দুর্নীতির ক্ষেত্রে জটিলতা এবং পাচারকারীদের দায়মুক্তি বাংলাদেশের জন্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। এসব অপরাধ মোকাবিলায় আইনের প্রয়োগও দুর্বল। • রাজনৈতিক ও আর্থিক বিবেচনার কারণে বিচারের জন্য মামলা নির্বাচনও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।
৬	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭	• ১৮ বছরের কমবয়সী শিশুদের বিবাহ ক্ষতিকারক এবং বৈষম্যমূলক। এটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। তবে যে নতুন আইনটি ১৯২৯ সালের আইনকে প্রতিস্থাপন করেছে তাতে কম বয়সে বিবাহের বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে অনিবার্য পরিস্থিতিতে এবং পিতা-মাতার সম্মতি এবং আদালতের অনুমতিক্রমে কম বয়সে বিবাহ হতে পারে।
৭	সালিশ আইন ২০০১ এবং দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ	• বর্তমানে দেশের বিচার ব্যবস্থার জটিলতা এবং প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হওয়ায় ব্যবসায়িক বিরোধ এবং জমিজমা সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। • দক্ষ ও সনদধারী মধ্যস্থতাকারী ও সালিসকারী না থাকায় নারীরা সালিশি প্রক্রিয়ায় সুবিধাবঞ্চিত থেকে যায়। • দেশের আইনি ব্যবস্থায় প্রচলিত না হওয়ায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহার হয় না। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রায়শই ভুক্তভোগীর চেয়ে অভিযুক্তদের বেশি সুবিধা দেয়। • মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫'র অধীনে পারিবারিক বিষয়গুলোতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত কিছু ফৌজদারি অপরাধ যেমন ধর্ষণ বা হত্যার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি অকার্যকর হলেও এটি কখনও কখনও সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

ক্রমিক নং	আইন/বিধি	বাধাসমূহ
৮	পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫	• আইন অনুযায়ী, পারিবারিক আদালতের বিচারক হবেন সহকারী বিচারকেরা। এরপরেও বেশির ভাগ পারিবারিক আদালতে আলাদা আদালত কক্ষ এবং পৃথক বিচারক নেই। ফলে, পারিবারিক মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হতে অনেক বছর সময় লাগে। • এই আদালত মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যেখানে (নাকি বংশগতি?) উত্তরাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা, পারিবারিক নির্যাতনের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই। • নির্ধারিত ক্ষমতা না থাকায় পারিবারিক আদালত প্রায়শই ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার এবং বিবেকবোধের ভিত্তিতে প্রতিকার দিতে ব্যর্থ হয়। • এই আইনটি সব ধর্মের মানুষের জন্য প্রযোজ্য কী না সে বিষয়ে অধ্যাদেশটিতে স্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই। শুধু মুসলিম পরিবারগুলোই এই আইনের সুবিধা নিতে পারে।
৯	যৌন হয়রানি সংক্রান্ত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশবলি	• সরকার এখনও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ও প্রতিরোধ আইনে যৌন হয়রানি র সংজ্ঞার্থ পুনর্নির্ধারণ করতে পারেনি। • কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত হাইকোর্টের যৌন হয়রানি বিরোধী নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না, এমনকি অভিযোগের একটি বড় ক্ষেত্র হলেও পোশাক কারখানাগুলোতেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। • নির্দেশনায় 'যৌন হয়রানি' শব্দটির আইনি সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়নি। কমিটি গঠন, নিষেধাজ্ঞা ও তদন্তের বিধানও বিশদ করা হয়নি।
১০	প্রস্তাবিত বৈষম্য বিরোধী বিল ২০০২	• আইনমন্ত্রী ২০২২ সালের ৫ এপ্রিল-এ বিলটি সংসদে উপস্থাপন করেন। বিলটি বর্তমানে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে রয়েছে। এ বিলের উদ্বেগের বিষয়গুলো/এখানকার বাধাগুলো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	আইন/বিধি	বাধাসমূহ
		• বৈষম্য একটি ফৌজদারি অপরাধ কি না সে বিষয়টি আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। • আইনটি বিভিন্ন ধাপ তৈরি করেছে, যা একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য (পর্যায়ক্রমে যেমন জেলা, বিভাগীয় এবং জাতীয় ফোরাম) অতিক্রম করতে হবে। • কোন আদালতের কাছে যেতে হবে এবং যদি কেউ আদেশ বা রায় মেনে না নেয়, তবে কী শাস্তি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে কেন আরেকটি পৃথক তদারকি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন, তা স্পষ্ট নয়। যারা বৈষম্যের সম্মুখীন হয় তাদের যথাযথ প্রতিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনটি খুবই সীমিতভাবে কার্যকর হবে। আইনটি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বিধি প্রণয়নের প্রসঙ্গটি বারবার বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা না করেই দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বিধি প্রণয়ন করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

যেসব সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে

- সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্কার/অতিকথা/গোঁড়ামি, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ও অনুশীলন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নারীর সতীত্ব/কুমারীত্ব, নারীর নিরাপত্তার চেয়ে পারিবারিক সম্মানের সুরক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, নারী ও শিশুদের শাসন ও নারীর চলাফেরার নিয়ন্ত্রণে পুরুষের কর্তৃত্ব এবং বাল্যবিবাহকে মেনে নেওয়া ইত্যাদি। এইসব রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ পুরুষের কতৃত্বকে ন্যায্যতা দেয় এবং এই মানসিকতাই বৈবাহিক ধর্ষণসহ অন্যান্য নির্যাতনে অবদান রাখে।

- মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর ধারা ৭ (৬)-এ হিল্লা বিবাহকে বেআইনি ঘোষণা হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগ ২০০০ সালের রিট পিটিশন নং ৫৮৯৭-এর রায়ে বলেছেন, হিল্লা বিবাহ সম্পর্কিত ফতোয়া কার্যকর করা দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৪৯৪, ৫০৮ ও ৫০৯ ধারা এবং ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের ৭ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে হিল্লা বিয়েকে নারীর প্রতি শোষণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এই প্রথাটি বেশি প্রচলিত।

- নারীদের চলাফেরা, স্বাধীনতা ও পছন্দের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ও সামাজিক 'ফতোয়া' ব্যবহার করা হয়। একটি পিটিশনের যুক্তি-তর্কে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়া নির্দেশনা মোতাবেক বেআইনি শাস্তি যেমন, চাবুক মারা, বেত্রাঘাত করা এবং জনসম্মুখে অপমান রোধে সরকার সক্রিয়ভাবে সাড়া দিচ্ছে না।

- নাগরিক হিসেবে কন্যা শিশুদের সমঅধিকার নিয়ে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা বাল্যবিবাহ এবং পারিবারিক নির্যাতন। পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বেড়েই চলেছে।

১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৬২ দশমিক ৮ শতাংশ নারীর ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায় (মিকস ২০১২-১৩)। কোভিড-১৯-এর সময়ে বাল্যবিবাহের হার এবং পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।

- লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়নের অভাব এবং অসমতার কারণে প্রায়শই ভুক্তভোগী নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত থাকে, প্রতিশোধের শিকার হওয়ারএবং অর্থনৈতিক নির্ভরতার ভয়ে।

- অপর্যাপ্ত সহায়তা ব্যবস্থা না থাকার   নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য অভিগম্য ও সংবেদনশীল সহায়তা সেবার অভাব দেখা যায়। সঠিক সহায়তা সেবা যেমন, কাউন্সেলিং, আশ্রয়কেন্দ্র, চিকিৎসা ও পরিচর্যার অনুপস্থিতি তাদেরকে অভিযোগ জানাতে নিরুৎসাহিত এবং অবমাননার ঘটনায় সহায়তা চাওয়া থেকে বিরত রাখে।

- নারীর প্রতি সহিংসতা এবং বৈষম্য অবসানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং আদালতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাসঙ্গিক আইনের যথাযথ ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি কৌশলী, পুলিশ কর্মকর্তা এবং বিচারকেরা নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে:

  - বিচার ব্যবস্থার বিচার্য বিচারিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত সময়ে তদন্ত এবং অভিযোগপত্র ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বাধার মধ্যে রয়েছে আদালত নিয়ে আতঙ্ক, আইনজীবীদের অনিয়ন্ত্রিত ফি এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মোট ৪৩ হাজার ১১৪টি মামলা পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন ছিল।

  - বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে মেডিকেল পরীক্ষা আরেকটি অতিরিক্ত বাধা।

  - বিবাহ, তালাক, বিচ্ছেদ, দত্তক, উত্তরাধিকার এবং বংশগতি সম্পর্কিত বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইনগুলো নারীদের অবমাননাকর বৈবাহিক জীবনে এবং দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করছে।

  - আইনি সহায়তা প্রদান বিধিমালা ২০০১- এর সংশোধনীর ফলে সহিংসতার শিকার নারীদের বিচার ব্যবস্থায় অভিগম্যতার পথ প্রশস্ত হয়েছে। তবে এর বাস্তবায়ন এখানে মূল বিষয়।

- সার্বজনীন অধিজগতে (Public Domain?) প্রয়োজনীয় উপাত্তের তথ্য প্রাপ্যতার অভাব থাকায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি এবং আইনি ব্যবস্থার কারণে নারীরা যেসব বৈষম্য ও সহিংসতার মুখোমুখি হয়, সেগুলো চিহ্নিত করা যায় না।

- সম্পদের অপর্যাপ্ততা, বিশেষ করে আর্থিক এবং মানবসম্পদের অভাব থাকায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আইনি প্রতিষ্ঠান এবং সহায়তা সংস্থাগুলোর ঘাটতি থাকে।

- দুর্বল আইনি কাঠামোর বিষয়টি যেসব আইনে অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বিচারকার্যে সেসবের প্রতিফলন ঘটে। আইনগত ত্রুটি এবং ধারাবাহিকতার অভাব প্রায়শ অপরাধীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব থাকায় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, ব্যবহারজীবী/ আইন পেশাজীবী এবং সহায়তা প্রদানকারীদের নারীর প্রতি সহিংসতার মামলা সংবেদনশীলতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে সামলানোর দক্ষতা নেই।

- বিচার প্রক্রিয়ার ধীর গতি আদালতগুলোর ওপর প্রায়শ অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে এতে সময়ক্ষেপণ ঘটে। আইনি প্রক্রিয়া ব্যয়বাহুল্যের শিকার হয়। এটি প্রায়শই ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে আইনি পদক্ষেপ নিতে নিরুৎসাহিত করে। এই বিলম্ব ভুক্তভোগীদের আরেক দফা মানসিক পীড়নের মুখোমুখি ধাবিত করতে পারে।

- বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, এনজিও এবং সহায়তা প্রদানকারীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় আংশিক/খণ্ডিত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

- ভৌগোলিক অভিগম্যতার অভাব আইনি সেবা, আদালত এবং সহায়তা সংস্থাগুলোর কাছে নারীদের পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী নারীদের জন্য এই সমস্যাটি বেশি প্রকট।

২. সুপারিশমালা

নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য নির্মূল/দূর করার জন্য তিনটি ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি: (i) বিদ্যমান আইনি কাঠামোরে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা, যা যথাযথ আইন ও নীতি গ্রহণে সাহায্য করবে। যেগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ হলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। (ii) আইন কার্যকর এবং নীতি বাস্তবায়নের সময় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো বিবেচনায় রাখা এবং ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা। (iii) লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থী সকল নারীর জন্য বিচারকে সহজলভ্য ও অভিগম্য করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা আমলে নিতে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো তুলে ধরা হলো:

- সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিগুলি সংস্কার করুন। শাস্তির বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল, সংস্কারমূলক এবং প্রতিরোধমূলক দিকগুলোকে সমন্বিত করে বিদ্যমান আইন ও নীতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করতে হবে। অনুচ্ছেদ ১-এ বর্ণিত উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলোকে আমলে নিতে হবে। ব্যক্তিগত আইন পর্যালোচনা করুন। বিশেষ করে বহুবিবাহ, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের ন্যায়বিচারে সমান অভিগম্যতা এবং নারীর নিরাপত্তা ও জীবিকার প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে যেসব বৈষম্যমূলক আচরণ রয়েছে সেগুলো অপসারণ করুন। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে একজন নারীর বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির সমান অংশের অধিকারি নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের সমান অভিভাবকত্বের অধিকার দিতে হবে। একটি সমন্বিত পারিবারিক বিধির মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করুন, মনে রাখতে হবে, এটি বাংলাদেশের একটি সিডও প্রতিশ্রুতিও।

    - দেওয়ানি আইন সংশোধন এবং 'পারিবারিক আদালত'-এর সক্ষমতাকে শক্তিশালীকরুন, যাতে তালাকের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরেই নারীরা দেনমোহরের টাকা পেতে পারেন।

    - দণ্ডবিধি ১৮৬০এর বিধি ৪৯৩-৪৯৫ অনুসারে, ভুক্তভোগীকে আইনজীবী নিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হয় না।। এর জন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রাসঙ্গিক বিধান পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রেএকটি উদারমনা দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক।

    - বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এ বিশেষ পরিস্থিতিতে বাল্যবিবাহের অনুমতি দেওয়ার বিধানটি অবিলম্বে বাদ দেওয়া দরকার, কারণ এই বিধানের প্রায়ই অপব্যবহার হয়।

    - বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০- এর অধীনে সাজার হার মাত্র ৩ শতাংশ। এই পরিস্থিতি বদলাতে বিচার দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

- দণ্ডবিধি ১৮৬০-এ 'ধর্ষণ'-এর সংজ্ঞার্থ পর্যালোচনা করুন এবং পুনরায় একে সংজ্ঞায়িত করুন। 'বৈবাহিক ধর্ষণ', অল্পবয়সী ছেলেও পুরুষদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ' এবং 'বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়যুক্ত ব্যক্তিদের' যৌন হয়রানির বিষয়গুলো বিশদ করুন।

- অন্ততপক্ষে বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) এবং ডিএনএ পরীক্ষাগার স্থাপন করুন। ভুক্তভোগী এবং অপরাধী উভয়ের জন্যই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-কে আইনে রূপান্তরের উদ্যোগ নেন।

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর অধীনে দায়ের করা মামলাগুলোর বিষয়ে দ্রুত লিঙ্গ সংবেদনশীল তদন্ত নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশের বিশেষ তদন্ত দল গঠন করুন। অনেক আগের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, প্রতিটি পুলিশ স্টেশনে নারী পুলিশ কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার এবং সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিচার কার্যক্রম চলার সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিগম্যতা ও আনুষঙ্গিক সহায়তা নিশ্চিত করুন।

- যেখানে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত মামলায় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সঙ্গী/সঙ্গীনীকেও আনুষ্ঠানিক নোটিশ প্রদানের বিধান রয়েছে। , মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর এই বিধানটি কার্যকর করুন।

- একটি সমন্বিত উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন করুন, যেটি ধর্মীয় পরিচয় ব্যতিরেকে নারীদের তাদের পিতামাতার সম্পত্তিতে ন্যায্য অংশ দাবি করার সুযোগ দেবে।

- হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে, সরকারের উচিত 'যৌন হয়রানি' অপরাধের সঠিক সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন'-এ অবিলম্বে একটি নতুন ধারা অন্তর্ভুক্ত করা। অনলাইনে যৌন হয়রানি এবং সাইবার হয়রানিকেও যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা এবং আইনে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

- সারা দেশের চলমান কাজ পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার (ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড সার্ভিস) প্রধান কার্যালয় এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সক্ষমতা প্রদান এবং চাহিদা মোতাবেক মানবসম্পদ নিয়োগ করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন ও উপজেলা আইনগত সহায়ক কমিটিগুলোকে জরুরিভিত্তিতে সক্রিয় করতে হবে।

- অভিবাসী সম্পর্কিত সব বিষয়কে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসুন, যাতে অভিবাসী কর্মীদের সমস্যাগুলোকে আরও ভালোভাবে সমন্বয় এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়। নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মজুরি বৈষম্য ও বিরোধ নিরসনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

- স্থানীয়ভিত্তিক বেআইনি/অবৈধ সালিশ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা দরকার। এই ব্যবস্থায় যে সাজা দেওয়া হয় তা আইনের অধীনে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা উচিত এবং এটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

- চিহ্নিত সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিয়ে এবং বিদ্যমান মনোভাব/আপত্তি সংরক্ষণ প্রত্যাহারসহ সিডও-র চাহিদাগুলো পূরণ করে বৈষম্য বিরোধী বিল ২০২২ পাস করুন।

- সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং লিঙ্গভিত্তিক গৎবাঁধা/বাঁধাধরা /প্রথাগত ধারণাগুলো ভালোভাবে সামলাতে পুলিশ, বিচারক এবং সরকারি কৌশলীদের জন্য বিচার/ বিধানতান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন করুন। তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের লিঙ্গভিত্তিক গৎবাঁধাধারণার প্রভাব এবং নিপীড়নের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

- জাতীয় পর্যায়ে জবাবদিহি পদ্ধতি/ব্যবস্থা জোরদার করুন। নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের সহিংসতামুক্ত জীবন নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে এবং বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কৌশলে অনুমোদন বা সম্মতি দিয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের উচিত এগুলোর অগ্রগতির বিষয়ে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ তথ্যপত্র তুলে ধরা এবং জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমে তা প্রকাশ করা।

- 'আশ্রয়কেন্দ্র' এবং 'ওসিসি'-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। এখন পর্যন্ত দেশে নারীদের জন্য ৩৬টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এর বেশির ভাগই মহানগরগুলোতে অবস্থিত। ফলে গ্রামাঞ্চলের নারীদের সেখানকার ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পৌঁছানোই কঠিন। বিশেষ করে মহানগর এলাকার বাইরে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। এগুলোর ন্যূনতম মানের সেবা দেওয়ার সক্ষমতা এবং স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থার অধীনে কাজ করা উচিত।

- লিঙ্গ সমতার জন্য বিনিয়োগ এবং অর্থায়ন বৃদ্ধি করুন । নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত সমস্যা মোকাবিলায় নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোর সক্ষমতা জোরদার করতে সরকারি বাজেট এবং বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

- এসডিজির ওপর গুরুত্বারোপ করুন। লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার এবং লিঙ্গ সমতাজনিত সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা এবং এই প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের পৃথক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। সরকারের উচিত নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা, যাতে লিঙ্গ বৈষম্যের বাস্তব পরিস্থিতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

- 'ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা' নিশ্চিত করুন। ন্যায়বিচারের অভিগম্যতাকে মূলত একটি কার্যকর পরিবেশ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেখানে কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের আইন এবং বৈশ্বিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পাওয়া এবং অভিযোগের সমাধানের মধ্য দিয়ে প্রতিকার খুঁজতে ও পেতে সক্ষম হয়। নিম্নলিখিত বাধাগুলো অপসারিত হলে ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে:

  - সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ন্যায়বিচারে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে আইনি ও পদ্ধতিগত বাধাগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং আইন সংশোধন, পর্যাপ্ত আনুষাঙ্গিক সহায়তা ও সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে এগুলোর সমাধান করতে হবে।

  - ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বাড়ানোর বিষয়টি বিচার ও আইনি ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার ওপরেও নির্ভর করে। এ জন্যপুলিশ, চিকিৎসা-আইন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং বিচার বিভাগীয় সত্তাগুলোকেস্বীকৃতি দিতে হবে।

  - ন্যায়বিচারের প্রাপ্যতা বাড়াতে নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করতে ব্যবস্থা নিন। আইনি সহায়তা সেবা সহজলভ্য এবং আইনি সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারকে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

- মুসলিম পারিবারিক আইন একই নারী বা পুরুষকে পুনরায় বিয়ে করার অনুমতি দেয়। পারিবারিক আইন অনুযায়ী, হিল্লা বিয়ের জন্য জোর করা শাস্তিযোগ্য। এসব বিধান কার্যকর করা দরকার।

■ সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে নারী আন্দোলন গড়ে তুলুন এবং প্রচারাভিযান চালান। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা সকলের কর্তব্য। শক্তিশালী ও সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং সংহতি আন্দোলন, নারীবাদী কার্যক্রম ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রচারণার মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা ও লিঙ্গ বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। এই পটভূমিতে জবাবদিহি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব।

■ দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করুন। দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া একজন ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে ন্যায়বিচার পাওয়া নিশ্চিত করতে পারে। এতে অন্যায়কারীরা তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য তাৎক্ষণিক পরিণতির মুখোমুখি হবে ফলে এটি সম্ভাব্য অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক হিসেবেও কাজ করতে পারে। সম্ভাব্য অপরাধ প্রতিরোধে এবং অপরাধের হার কমাতে এটি সাহায্য করতে পারে।

■ ভৌগোলিক দুরত্ব/অবস্থান নির্বিশেষে/বিবেচনায় সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করুন। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার আইনি/বিচার প্রক্রিয়ায় এবং আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অভিগম্যতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রায়সময়ই প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখিন হন। এইপরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক অঞ্চল নির্বিশেষে আইনি সেবা, সহায়তা ব্যবস্থা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সব ব্যক্তির অভিগম্যতা নিশ্চিত করুন। ন্যায়বিচার ও সমতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি অপরিহার্য।

■ চাহিদামাফিক ক্যামেরা ট্রায়াল অবলম্বনের সুযোগ নিশ্চিত করুন। সম্ভাব্য সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো বিবেচনা করে ধর্ষণের মতো সংবেদনশীল মামলার ক্ষেত্রে ক্যামেরা ট্রায়ালের বিধান রাখুন। বিচার কার্যক্রমের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে জড়িত সব পক্ষের অধিকার, মর্যাদা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণে আলোকোপাত করা উচিত। এ ক্ষেত্রে ধর্ষণ মামলার বিচারের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সাত দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

■ শিশুর-অধিকার নিশ্চিত করুন। সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি শিশুকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করুন, যাতে তাদের অধিকার সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

সব ধরনের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বন্ধের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মূল অনুষঙ্গ লিঙ্গ সমতা এবং লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার। নারীদের অধিকার সুরক্ষায় এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে এই নীতিবিবৃতিতে নারী-অধিকার এবং লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন প্রসঙ্গে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ এবং পদক্ষেপের কথা উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায়, নীতিনির্ধারক ও রাজনৈতিক দলগুলো এসব উদ্বেগের বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেবেন এবং এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর উদ্যোগ নেবেন।

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়গুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে। নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের প্রতি সহিংসতা এবং পিতৃতান্ত্রিক প্রথা নির্মূলে আন্তর্জাতিক প্রটোকলের স্বাক্ষরকারী বাংলাদেশ। নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার ঘটনাকে সমাজে ন্যায্যতা দেয় এবং নারীর অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন সামাজিক গৎবাঁধা রীতি ও লিঙ্গভিত্তিক চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ জানানো অত্যন্ত জরুরি।

লিঙ্গ বৈষম্য কমানো এবং শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃত। এসব অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে পারিবারিক নির্যাতনের হার, নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের প্রতি বৈষম্য এবং বাল্যবিবাহের হার তুলনামূলকভাবে কেবল বেশী নয়, উদ্বেগজনকভাবে সেই হার বাড়ছে। এই অগ্রহণযোগ্য প্রবণতা বন্ধে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম নিতে হবে। ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সব নাগরিকের সমান সুযোগ তৈরি না থাকলে বাংলাদেশের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। কারণআমাদের সমাজের নারীদের অতিরিক্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তাই তাদের উদ্বেগ ও আগ্রহের খাতগুলোর দিকে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। আইনি সহায়তা প্রদান এবং তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো এবং সংহতি আন্দোলন ও সচেতনতা বাড়াতে প্রচারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারীর নিরাপত্তা বিধানে ও নারীর অধিকার সুরক্ষায় সামাজিকভাবে নারী ও অল্পবয়সী/বালিকাদের মেয়েদের প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতার নীতি নিতে হবে। এটি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের।

১০

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অভিগম্যতা ও ন্যায়বিচার

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

জাকির হোসেন
প্রধান নির্বাহী
নাগরিক উদ্যোগ

পেনহোল্ডার

ফারহান হোসেন জয়
প্রধান গবেষক
ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসেস (ডিএসএস)

সুলতান মোঃ সালাউদ্দিন সিদ্দিক
মনিটরিং অ্যান্ড রিপোর্টিং অফিসার
নাগরিক উদ্যোগ

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অমিয় প্রাপন চক্রবর্ত্তী (অর্ক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ধ্রুবতারা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
(ডিওয়াইডিএফ)

ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. ফস্টিনা পেরেরা
সিনিয়র ফেলো, সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

নির্মল রোজারিও
প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটি
বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

নিরূপা দেওয়ান
সাবেক সদস্য
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
(এনএইচআরসি)

পল্লব চাকমা
নির্বাহী পরিচালক
কাপেং ফাউন্ডেশন

রানী ইয়ান ইয়ান
উপদেষ্টা, চাকমা সার্কেল
এবং
আদিবাসী মানবাধিকার রক্ষাকর্মী

ড. রঞ্জন সাহা পার্থ
অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সঞ্জীব দ্রং
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

বিপুলসংখ্যক আদি নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আবাসভূমি/আবাসস্থল বাংলাদেশে। এই বাতাবরণ বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। তবে এসব সম্প্রদায় নানা ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের কারণেআরও বেশি প্রান্তিকতার শিকার হচ্ছেন। বিভিন্ন গণপরিষেবা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অভিগম্যতাও খুব সীমিত।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ মানুষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধধর্মের মানুষ রয়েছে।এর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মোট ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশই হিন্দু। হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেও আবার নানা বিভাজন রয়েছে। এই শ্রেণি বিভাজনের মধ্যে অন্যতম জনগোষ্ঠী হচ্ছে দলিত সম্প্রদায়, যারা মোট জনগোষ্ঠীর ৩ শতাংশ এবং তারা সুনির্দিষ্টভাবে বৈষম্যের শিকার। তবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও কিছুসংখ্যক সংখ্যালঘু শিয়া মুসলিম ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। বাংলাদেশের সমতল ভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে ৫৪টিরও অধিক আদি নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। এই বিচিত্র জনগোষ্ঠীগুলোর একটি উন্নত ঐতিহ্য রয়েছে এবং তারা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে একটি ঋদ্ধ বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে/ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যে দুষ্ট করেছে। বাংলা ভাষার বাইরে এসব জনগোষ্ঠীর মানুষ অন্তত ৩৫টি ভিন্ন ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করেন এবং স্বকীয় ঐতিহ্যগত ভাবধারা বজায় রেখে জীবনযাপন করেন।

জাতির আত্মপরিচয় সৃষ্টি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রাখার বিষয়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক ইতিহাস জুড়ে এই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অব্যাহতভাবে নানা বঞ্চনার মুখোমুখি হচ্ছে। ফলত, বহুমাত্রিক বৈষম্যের শিকার হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন মৌলিক পরিষেবাসমূহে তাদের অভিগম্যতাও সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

কোভিড-১৯ অতিমারির প্রতিকুল/বৈরী প্রভাব

কোভিড -১৯ অতিমারি বাংলাদেশের বিদ্যমান অসমতাসমূহকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করেছে। আর এই পরিস্থিতি ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর অংশকে আর্থ-সামাজিকভাবে বেশি মাত্রায় ক্ষতির মুখে ফেলেছে। সমতলের আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বিরূপ প্রভাবের শিকার হয়েছে দলিত সম্প্রদায়। আর পাহাড়িদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় অতিমারির অভিঘাতের শিকার হয়েছেন বেশী মাত্রায়। এসব মানুষ অতি উচ্চ মাত্রায় স্বাস্থ্যঝুঁকি, চরম অর্থনৈতিক অভিঘাত এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় জীবনযাত্রা ও জীবিকা থমকে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন কোভিড অতিমারির প্রভাবে। এই প্রেক্ষাপটে, কোভিডের চরম অভিঘাত থেকে টেকসই উত্তরণে এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ পূরণে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না - এই অভীপ্সার আলোকে এসডিজি অর্জন

কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না (এলএনওবি) হচ্ছে ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডার একটি রূপান্তরধর্মী অঙ্গীকার। স্বীকার করে নিতে হবেযে, এসডিজির সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট চাহিদা ও অভিঘাতসমূহ মোকাবিলার ওপর। এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য যখন কর্মসংস্থান, ভূমির অধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তার সমতাভিত্তিক অভিগম্যতা নিশ্চিত করা যাবে, কেবল তখনই এসডিজি ১ (দারিদ্র্য বিলোপ) ও এসডিজি ২ (ক্ষুধামুক্তি) অর্জন করা সম্ভব হবে। এসডিজি ৩ (সুস্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ) এবং এসডিজি ৪ (গুণগত শিক্ষা) অর্জন করতে হলে আবশ্যিকভাবে 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না' শীর্ষক নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য উপযোগী অবকাঠামো ও পরিষেবা খাতেবিনিয়োগ করতে হবে। এই বিনিয়োগের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা জোরদার করার মাধ্যমে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজি ৫ (জেন্ডার সমতা) অর্জনের বিষয়টি নিবিড়ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটি বিষয়ে মনে রাখা আবশ্যক যে, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীরা প্রায়শ বর্ধিত মাত্রায় বৈষম্যের শিকার হন এবং এর ফলে তারা দ্বিগুণ ক্ষতির কবলে পড়েন। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলা, পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সম্প্রসারণ এবং এসব সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জোরালো পদক্ষেপ। জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ জোরদার করতে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

উত্তরণ

২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন আয় থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের মর্যাদার দেশে উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে এলডিসি থেকে উত্তরণের পথযাত্রায় রয়েছে। দেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় এই দ্বৈত উত্তরণ একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই উত্তরণ বাংলাদেশের সামনে বেশকিছু নতুন চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অনেক নতুন সুযোগ এনে দেবে। একটি এলডিসি-বহির্ভূত মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আবশ্যিকভাবে যে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে তা হচ্ছে, দেশের উন্নয়নে অংশীদার হওয়া ও এলডিসি থেকে উত্তরণকে টেকসই করার ক্ষেত্রে সকল নাগরিকেরসমান অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেন। সম্ভাব্য এই অনুকূল অবস্থান থেকে দেশের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট চাহিদা ও অধিকার নিশ্চিতের বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাংলাদেশে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা সৃষ্টি ও সকল পর্যায়ে তাদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা একটি মৌলিক চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে। দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয়, সে বিষয়টি অবশ্যই রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। অনুরূপভাবে দেশের অন্যান্য নাগরিকের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যৌক্তিক পরিচর্যা করা বাংলাদেশের টেকসই রূপান্তর ও উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে অতীব জরুরি।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার লঙ্ঘনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

২০২১ সালের দুর্গাপূজার (হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব) সময় বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সহিংস ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। এই সহিংসতা কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবের ভাবগাম্ভীর্যই ক্ষুণ্ণ করেনি, বরং এটি প্রাণহানি ও সম্পদহানিরও কারণ হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিরাপত্তা নিয়ে যে উদ্বেগের মধ্যে দিনাতিপাত করেন, এ ঘটনায় সেই উদ্বেগের বিষয়টি আরও বেড়েছে। এসব ঘটনা অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বকে আরও বেশি জোরালো করে তুলেছে এবং তার মাধ্যমে দেশে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্বের বিষয়েও তাগিদ দিয়েছে।

২০২৩ সালে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর এমন আরেকটি নিপীড়নমূলক ঘটনা ঘটেছে। পঞ্চগড়ে এই সম্প্রদায়ের ওপর সর্বাত্মক হামলা সংঘটিত হয়। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার হয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, এসব ঘটনা সে বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করে। এসব ঘটনা দেশে একটি সহনশীলতার, পারস্পরিক সম্মানেরও সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে আরও বেশি জোরালো করে তুলেছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান এই পরিস্থিতিতে ধর্মীয় সহনশীলতা জোরদারকরণ, বহুত্ববাদ বজায় রাখা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারসমূহ সুরক্ষার গুরুত্বকে অতিরঞ্জন হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই। এই উদ্বেগসমূহ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তকরণ ও জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা সহযোগে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এজন্যে সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রথার অনুসারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একটি সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রম জোরদার করতে আবশ্যিকভাবে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে।

রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গীকার

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ ও তাদের সমমনা দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারসমূহ সুরক্ষার অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নির্বাচনী ইশতেহারে এমন ঘোষণা সকল ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করবেএবং ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করবে। এসব ঘোষণা নিশ্চিত করে যে, রাজনৈতিক দলগুলো সকল ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের শান্তিতে বসবাস নিশ্চিত করতে ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের নানা উদ্বেগ নিষ্পত্তির অঙ্গীকার ও তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অর্থনৈতিক সুযোগসমূহে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সকল প্রধান রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখন যে বিষয়টি প্রয়োজন তা হচ্ছে, এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও আলোচনা অব্যাহত রাখা।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য আইনী কাঠামো

বাংলাদেশ মানবাধিকার-সংক্রান্ত বেশকিছু মৌলিক চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ওজনগোষ্ঠীর স্বার্থসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিতের বিষয়ে দেশের জন্য বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এসব চুক্তি ও কনভেনশনের মধ্যে রয়েছে সকল ধরনের জাতিগত বৈষম্য বিলোপ-সংক্রান্ত কনভেনশন (কনভেনশন অন এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন - সিইআরডি), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার-বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস - আইসিইএসসিআর) এবং অক্ষমতার শিকার ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক কনভেনশন (কনভেশন অন দ্য রাইটস অব পার্সনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস - সিআরপিডি)। ফলত দেশের বৃহদংশ আইন ও নীতি কাঠামোতে এসব আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাসমূহের প্রতিফলন দেখা যায়।

গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে। তবে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংবিধানের অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, যা সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির বিপরীত। সকল নাগরিক সমানভাবে আইনি সুরক্ষা পাবে মর্মে সংবিধানে নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে এবংধর্ম, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জাতিগত পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয় বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে যেকোনো প্রকারের বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। সংবিধানসকল ধরনের সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় সকলের জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা বিধানের পাশাপাশি প্রত্যেকের (নিজস্ব) ধর্ম চর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানজনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে যে কোনো ধরনের শোষণ থেকে সুরক্ষার বিষয়সুনির্দিষ্ট করেছে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তাসমূহ রাষ্ট্রের বিশেষ আনুকূল্য পাওয়ার দাবিদার হবে। তবে এসবের বাইরে এখনো অনেক উদ্বেগের বিষয় রয়ে গেছে।

সংবিধানে সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা সত্ত্বেও স্বাধীন বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইনের মতো বিষয়সমূহ কোনো প্রকার যৌক্তিক কারণ ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্র বহাল রেখেছিল। যাহোক, নানা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের আইনি ব্যবস্থাটি অবশেষে ২০০১ সালে বিলুপ্ত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের অর্পিত সম্পত্তি আইন ও তৎপরবর্তী আইনি বিধিবিধানসমূহ রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন, এমন যে কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তগত করার বিষয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে ক্ষমতা প্রদান করেছিল। ওই সম্পত্তির সংরক্ষণ বা তা হস্তান্তরের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছিল। এমন আইনের ফলে কার্যত স্বার্থান্বেষী মহল আইনের অপব্যবহারের সুযোগ নিয়েবিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্পত্তি হস্তগত করতে শুরু করে। প্রভাবশালী মহল ভূমি বেদখল করার ক্ষেত্রেও এ

আইনের অপব্যবহার করতে শুরু করে। সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় সমস্যার শিকার হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তিসমূহ এর প্রকৃত মালিক বা মালিকের আইনানুগ উত্তরাধিকারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তবে আইনের অসংগতির কারণে এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় এ প্রক্রিয়া আর অগ্রসর হয়নি।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ২৩ক অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' তবে এই বিষয়টির সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞার্থ প্রদান করা হয়নি। ২০১০ সালে প্রণীত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের মাত্র ৫০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৯৫০ সালের রাজ্য অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে (SATA) বাংলাদেশের সমতলে বসবাসরত ২২টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কাছ থেকে অন্য কারও নামে সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে, এই ২২টি সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি যদি তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের বাইরে অন্য কারও কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে চান, তাহলে হস্তান্তরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই জেলা রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। তবে এই অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধিবিধান বর্তমানে নেই। এছাড়াএ আইনে সমতলের মাত্র ২২টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়টি ২০১০ সালে প্রণীত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা ওই আইনে সমতল ভূমির ৫০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২১'-এ (খসড়া) সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানায় থাকা কোনো সম্পত্তির অবৈধ দখলদারিত্বের বিষয়ে ২২ ধরনের অপরাধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ ধরনের মালিকানা রহিত করার বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তবে ভ্রাম্যমাণ আদালতের এই বিধান বিভিন্ন পতিত ভূমি ও নির্দিষ্ট সরকারি সম্পত্তি অথবা নিজেদের মালিকানাধীন ভূমিতে (যে ভূমির মালিকানা অন্য কেউ দাবি করছেন) বসবাসরত সমতলের আদিবাসী সংখ্যালঘুদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকন্তু ভূমিতে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত মালিকানা ও তাদের ভূমি ব্যবহারের ধরনসমূহ 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১' কর্তৃক স্বীকৃত নয়। এছাড়াওওই নীতিতে খাস জমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমি অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। বনভূমির ওপর নির্ভরশীল যেসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় বনসংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে আসছেন, তাদের ভূমি অধিকারের সমস্যার বিষয়েও ওই নীতি আমলে আনেনি।

দেশের দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশ কিছুসংখ্যক প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখিত সম্প্রদায়সমূহের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার, মৌলিক অধিকারসমূহ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের বিষয়ে এই দলিলে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এসব সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত পরিচিতিসমূহের সুরক্ষার বিষয়ও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নীতি দলিলে সমতলের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক ভূমি কমিশন প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছে। ওই কমিশন সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ভূমি-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সমাধানের পাশাপাশি তাদের স্বার্থসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

আরওউল্লেখ্য, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে (এনএসএসএস) সামাজিকভাবে বিচ্যুত নানা জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরা হয়েছে, যাদের মধ্যে সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কথা উল্লেখ আছে। তবে এনএসএসএসে নাগরিকদের জন্য নানা ধরনের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হলেও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি উল্লেখিত হয়নি।

২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা তাদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে এবং তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পাবে। কিন্তু ২০১৯ সালের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধিতে এমন শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে কোনো প্রকার কোটা ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়নি। এমনকি ২০০৬ সালে প্রণীত বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, নিবন্ধন ও সনদ প্রদান বিধিতেও (২০১৫ সালে সংশোধিত) এ বিষয়ে তেমন কিছু করা হয়নি। 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১'-তে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য মূলধারার সমপরিমাণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে যে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, তা স্বীকার করা হয়েছে। আদিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ প্রশমনে স্বাস্থ্যনীতিতে মোট ৩৯টি কৌশলের সুপারিশ করা হয়েছে। যদিও, এসব নীতির কোনোটিতেই সুনির্দিষ্টভাবে আদিবাসী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মূলধারার সমান ও গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা নিশ্চিত করতে ২০১৭ সাল থেকে সরকার চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদরি (নাগপুরি) ও গারো ভাষার পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে চলেছে। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তবে এসব সম্প্রদায়ের শিক্ষকরা তাদের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারলেও অধিকাংশ শিক্ষকই জানেন না কীভাবে ঐসব তার ভাষা পড়তে ও লিখতে হয়।এর ফলে পাঠ্যপুস্তকের পাঠের ওপর ভিত্তি করে পাঠদান করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।অধিকন্তু একটি লক্ষণীয় উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের ৪১টি নৃতাত্ত্বিক ভাষার মধ্যে ২৮টিই বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। এসব ভাষার কোনো একটি যদি বিলুপ্ত হয়, তাহলে সেটি হবে দেশের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি। এর ফলে বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি অংশ হারিয়ে ফেলবে এবং বিশ্ব হারাবে তার ভাষাতাত্ত্বিকও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অঙ্গ।

যতদূর মনে করা যায়, বাংলাদেশ সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে (আইসিসিপিআর) অনুস্বাক্ষর করেছে। এই দলিলসমূহে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। তবে বাংলাদেশ এখনো আইএলওর কনভেনশন ১০৭ অনুস্বাক্ষর করেনি। এই কনভেনশনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা সামাজিক-রাজনৈতিক যেসব অমীমাংসিত বিষয় এবং বিবাদ ছিল, তা নিরসনের ক্ষেত্রে এই চুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রধানত ঐতিহাসিকভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। সকলেই জ্ঞাত যে, দশকের পর দশক ধরে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজ ভূমি থেকেবাস্তচ্যুত হয়েচরম মানবাধিকার লঙ্ঘনেরও সাংস্কৃতিক প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়ে আসছিল। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় ভূমিতে আদিবাসীদের নিরঙ্কুশ অধিকার সুরক্ষিত রাখা এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক ভূমিতে তাদের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান। চুক্তি অনুসারে গঠিত ভূমি কমিশনের দায়িত্ব ছিলভূমি-সংক্রান্ত বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করা এবং মালিকানার সঠিক দাবিদার ব্যক্তির কাছে ভূমির মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এ চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে জমে থাকা অসন্তোষ নিষ্পত্তির বিষয়ে গতি সঞ্চার হয়। অধিকন্তু, এই চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিসামরিকীকরণ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতি হ্রাস করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অধিকতর নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা।

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য চলমান সরকারি কর্মসূচিসমূহ

দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাদের নানা ধরনের উদ্বেগ নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। তবে সরকারি এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যকারিতা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার বেশ কারণ রয়েছে। চলমাননানা সরকারি কর্মসূচির বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হয়েছে, যে কর্মসূচিগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর স্বার্থ সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া:

আদিবাসী উন্নয়ন ও কল্যাণ কর্মসূচি

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য অঞ্চলে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এই মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও বসবাস পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো। মন্ত্রণালয়ের অন্যতম মৌলিক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ’। এ উদ্যোগের লক্ষ্য হলো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বৈষম্যসমূহ মোকাবিলা করা এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে টেকসই উন্নয়নের সম্প্রসারণ ঘটানো।

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক সংহতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহনশীলতার পরিবেশ জোরদার করতে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় নানা সময়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। অধিকন্তু, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণেসরকার নানা ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এসব উৎসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে নানা বৈচিত্র্যকে উদযাপনকরা এবং আন্তঃসম্প্রদায় সম্প্রীতি ও ঐক্য শক্তিশালী করা।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বলয় নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্নমাত্রিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে চরমভাবে দারিদ্র্যপীড়িত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও সামাজিকভাবে বিচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা সম্প্রসারণ, খাদ্য সহায়তা প্রদান ও স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকরণ।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা উদ্যোগ

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এসব জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলোর বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিশেষ ধরনের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এসব সহায়তার মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক পর্যায় থেকে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি কর্মসূচি।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও ব্যবসায় উদ্যোগ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্প্রসারণে কাজ করছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে যেসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আন্তঃনির্ভরশীল করে তোলা ও তাদের আর্থিক স্বাধীনতা জোরদার করতে প্রয়োজনীয় বাজার সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

দেশের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উদযাপনেসরকার বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, উৎসব ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

উল্লিখিত প্রচেষ্টাসমূহের সহায়তায় সরকার অন্তর্ভুক্তিতা ও সামাজিক সংহতি জোরদারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে এবং এসব সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন জোরদারে কাজ করছে। তবে পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব ও দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণে উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহের অনেক উদ্দেশ্য অনর্জিত থেকে যাচ্ছে। বস্তুত সমগ্র বাংলাদেশে একটি অধিকতর সম্প্রীতিবান্ধব ও ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠার অভীষ্ট অর্জন করতে হলে এখনো অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

২. সুপারিশমালা

নিচে যেসব সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো মোটাদাগে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহকে নির্দেশ করে। এসব সুপারিশের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিচার প্রাপ্তির অধিকার ও সরকারি পরিষেবার সর্বজনীন সুরক্ষা বলয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সকল নাগরিকের জন্য সরকারি পরিষেবার গুণগত সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদান এবং এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতিগত, নৃগোষ্ঠীগত ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপসমূহ

১. নৃতাত্ত্বিকতা, জাতিগত পরিচয় ও ধর্মীয় পরিচয় জানার বিষয়ে পরবর্তী আদমশুমারির প্রশ্নমালায় আরও বিস্তৃত প্রশ্নাবলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দলিত সম্প্রদায় যাতে যথাযথভাবে শুমারিতে জনগণনার আওতায় আসে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এসব জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের জাতিগত পরিচিতি কী উপায়ে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং অর্থবহভাবে উপাত্ত ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম উপায় কী হতে পারে, সে বিষয়টি নির্ধারণে নীতি বিশ্লেষণে কাজ করা সংস্থা ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মতো অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ করা যেতে পারে। এ কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) উপকরণের সুবিধা গ্রহণ করতে হবে।

২. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অগ্রগতি সাধনে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যুক্তকরতে হবে। সর্বজনীন ও সামাজিক সুরক্ষা ও পেনশন কর্মসূচিকে আবশ্যিকভাবে এমন উপায়ে বিন্যাস/নকশা করতে হবে, যাতে এ কার্যক্রমে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চাহিদাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না' এ মূলমন্ত্রের অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অত্যাধিক দুর্ভোগের শিকার তাদের জন্য সাধারণ কিন্তু পৃথককৃত ব্যবস্থা নিতেহবে।

৩. দলিত সম্প্রদায়ের সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদের জন্য যথোপযুক্ত আবাসনের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি উচ্ছেদের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। অর্পিত সম্পত্তির মালিকানা দাবি করার প্রক্রিয়াকে উদ্যোগের মূল স্রোতে আনতে হবে, যাতে এ-সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা যায়।

৪. প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের জাতীয় পাঠ্যক্রম ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যবইসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় কোনো বইতে যদি ভিন্ন ধর্ম, বিশ্বাস বা জাতিগোষ্ঠীর জন্য অবমানকর কোনো শব্দ পাওয়া যায় বা এক ধর্মের তুলনায় অন্য ধর্মকে শ্রেষ্ঠতর বর্ণনা করে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়, তাহলে তা বর্জন করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে এমন পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা সহনশীলতা, ধর্মচর্চা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং একটি বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থা জোরদারকরণের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। এ বিষয়টি বাস্তবায়নে সরকারকে বিভিন্ন বেসরকারি অংশীজন ও এনজিওর সঙ্গে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হতে হবে।

৫. জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সকল ধরনের হুমকি ও হয়রানি বন্ধে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইন-কানুন প্রণয়ন করতে হবে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক কোনো ব্যক্তি যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে বিচারের আওতায় আনতে বিচারিক সহায়তা দিতেহবে।

৬. বিশেষত সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও ভূমি অধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মিথ্যা অভিযোগপত্র থেকে ভুক্তভোগীদের দ্রুততম সময়ে অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেসব ব্যক্তি সমতল ভূমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আন্দোলন করেন, তাদের বিরুদ্ধে সাধারণত সরকারের বন অধিদপ্তর এবং প্রভাবশালী ও রাজনৈতিকভাবে আশকারাপ্রাপ্ত ভূমিদস্যুরা এমন মিথ্যা মামলা দায়ের করে থাকে।

৭. এসএটি আইনের ৯৭ ধারা অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে যেসব জমি ইতঃপূর্বে হস্তান্তর করা হয়েছে, সেগুলো পুনরুদ্ধার কাজে সহায়তা করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভূমি কমিশন বা টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৮. পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সক্ষমতা জোরদার করতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়লে সে ক্ষেত্রে আগে এসব পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

৯. প্রথাগত বসতি থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পদ্ধতিগত ও জোরপূর্বক উচ্ছেদ বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ভূমি পুনর্বণ্টন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে এমন উচ্ছেদ পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার যদি এমন উচ্ছেদ পরিচালনার জন্য একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে, তাহলে সে ক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবশ্যিকভাবে ভূমি উদ্ধারের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে উপস্থাপনকরতে হবে। এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে মানবাধিকার কমিশন ও ভূমি কমিশনের অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। যদি চূড়ান্তভাবে কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থার ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভূমি অধিগ্রহণের সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বার্থ জড়িত আছে, এমন কোনো ভূমি যদি অধিগ্রহণ করতে হয়, তাহলে সে উদ্যোগ নেওয়ার আগে রাষ্ট্রকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার সর্বজনীন ঘোষণা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন, পূর্বতন ও অবহিত সম্মতি (FPIC) গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

১. ভূমি, সম্পত্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রথাগত ভূমি অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে প্রতিনিধিত্ব এবং ভাষা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকারের নিরিখে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অধিকার সুরক্ষায় সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

২. বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

বিচার ব্যবস্থা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড রক্ষা করে কাজ করতে পারে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের অগ্রগতি সাধনের জন্য 'সংখ্যালঘু অধিকার ও সুরক্ষা কমিশন' প্রতিষ্ঠা ও তা কার্যকর করতে হবে।

৪. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (এনএইচআরসি) জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ দিতে হবে। নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার বিষয়ে যাতে কমিশন স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সে বিষয়ে কমিশনকে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা হচ্ছে, বিগত ১০ বছর সময় কালের মধ্যেপর্যন্ত সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মামলাসমূহ পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রদান। এনএইচআরসির সুপারিশসমূহ পদ্ধতিগতভাবে নজরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের জন্য অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিপরামর্শ কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন অধিকার গোষ্ঠী ও নাগরিক সংগঠনের (সিএসও) সঙ্গে অর্থপূর্ণ সংলাপের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের বিষয়টি বিশেষভাবে নজরে আনতে হবে।

২. সরকারের নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন শাখার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই যাতে এনজিওগুলো স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, সেরকম অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সুবিধাগ্রহীতাদের শনাক্তকরণ/মনোনয়ন ও তহবিল বরাদ্দকরণের মতো এনজিওর নানা কার্যক্রমের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত হতে পারে। এনজিওগুলোর কার্যক্রমের ওপর রাষ্ট্রীয় কোনো সংস্থার অন্যায্য নজরদারি ও খবরদারি থাকা উচিত নয়। এনজিওগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম ও সুচারু পরিচালন ব্যাহত করতে পারে, এমন কোনো ধরনের অন্যায্য সরকারি বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ যাতে আরোপিত না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

বিরাষ্ট্রীয় অনুঘটক ও এনজিওগুলোর ভূমিকা

ধর্মচর্চা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সহনশীলতা প্রসারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। একটি জুতসই শিক্ষানীতির মাধ্যমে বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার শক্তিমত্তার প্রসারের বিষয়ে কণ্ঠস্বর জোরদার করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে প্রকৃত অর্থে একটি যথার্থ/ধর্মনিরপেক্ষ সমৃদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যেমনটি বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, যেমন জলসা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি উৎসবের পূর্বে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচারাভিযানমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যমান নীতিসমূহের বাস্তবায়ন

১. বাংলাদেশ সংবিধান প্রতিষ্ঠার মূল চার স্তম্ভের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ধর্ম নিরপেক্ষতার মূলনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদ বিলোপ করা আবশ্যক। কেননা, এই অনুচ্ছেদে একটি ধর্মকে অন্য সব ধর্মের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়াহয়েছে, যা ধর্ম নিরপেক্ষতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

২. আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে এবং তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষা ও উন্নয়ন সাধনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি চাকরিতে কোটা বরাদ্দ পুনর্বহাল ও সংরক্ষণ করা উচিত এবং সমতলের আদিবাসী নারীদের পক্ষে জাতীয় সংসদে কমপক্ষে একটি সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করা উচিত।

তবে এসব কার্যক্রমেরআওতা সীমাবদ্ধ না রেখে আরও বাড়াতে হবে। স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহে আদিবাসী নারীদের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক আসন সংরক্ষণে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধি, ২০১৯ ও বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, নিবন্ধন ও সনদ প্রদান বিধি, ২০০৬ সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। এই সংশোধনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব ভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা চাহিদার আলোকে শিক্ষক নিয়োগে বিশেষায়িতআসন সংরক্ষণ করতে হবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০-এর অনুসরণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জন্য সহায়ক শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পন্ন হতে পারে।

৪. ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির সকল ধারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নে ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে হবে এবং চুক্তির বিষয়গুলো বাস্তবায়নে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশমালার সঙ্গে সংগতি রেখে ভূমি কমিশনের জন্য কালক্ষেপণ না করে অতিসত্বর নির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন ও নিশ্চিত করতে হবে।

৫. নাগরিক সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী বিল সংসদে উত্থাপনের পূর্বে পর্যালোচনা ও সংশোধন করতে হবে, যাতে করে এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বিত আইনে পরিণত হতে পারে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনটি প্রণীত হলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ করতে সক্ষম হবে। দলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রান্তিক ও ছন্নছাড়া/ভবঘুরে/বাস্তুচ্যুতবিচ্যুত জনগোষ্ঠী যেসব বৈষম্যের সম্মুখীন হয়, সেগুলো মোকাবিলায় আইনটি যেন যথেষ্ট মাত্রায় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, সেটি নিশ্চিত করার পাশাপাশি এসব জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার ক্ষমতাও আইনটিতে যুক্তঅর্পণ করতে হবে।

৬. সমতলের আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা যথাযথভাবে মোকাবিলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশলসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে।

৭. ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৯৭ ধারা সংশোধন করে সেখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০-এ স্বীকৃতি দেওয়া সমতলের সকল আদিবাসী গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ বিষয়টি এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে আইনটি সমতলের সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমির সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম হয়।

৮. এসএটি আইনের ৯৭(৮) ধারা (আইনের এই ধারায় বর্ণিত বিধান মোতাবেক হস্তান্তর না হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধার) যাতে যথাযথভাবে অনুসরণ করে ভূমি হস্তান্তর করা হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণে সমতল ভূমি সংবলিত সকল জেলার রাজস্ব দফতরকে উদ্দেশ করে প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপন (অথবা নির্দেশিকা) জারি করতে হবে। কোনো আদিবাসী ব্যক্তির জমি আদিবাসী-বহির্ভূত কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে যথাযথ প্রক্রিয়া ও বিধিবিধান যাতে অনুসরণ করা হয়, সে বিষয়টি পরিপালনে ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৭ ধারা অনুসারে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা জারি করা উচিত।

৯. সাইবার নিরাপত্তা আইন (সিএসএ) পর্যালোচনা করতে হবে। বিশেষ করে এ আইনের ৩১ ধারা সরাসরি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ আইনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিঘ্নঘটানোর বিষয়টিকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং এ ধরনের অপরাধে ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডেরবিধান রয়েছে। এর আগের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেও (ডিএসএ) একই মেয়াদের সাজার কথা বলা হয়েছিল। এই ধারার সংজ্ঞার্থ ও প্রয়োগের ক্ষেত্র আরও স্পষ্ট করতে হবে। আইনটিরঅপপ্রয়োগ রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার

পাশাপাশি এই ধারায় সংঘটিত বিষয়কে দেওয়ানি কার্যবিধির আওতাভুক্ত করেএটিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

নতুন নীতিমালা প্রণয়ন

১. জাতিতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনো আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংশোধন ও স্থগিত করার ক্ষেত্রে এ-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কার্যকর ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আকার অনুসারে তাদের বসবাসের ভৌগোলিক এলাকাগুলো চিহ্নিত করতে হবে, যেখানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধা ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত (যেমন: পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকা ও সুন্দরবন)। এ ধরনের এলাকার মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথাযথ কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া নীতিগুলোর কার্যকর ও জরুরি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডেরমধ্যে যাতে সুসমন্বয় প্রতিষ্ঠা পায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. একটি বৈষম্যবিরোধী আইন কার্যকর করার মাধ্যমে কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়গুলোর উদ্বেগের বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

৪. সমতলে বসবাসরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের হাতছাড়া/অধিকারমুক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, সরকারি চাকরিতে ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে তাদের সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সুবিধাবঞ্চিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য কোটার মতো ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে ইতিবাচক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬. পর্যটন এলাকার কাছাকাছি বসবাসকারী সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পর্যটন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। তাদের জন্য বাড়তি প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবসার মালিকানা সম্প্রসারণে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সংরক্ষিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের অর্থনীতি ও পর্যটন খাত পরিচালনায় আবশ্যিকভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়গুলোর অধিকতর ভূমিকা থাকতে হবে। এ ধরনের ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো গেলে তা পরিবেশ সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকেও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা স্থানীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার উদ্যোগসমূহ পর্যটকদের অধিকতর সঠিক নির্দেশিকা প্রদান করতে সক্ষম। কেননা স্থানীয় মালিকরা আঞ্চলিক বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অধিকতর মনোযোগী থাকেন।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় পূর্বের সেকশনে উপস্থাপিত সুপারিশমালা একটি পথনির্দেশ প্রদান করেছে। প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলোয় বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামনে উপস্থিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভিন্ন লক্ষ্যনির্দিষ্ট নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো এসব জনগোষ্ঠী যেন জাতি গঠন ও দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের জন্য যথেষ্ট মাত্রায় ক্ষমতায়িত হতে পারে। এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশে সামাজিক সংহতি সম্প্রসারণ ও বৈষম্য হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে পারে। প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো এসডিজির এলএনওবি মর্মবাণী এবং ২০৪১

সালের মধ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে ওঠার বিষয়ে জাতীয়ভাবে যে আকাঙ্ক্ষানির্ধারণ করা হয়েছে, তার সঙ্গেও নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

১১

নীরব গণকন্ঠকে সোচ্চার করা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা

বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ

চেয়ার

ড. ইফতেখারুজ্জামান
কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
এবং
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

পেনহোল্ডার

ড. আসিফ মোহাম্মদ শাহান
সহযোগী অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ড. বদিউল আলম মজুমদার
কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, বাংলাদেশ

কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ
কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ
দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

ড. কাজী মারুফুল ইসলাম
অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মির্জা এম হাসান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
(বিআইজিডি)

মোঃ নূর খান
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

ব্যারিস্টার সারা হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট

শারমীন এস মুরশিদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ব্রতী

ড. সুমাইয়া খায়ের
অধ্যাপক, আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. পটভূমি ও প্রসঙ্গ

যখন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, তখন এই একবিংশ শতাব্দীতে দেশটিকে অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে অনেক বাধার মুখোমুখিও হতে হচ্ছে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাংলাদেশের যে অভাবনীয় ও অভিযাত্রা সূচিত হয় তাতে বেসরকারি অংশীজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের বিষয়টি স্মরণে রাখা ও স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। দেশের উদ্বেগ ও উন্নয়নের স্বার্থের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি, স্বল্প খরচে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ এবং যেসব ক্ষেত্র ও বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নজর দেওয়া ও পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে এই অভিযাত্রায় বিভিন্ন নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংস্থা এবং দেশের গণমাধ্যমগুলোও অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা প্রমাণ করে যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সুশাসন এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সব অংশীজন যৌথভাবে কাজ করে, তখন বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং নাগরিক উভয়ই লাভবান হয়। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে,টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেখানেও সমগ্র সমাজভিত্তিক পন্থা অনুসরণের কথাই বলাহয়েছে। তাই, রাষ্ট্রের উচিত অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া, তাদের গঠনমূলক সমালোচনাকে উৎসাহিত করা এবং নাগরিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সক্রিয়/আশাব্যঞ্জক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

তবে পরিতাপের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে এই বিষয়গুলোতে পিছুটান পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা, জবাবদিহি, রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা সম্পর্কে উদ্বেগ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য নাগরিক সমাজের অংশীজনদের (যেমন আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং অন্যান্য পেশাজীবীগোষ্ঠী) জন্য রাজনৈতিক পরিসরের সংকোচনবৃদ্ধি পাচ্ছে। সংকুচিতএই রাজনৈতিক পরিসর সরকারের অনুসৃত নীতি ও পদক্ষেপের বিষয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির কথা বলাকেকঠিন করে তুলছে। ভিন্নমতের কণ্ঠস্বরও সমানভাবে কোণঠাসা হয়ে আছে।

এই উদ্বেগগুলো সব নাগরিকের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও দেশের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের জন্য হয়ে পড়েছে অধিকতরপ্রতিকূল ও উদ্বেগবহ। অন্যভাবে বলা যায় , যদিও বিভিন্ন পরিসরের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ জনজীবনের বিভিন্ন দিক এবং ক্ষেত্রগুলোকে প্রভাবিত করছে, তবু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরই অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রতিকূল পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রয়েছে সমতল এবং পাহাড়ের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, ভাষাগত সংখ্যালঘু, দলিত সম্প্রদায় এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে নারীদের আরও বেশি বৈষম্যের শিকার হতে হয়। বিশেষ করে এতে হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্য এবং লিঙ্গ রূপান্তরিত ব্যক্তিরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৈষম্যের শিকার হয়।

এই পরিস্থিতি প্রতিরোধে, বর্তমান নীতি-সুপারিশপত্রটিতে/বিবৃতিটিতে উল্লিখিত উদ্বেগগুলোর মূল ক্ষেত্রগুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে এবং 'নীরব কণ্ঠ' সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের কথা শোনানো ও তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে কীভাবে গণতান্ত্রিক জবাবদিহি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায় সে- বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। এই পটভূমিতে কার্যকরী উদ্যোগ ও অনুসন্ধানের বিষয়টি মূলধারার আলোচনার অংশ হতে হবে এবং জরুরিভাবে বিবেচিত হবে।

নীরব গণকণ্ঠকে শক্তিশালী করা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা: বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা

বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ, যার একটি মূল অভীষ্ট হচ্ছে 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না'। ধারাবাহিকভাবে প্রণীত জাতীয় পরিকল্পনার নথিতে, যেমন ৭ম

এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সঙ্গে সরকারের নীতিগুলোকে সমান্তরাল করার কথা বলা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উদ্বেগগুলোকে প্রশমিত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার বিষয়ে পটভূমি/প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামোয় (এনজিএএফ) সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ মোকাবিলায় বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) গঠন করা, যা ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত ঘটনাগুলোর তদন্ত এবং সমাধানের জন্য দায়বদ্ধ। এছাড়া, বিভিন্ন দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা ও সুরক্ষা দিতে বেশ কিছু আইন কার্যকরকরা; বৈষম্যবিরোধী বিলের খসড়া প্রস্তুত করা; দুর্নীতি দমন কমিশনের (এসিসি/দুদক) মতো জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, তথ্য কমিশন ও সরকারের বিভিন্ন পরিষেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তি চালু করা এবং এতে অভিগম্যতার অধিকার নিশ্চিত করা। যদিও, এই উদ্যোগগুলো সত্ত্বেও জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও সুশাসন অনেকাংশে অধরা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রয়োগ সীমাবদ্ধই থেকে গেছে। এই অবস্থার কারণে বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা বঞ্চিতদের স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হয়। উদ্ভূত এই দৃশ্যপটের/পরিস্থিতির পেছনের কারণ বোঝারজন্য বিগত বছরগুলোতে দেশ যে রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে তার গভীরে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান, যা একটি সর্বাধিক প্রগতিশীল দলিল হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত তাতে উপর্যুক্তনাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলোও অনুবদ্ধরূপে/চিত্রিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়াও এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি থাকায় এবং অনেক আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তি এবং কনভেনশনে স্বাক্ষর করায় নাগরিক, মানবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতেবাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তবে জন্মের পর থেকেই গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক জটিল। স্বাধীনতার পর থেকেই শাসন ও গণতন্ত্র কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে।১৯৭৫ সালে জাতির পিতার হত্যার পর দীর্ঘ দেড় দশক সামরিক ও আধা-সামরিক শাসন অব্যহত থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে দেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকে দেশে চারটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে যা সবার কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল [১৯৯১, জুন ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালে]। এই নির্বাচনগুলোর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব গ্রহণ ও সরকার গঠন করে। দুঃখেরবিষয় ধারাবাহিকভাবে সরকারগুলো দেশে গণতন্ত্রকে ব্যাপকভাবে সুসংহত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক জাতীয় ভাষ্যকার এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশ নির্বাচনী গণতন্ত্রের মর্যাদা হারিয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৪ ও ২০১৮ সালে পরপর দুটি বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গেছে। সুইডেনভিত্তিক ভি-ডেম প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন গণতন্ত্রের বৈচিত্র্যে (ভি-ডেম) বাংলাদেশকে একটি 'নির্বাচনভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আরও বেশ কিছু সংস্থাও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। ফ্রিডম হাউস বাংলাদেশকে 'আংশিক স্বাধীন' হিসেবে এবং পলিটি ভি দেশটিকে 'একটি স্বৈরতান্ত্রিক' হিসেবে বিবেচনা করে।

উপর্যুক্ত বিবেচনায় যে প্রশ্নের উত্তর প্রার্থিত তা হলো, গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ কীভাবে দেশের সামগ্রিক জবাবদিহি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে এবং দুর্বল জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নিজেদের অধিকার অনুধাবন বা দাবি করার বিষয়টিকে কতটা কঠিন করে তুলেছে। গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণের ফলে ক্ষমতার অতি-কেন্দ্রীকরণ হয়েছে, যা নির্বাহী বিভাগকে রাষ্ট্রের অন্যান্য শাখার ওপরে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দিয়েছে। ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্রেসি (ভি-ডেম) প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনুভূমিক জবাবদিহি সূচকে বাংলাদেশের স্কোর কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এটি নির্দেশ করে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারের কাছে তথ্য চাওয়া, কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং আইন ও বিধি লঙ্ঘনের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সরকারের কার্যাবলিতদারকি

করার ক্ষেত্রে সংসদ, বিচার বিভাগ, দুদক ও মানবাধিকার কমিশনসহ সুশাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং বলপূর্বক গুমের ঘটনা উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। তা সত্ত্বেও উদ্ভূতপরিস্থিতি মোকাবিলায় সংসদ বা জবাবদিহিমূলক সংস্থাগুলো কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়নি।

নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। প্রথমত, নিজেদের দাবির সমর্থনে আওয়াজ তোলা এবং রাষ্ট্রের অঙ্গগুলোর সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি কঠিন করে তোলার কারণেবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য রাজনৈতিক ও নাগরিক পরিসর সংকুচিত হয়েছে।দ্বিতীয়ত, মাঠ পর্যায়ে আমলাতন্ত্রের কাছে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্বল গণতান্ত্রিক জবাবদিহিরকারণে সেবা পেতে ভোগান্তিতে পড়তেহচ্ছে। ফলস্বরূপ সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকেরা প্রায়শই তাদের প্রাপ্য প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যদিও সরকার একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) চালু করেছে, তবে এক্ষেত্রেও উপস্থিতি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বঞ্চিতদেরঅভিগম্যতা সীমিত।

নির্বাহী আধিপত্য এবং গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অধিকারভিত্তিক সংগঠনগুলোকে নতুন আবির্ভূত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে। অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা বা গণতন্ত্রের প্রসার, অথবা কেবল গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে জড়িত নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলো শুধু তাদের কথা শুনতেই অনাগ্রহী নয়, তাদের চলার পথে নানা প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করছে। ভি-ডেমের মতে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রপ্রসারের জন্য কাজ করা নাগরিক সংগঠনগুলো এখন মাঝারি মাত্রার দমন-পীড়নের সম্মুখীন হচ্ছে। ভি-ডেমের ভাষায়, নাগরিক সংগঠনগুলোকেকাজ করা বা নিজেদের কথা বলা থেকে বিরত রাখতে সরকার ছোটখাটো আইনি হয়রানি (আটক, স্বল্পমেয়াদী কারাবাস) করছে। নাগরিক সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সীমিত করা, নাগরিক সংগঠনগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিতে বাধা দেওয়া অথবা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বন্ধ করার মাধ্যমে সরকার তাদের কাজের সুযোগও সীমিত করতে পারে। এগুলো সবই উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং এখন এর উপজাত উত্তরসূরি সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬, বেসরকারি সংস্থার প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল ছাড়পত্র সংক্রান্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর জারি করা ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বরের পরিপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন আইন অধিকারভিত্তিক সংস্থাগুলোকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধা তৈরি করছে। এগুলো বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ পায়; প্রথমত, দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনে নাগরিক সংগঠনগুলোকে সরকার নিরুৎসাহিত করছে, ফলস্বরূপ তাদের সমালোচনামূলক আলোচনা এবং মতামত উপেক্ষিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে উদাহরণ হিসেবে খসড়া বৈষম্য বিরোধী বিল- এর উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও বিগত বছরগুলোতে নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রস্তাবিত সুপারিশই সরকারকে এই বিলটি প্রস্তুতে উৎসাহিত করেছিল, নাগরিক সংগঠনের কর্মীরা বিলটি প্রণয়নের প্রক্রিয়াতে সলাপরামর্শের অপর্যাপ্ততার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তৈরি খসড়ায় অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে বৈষম্য ও সমতার ক্ষেত্রে বিরাজমান মূল উদ্বেগগুলোকে চিহ্নিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, অধিকারভিত্তিক নাগরিক সংগঠনগুলোকে তাদের দাবি উত্থাপন করতে নিরুৎসাহিত করে সরকার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতিথেকে নিজেকেই বঞ্চিত করছে, যা অধিকারের দাবি তুলতে নাগরিকদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন আইন ও উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করতে পারত। এটি এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করছে যেখানে অধিকার লজ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থল মারাত্মকভাবে সীমিত।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বেশ কিছু সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছে যারা সক্রিয়ভাবে এই সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর দাবিগুলো তুলে ধরছে। তবে, এই সংস্থাগুলোর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়এবং সঠিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুহৃদ এবং জোটবদ্ধ সমর্থন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং তাদের সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করে এমন সবনাগরিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে দমিয়ে বা সীমাবদ্ধ করে, সরকার এই গোষ্ঠীগুলোর কাছে জনসেবাকে অবমূল্যায়ন করছে এবং তারা তাদের অধিকার চর্চা করতে সক্ষম হচ্ছে না।

উপরোক্ত আলোচনা এটি নির্দেশ করে যে, ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক পিছুহটার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলোকে তিনটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পরযুক্ত ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে:

- তারা তাদের আইনি, নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং তাদের কণ্ঠস্বর অশ্রুত থাকছে।
- তারা মানসম্পন্ন জনসেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ওপরে চিহ্নিত কিছু মূল সমস্যার ওপর ভিত্তি করে, পরবর্তী অনুচ্ছেদে আইনি এবং নাগরিক অধিকার, কণ্ঠস্বর, জবাবদিহি এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে উদ্বেগ ও বাধাগুলো মোকাবিলা করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে। ভাবনাটি হল, কণ্ঠস্বর ও অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের উদ্বেগগুলো রাজনৈতিক দল ও নীতিনির্ধারকদের নজরে আনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ সুরক্ষিত করা।

২. সুপারিশমালা

- নিজেদের অধিকারের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতকরণপ্রান্তিক জনগণের ক্ষমতায়ন

সংশোধনসহ বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন করুন।

ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, বঞ্চিত ও পেছনে ঠেলে দেওয়া গোষ্ঠীগুলোর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বৈষম্য বিরোধী আইন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবেপ্রমাণিত হতে পারে। যদিও বেশ কয়েক বছর ধরে নাগরিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ এই বিলটি সরকারের পক্ষ থেকে একটি ইতিবাচকপদক্ষেপ তবু খসড়া বিলটির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলোর যথাযথভাবে সমাধান করা দরকার। প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো নিম্নরূপ:

- ➢ লিঙ্গ বৈষম্য এবং এর অনুষঙ্গী বর্ণ, ধর্ম, জাতিসত্তা অথবা পেশাগত বৈষম্যকে একসূত্রে বেঁধে বিধানগুলোতে তুলে ধরুন।
- ➢ ন্যায্য বিচার এবং যথাযথ বিচার প্রক্রিয়া সম্পাদন সাপেক্ষে অপরাধী নিশ্চিতকরণে বৈষম্য নিরসনের বিধান প্রণয়ন করুন।
- ➢ বৈষম্যের শিকার ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত সমর্থন এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করুন, বিশেষ করে যারা প্রতিক্রিয়াপ্রার্থীএবং সম্ভাব্য প্রতিহিংসার শিকার হতে পারেন তাদের জন্য।
- ➢ বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিদের স্পষ্টভাবে সংজ্ঞার্থের আওতায় আনুন এবং চিহ্নিত করুন কারা আইনের অধীনে প্রতিকার পাওয়ার যোগ্য।
- ➢ আইন সম্পর্কে জনসাধারণের পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্তদের সচেতনতা বাড়াতে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ এবং আইনের অধীনে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য নাগরিক সংগঠন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর যুক্ততাকে সমর্থন করুন।

আইনে উল্লেখিত বিধান বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠা করুন। আইনের অধীনে পরিকল্পিত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সব রাজনৈতিক দল ও সরকারের পক্ষ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। এটি খুব বেশি দরকার কারণ বেশ কয়েকটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে যেসব নীতি, আইন, বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িতহচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, শ্রম আইন এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ (যা চা শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট অধিকারকে চিহ্নিত করেছে), এসিড নিক্ষেপে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, আইনগত সহায়তা ও পুনর্বাসন বিধিমালা ২০০৮, নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ এবং ভোটার তালিকা আইন ২০০৯ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত, কেউ ভোটার তালিকা বিধিমালা ২০১২ (২০১৯ সালে সংশোধিত) যোগ করতে পারেন, যা হিজড়া সম্প্রদায়কে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার এবং জাতীয় নির্বাচনে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে এই নীতিগুলো পুনর্বিবেচনা এবং সংশোধন করা দরকার। এই আইন এবং প্রবিধানগুলোর বিশদ বিশ্লেষণ এই নীতি বিবৃতির/কৌশলপত্রের আওতার বাইরে। এছাড়া অন্যান্য নীতি বিবৃতিতে/কৌশলপত্রে এসব আইন এবং প্রাসঙ্গিক বিধান ও প্রবিধানগুলোর বিষয়ে বেশ কয়েকটি উদ্বেগের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে আইনি সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার (এনএলএএসও) ক্ষমতা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন।

এই লক্ষ্য পূরণে, নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে সঠিকভাবে তথ্য প্রচার করতে হবেএবং নিম্ন আয়ের মানুষ, নারী এবং প্রান্তিকদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করতে সরকারকে পর্যাপ্ত আর্থিক এবং মানব সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার (এনএলএএসও) উচিত সরকারের অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি এই খাতে অতীতে কাজ করা অ-রাষ্ট্রীয় অংশীজনদের নিয়েসুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আইনি সহায়তা প্রদান করার কৌশল নির্ধারণে মনোযোগ দেওয়া । নাগরিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আইনবিষয়ক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি নিজে আইনি সেবা প্রদান কার্যক্রমে যুক্ত থাকার পরিবর্তে যেসব বেসরকারি সংস্থা আইনি সহায়তা ও সেবা দেয় তাদের সাহায্য ও অর্থায়নের বিষয়ে ভাবতে পারে।

বর্তমানে প্রশাসনিক এবং আইনি যেসব বাধা অধিকারভিত্তিক নাগরিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে সেগুলো দূর করুন।

সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য নাগরিক সংগঠনকে কার্যকরভাবে এবং বাধাহীনভাবে কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্যরাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার করা উচিত। এটি দুটি উপায়ে করা যেতে পারে—প্রথমত, নাগরিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণকরে এমন কিছু আইন যেমন, সাইবার নিরাপত্তা আইন এবং বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) আইনের মতো বিদ্যমান কিছু আইন বাতিল অথবা সংশোধন করা এবং সুশাসনের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের সময় নাগরিক সংগঠনগুলোর সুপারিশগুলো আমলে নেওয়া। দ্বিতীয়ত, নাগরিক সংগঠনগুলোকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যেই জটিল ও অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক বাধা এবং পদ্ধতিগত বিলম্ব মোকাবিলা করতে হয়, এগুলো সরলীকরণ করা উচিত। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বর্তমানে যেটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন, তাকে সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকল্প ও কর্মসূচিসহ দ্রুততার সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন দিতে হবে। এবং নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করুন।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম করার জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে, রাজনৈতিক দলগুলোকে জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচনে

তাদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো থেকে প্রার্থী মনোনীত করার অঙ্গীকার করা উচিত, বিশেষ করে এমন এলাকায় যেখানে মোট ভোটারের একটা বড় অংশ জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠীর মানুষ (যেমন দলিত সম্প্রদায়, চা বাগানের শ্রমিকেরা)। রাজনৈতিক দলগুলোকেও তাদের দলের অভ্যন্তরেরগণতান্ত্রিক অনুশীলনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে উদ্যোগ নিতে হবে। দলগুলোর বিভিন্ন দলীয় কমিটি গঠনেও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হওয়া উচিত। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজন যেন অবাধে ও কোনো হয়রানি বা বাধা ছাড়াই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটকেন্দ্র এবং ভোটকক্ষে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। নির্বাচনের আগে এবং পরবর্তী সময়ে এইসব মানুষের জান-মাল সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

- বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠী যেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং তাদের দাবি জানাতে/ কণ্ঠস্বর শোনাতে পারে সেটি নিশ্চিত করুন।

প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ তথ্যভাণ্ডার তৈরি করুন, যা তাদের অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তারা যে বিশেষ সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয় সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করবে।

এ ধরনের তথ্যভাণ্ডারসুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অবস্থা এবং মঙ্গল/সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করবে। এসব তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত থাকলে তা সরকার এবং বেসরকারি সংস্থা উভয়কেই কার্যকর উদ্যোগ নিতে সহায়তা করবে। এ ধরনের একটি সর্বাঙ্গীণ তথ্যভাণ্ডার তৈরি এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করার জন্য সরকারের উচিত বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে একত্রে কাজ করা।

এমন উদ্যোগ নিন যা রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে শক্তিশালী করবে এবং তাদের অধিকারের জন্য সম্মিলিতভাবে দর কষাকষির সুযোগ দেবে।

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐক্যবদ্ধ/ একত্রিতভাবে উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়, ফলে নিজেদের সংগঠিত করার যে সুফল তা থেকে বঞ্চিত হয়। এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য এবং তাদের সম্মিলিত দাবি/ আওয়াজ তোলার জন্য শুধুমাত্র তাদের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো নয়, বরং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের যুথবদ্ধভাবে/একত্রিত অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাতে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। নিজেদের দাবি তুলে ধরতে এবং তারা যে পরিষেবা পাওয়ার অধিকারী তার জন্য তাদের সম্মিলিতভাবে দরকষাকষি করার সক্ষমতা থাকতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোতে নেতৃত্বের ক্ষমতা বিকাশে সহায়তার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত, যাতে তারা নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারে, কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার প্রতিবাদ করতে পারে এবং পরিবর্তনের জন্য একত্রহতে পারে।

বিদ্যমান সামাজিক জবাবদিহির উপকরণ/ হাতিয়ার এবং পদ্ধতিগুলো শক্তিশালী করুন এবং তাদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করুন।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়, বিগত বছরগুলোতে বেশ কিছু সামাজিক জবাবদিহির উপকরণ/হাতিয়ার চালু করা হয়েছে। সীমাবদ্ধ না হলেও এর মধ্যে রয়েছে ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট ফোরাম এবং সামাজিক নিরীক্ষা। একই সঙ্গে দুর্বল জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে সহায়তা দিতে গ্রামীণ এলাকায় ইউনিয়ন ও উপজেলা উভয় পর্যায়ে এবং নগর এলাকার পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে (ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে ১৩টি এবং উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ১৭টি) স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। যা হোক, সামাজিক দায়বদ্ধতার এসব উপকরণ/ হাতিয়ার ও পদ্ধতি অকার্যকর থেকে গেছে অথবা সুবিধাভোগীদের/ক্ষমতাসীনদের দ্বারা কুক্ষিগত/

বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর থেকে উত্তরণে, এসব সামাজিক দায়বদ্ধতার উপকরণগুলোর/হাতিয়ারগুলোর প্রচার এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে রাজনৈতিক দলগুলোর দৃঢ় অঙ্গীকার আবশ্যকহবে। এটি বাস্তবায়নেরএকটি সম্ভাব্য উপায় হলো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থার সঙ্গে যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয় তাতে নাগরিকদের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগ এবং নাগরিকদের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে কর্মমূল্যায়নের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

সংসদ সদস্য (এমপি), পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা এবং উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানদের নিয়মিত ভিত্তিতে গণশুনানির আয়োজন নিশ্চিত করুন।

যদি গণশুনানি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় তাহলেনাগরিকদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের এবং তাদের কাজ ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য জবাবদিহি করার ভালো সুযোগ তৈরি হয়। গণতান্ত্রিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত বিরতিতে এ ধরনের গণশুনানির আয়োজন করা জরুরি। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত তারা শুধু নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় এই ধরনের আয়োজন করবে না, বরং এই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সম্পদ বরাদ্দ করবে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ও জবাবদিহির একটি ব্যবস্থা চালু করবে।

■ মানসম্পন্ন জনসেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করুন।

দলগত পছন্দের ভিত্তিতে নয় বরং পেশাগত/পেশাদারি/পেশাদার দক্ষতার ভিত্তিতে আমলাতন্ত্রের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা নিশ্চিত করুন।

কার্যকরী ও দক্ষতার ভিত্তিকে সেবা দেওয়ার জন্য, বাংলাদেশে এমন একটি জনসেবা কাঠামো প্রয়োজন যা দক্ষ ও পেশাদার, যার সদস্যরা অভ্যন্তরীণ নীতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতে পারে এবং যারা সরকারের/শাসকদের/প্রশাসনের ক্ষমতার কাছে সত্য কথা বলতে উৎসাহিত হয়। আমলাতন্ত্রকে তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এবং 'নিরপেক্ষ সালিশি/মধ্যস্থতাকারী' হিসেবেকাজ করার সুযোগ/অনুমতি না দিলে এ ধরনের জনসেবা কাঠামো তৈরি করা যাবেনা। আমলাতন্ত্রকে রাজনীতিকরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে। একজন সরকারি কর্মচারীর নিয়োগ ও পদোন্নতি থেকে শুরু করে কর্মজীবনের পরবর্তী প্রতিটি ধাপে মেধা ও যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিদ্যমান অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে (জিআরএস) শক্তিশালী করুন।

সরকার বেশ কয়েকটি সংস্থায় অভিযোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা চালু করলেও নাগরিকেরা বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পুরোপুরিভাবে সেটার সুবিধা নিতে পারছেনা। এই প্রেক্ষাপটে জিআরএসকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং এ-সম্পর্কিত ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়মিতভাবে জিআরএসের ব্যাপারে নাগরিকদের সন্তুষ্টির মাত্রা পরিমাপ করতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করুন।

সীমিত ব্যতিক্রম ছাড়া, বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো তাদের কাজ এবং ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রে অলীক/অবিশ্বাস্য/অপার্থিব দায়মুক্তি ভোগ করে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটির মারাত্মক প্রভাব রয়েছে।

রাষ্ট্রের পক্ষে নাগরিকদের সেবা করার মানসিকতায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পেশদারিত্বসততা এবং কোনো পক্ষপাত ছাড়াই কাজ করা নিশ্চিত করতে তাদের কর্মক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে সূচকভিত্তিক পুরস্কার এবং শাস্তির ব্যবস্থা চালু করতে হবে। একই সঙ্গে অধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক, নিরপেক্ষ ও কার্যকর তদন্ত সাপেক্ষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা যদি আইন বা আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য দায়ী প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকর করার জন্য মূখ্য/সংবেদনশীল /মূল কমিটিগুলো বিরোধীদলের সদস্যদের নেতৃত্বে গঠন/পরিচালনা নিশ্চিত করুন।

সব রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত ক্ষমতায় এলে তারা সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (পিএসি), অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের সদস্যদের প্রধান করার ব্যবস্থা করবে। একই সময়ে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এই কমিটি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্যসহ নিয়মিত গণশুনানি আয়োজন করবে। এই কমিটির কার্যবিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। কমিটির প্রধান হতে হবে বিরোধী দলের একজন সদস্যকে।

অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে সুপ্রিম কোর্টের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন।

নির্বাহী বিভাগের কোনো প্রভাব ছাড়া ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য অধস্তন আদালতগুলোকে পুরোপুরি সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ন্যায়বিচার কার্যকর করার জন্য অধস্তন আদালতগুলোকে পর্যাপ্ত মানবসম্পদ, অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে সাজানোর উদ্যোগ নিতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রয়োজন যাচাই ও উপযুক্ত বরাদ্দের উদ্দেশ্যে অধস্তন আদালতগুলোর সেবা মূল্যায়ন করা উচিত। আদালতের কার্যক্রম প্রকাশের বিষয়নিশ্চিত করতে হবে। আদালত চত্বরে নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) প্রদর্শন এবং তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এই প্রেক্ষাপটে সহায়ক হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আইনগত সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন এবং এই গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে জড়িত মামলাগুলোর বিষয়ে তথ্য প্রকাশের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভৌগোলিক স্থান, লিঙ্গ পরিচয়, ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে এটি বৃহত্তর জনসাধারণকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবঞ্চিতদের আইনি সুরক্ষার অধিকার প্রয়োগের প্রকৃত অগ্রগতি জানার সুযোগ করে দেবে।

- দুর্নীতি দমন কমিশন, IC, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রতিষ্ঠানগুলো যেন শাসনমূলকনিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থেকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

এই লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো,বিভিন্ন জবাবদিহি নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানদের নিয়োগ এখনো রাজনৈতিক বিবেচনায় সম্পন্ন হয়। এটি শুধুমাত্র এই প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতাকে অবমূল্যায়ন/ক্ষুণ্ণ করে না, বরং নির্বাহী বিভাগকে ভবিষ্যতের ফায়দার জন্য বিশেষ লোকদের সুবিধা দেওয়ার কাজে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। এটি কখনও কখনও ভিন্নমতের কণ্ঠকে হয়রানি করতেও ব্যবহৃত হয়। এই নিয়োগ পদ্ধতি অবশ্যই সংশোধন করতে হবে, যাতে এসব প্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতে এবং স্বচ্ছভাবে লোক নিয়োগ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে:

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিয়ন্ত্রণআইন সংশোধন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান আইনে এমন বিধান রয়েছে যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করার ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতার স্বাধীনতাকে সীমিত রেখেছে/করে, যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে। যদিও 'শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী' শব্দটি প্রথাগতভাবে সামরিক বাহিনীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কৌশলগত কারণে পুলিশ বাহিনীও এই বিভাগে পড়ে বলে মনে করা হয়। ফলে আইন অনুসারে পুলিশ এবং র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো অভিযোগ কমিশন স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারে না; কারণ এ ধরণের মামলা সরকারি তদন্তের বিষয় বলে মনে করা হয়। তাই এনএইচআরসিকে অপরাধী নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করার অনুমতি দিতে হবে। কেননা, আইনগত দিক থেকে এনএইচআরসি শুধু একটি সুপারিশকারী সংস্থা এবং এর কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। এ বিষয়টি কমিশনের ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে সীমিত করে।

- সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং কার্যকর করে তুলতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে দুর্নীতির যে কোনো অভিযোগ তদন্তে ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করার ক্ষেত্রে দুদককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া অপরিহার্য। সরকারিকর্মচারী ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোর বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রদত্ত শাস্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সেবা প্রদান ব্যবস্থার প্রতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে যারা সরকার ওজনগণের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ রক্ষা করে তারা এবং কর্পোরেটসংস্থাগুলো যেন সক্রিয় তথ্য প্রকাশ নীতি অনুসরণ করে তা তথ্য কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে। তবে, এমন পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি। এটা এখনও হয় না। সাম্প্রতিক সময়ে তথ্যের অভিগম্যতার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেওসংস্থাগুলোকে জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আরটিআই একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ/অনুষঙ্গ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিক হিসেবে অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। লক্ষণীয়, দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে আরটিআই একটি অত্যন্ত কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত। আরটিআইকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো দরকার, যাতে তারা আরটিআই আবেদন (তথ্য-প্রাপ্তির অধিকার দাবি) করতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ না করলে কী করতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন হয়। এক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণ

বছরের পর বছর গণতন্ত্রের ধারাবাহিক মন্দ/অবনয়ন/অবনতি কীভাবে বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগকে ক্রমশ কর্তৃত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী করে তুলেছে এই নীতি সুপারিশপত্রে তা ব্যাখ্যা ও অন্বেষণের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক জবাবদিহির প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে। এই উদ্ভূত ব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাবের শিকারসব শ্রেণির মানুষ হলেওএই ধরনের পরিস্থিতি থেকে দুর্বল এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা সর্বাধিকক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্রমবর্ধমান দুর্বল গণতান্ত্রিক জবাবদিহি ব্যবস্থা অনগ্রসর গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য এবং গণদাবি/কণ্ঠস্বর ও অধিকারের ঘাটতির সংস্কৃতিকে উৎসাহিত ও দীর্ঘস্থায়ী করে। ফলস্বরূপ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার উপেক্ষিত হয়। যখন অধিকার লঙ্ঘিত হয় তখন এই গোষ্ঠীগুলো কার্যকর প্রতিকারের অভাবে পড়ে, কারণ মতামত প্রকাশ করা এবং আওয়াজ তুলতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিগম্যতার ঘাটতি রয়েছে তাদের। তারামানসম্পন্ন জনসেবা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই পটভূমিতে

নীতি-সুপারিশপত্রটি সারাদেশে দুর্বল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট সুপারিশের রূপরেখা তুলে ধরেছে। সুপারিশপত্রটিতে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর দাবি ও অভিযোগের প্রতি রাষ্ট্র যাতে যথাযথভাবে সাড়া দিতে পারে সে জন্য অনুভূমিক জবাবদিহিকে শক্তিশালী করার উপায়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুপারিশপত্র বাংলাদেশে ক্ষমতার প্রয়োগে জবাবদিহি, স্বচ্ছতা এবং সুশাসনকে উৎসাহিত করতে চায়, যাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো দেশের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে নিজেদের অধিকার দাবি করতে সক্ষম হয়।

'নাগরিক এজেন্ডা ২০২৩: একটি ভিন্নতর বাংলাদেশের লক্ষ্যে'- বাংলাদেশের প্রচলিত উন্নয়ন আখ্যানের বিপরীতে দেশের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একটি অন্যতর বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। এই সংকলনে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১১টি পলিসি ব্রিফ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাতে প্রতিফলিত আছে প্ল্যাটফর্মের দুইবছরেরও অধিক সময়ব্যাপী পরিচালিত বিভিন্ন পরামর্শ সভার মতামত। এসব কর্মকাণ্ডে সচিবালয় হিসেবে প্ল্যাটফর্মকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)।

দেশব্যাপী আঞ্চলিক সংলাপ, টাউন হল মিটিং ও জরিপ এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি জনশুনানি থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এই পলিসি ব্রিফগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব ব্রিফে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অগ্রাধিকারকে তুলে ধরা হয়েছে, যা বিশেষ করে দেশের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদার সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। এই প্রকাশনাটিতে এমন কিছু বাস্তবভিত্তিক নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গৃহীত নীতি যেন অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যেন জবাবদিহিতা থাকে এবং সমাজের সবথেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর চাহিদা যেন তা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য, এ নাগরিক এজেন্ডা, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পূর্বেই প্রস্তুত করা হয়েছিল তবে এটি এমন এক সন্ধিক্ষণে প্রকাশিত হচ্ছে যখন নাগরিকদের পক্ষ থেকে সংস্কারের দাবি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গণমানুষের আলোচনা ও বিতর্কে এগুলো প্রাধান্য পাচ্ছে। এই সংকলনটি কেবল কতিপয় প্রস্তাবনা বা সুপারিশের সমষ্টি নয়, বরং এটি আগামীর বাংলাদেশ নির্মাণে নাগরিকদের একটি দৃঢ় প্রত্যয় যা আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে নাগরিক ইশতেহারের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবার দাবী রাখে।